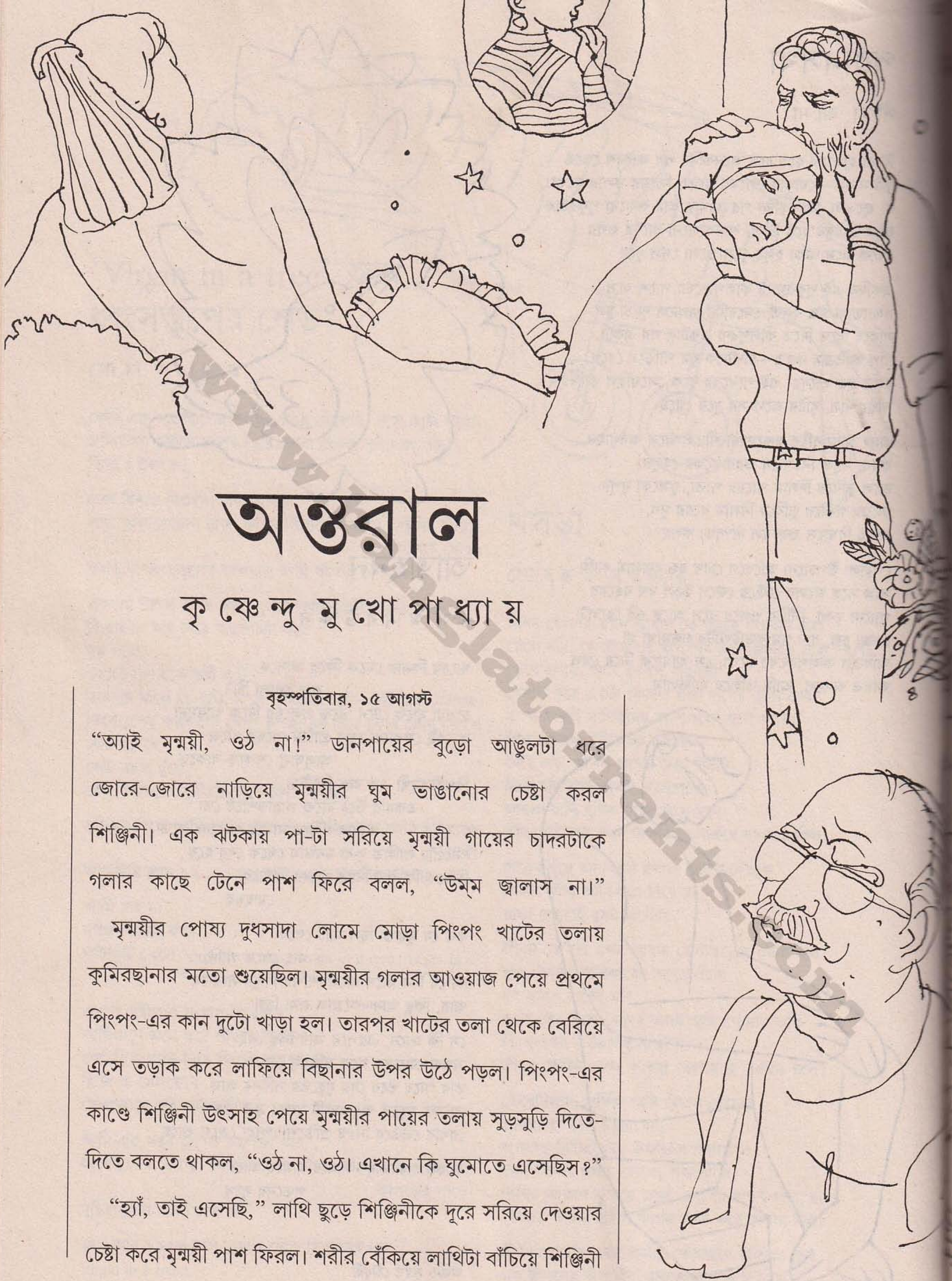

অন্তরাল

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার, ১৫ আগস্ট

"অ্যাই মৃন্ময়ী, ওঠ না!" ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা ধরে জোরে-জোরে নাড়িয়ে মৃন্ময়ীর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল শিঞ্জিনী। এক ঝটকায় পা-টা সরিয়ে মৃন্ময়ী গায়ের চাদরটাকে গলার কাছে টেনে পাশ ফিরে বলল, "উম্‌ম জ্বালাস না।"

মৃন্ময়ীর পোষ্য দুধসাদা লোমে মোড়া পিংপং খাটের তলায় কুমিরছানার মতো শুয়েছিল। মৃন্ময়ীর গলার আওয়াজ পেয়ে প্রথমে পিংপং-এর কান দুটো খাড়া হল। তারপর খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে তড়াক করে লাফিয়ে বিছানার উপর উঠে পড়ল। পিংপং-এর কাণ্ডে শিঞ্জিনী উৎসাহ পেয়ে মৃন্ময়ীর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে-দিতে বলতে থাকল, "ওঠ না, ওঠ। এখানে কি ঘুমোতে এসেছিস?"

"হ্যাঁ, তাই এসেছি," লাথি ছুড়ে শিঞ্জিনীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মৃন্ময়ী পাশ ফিরল। শরীর বেঁকিয়ে লাথিটা বাঁচিয়ে শিঞ্জিনী

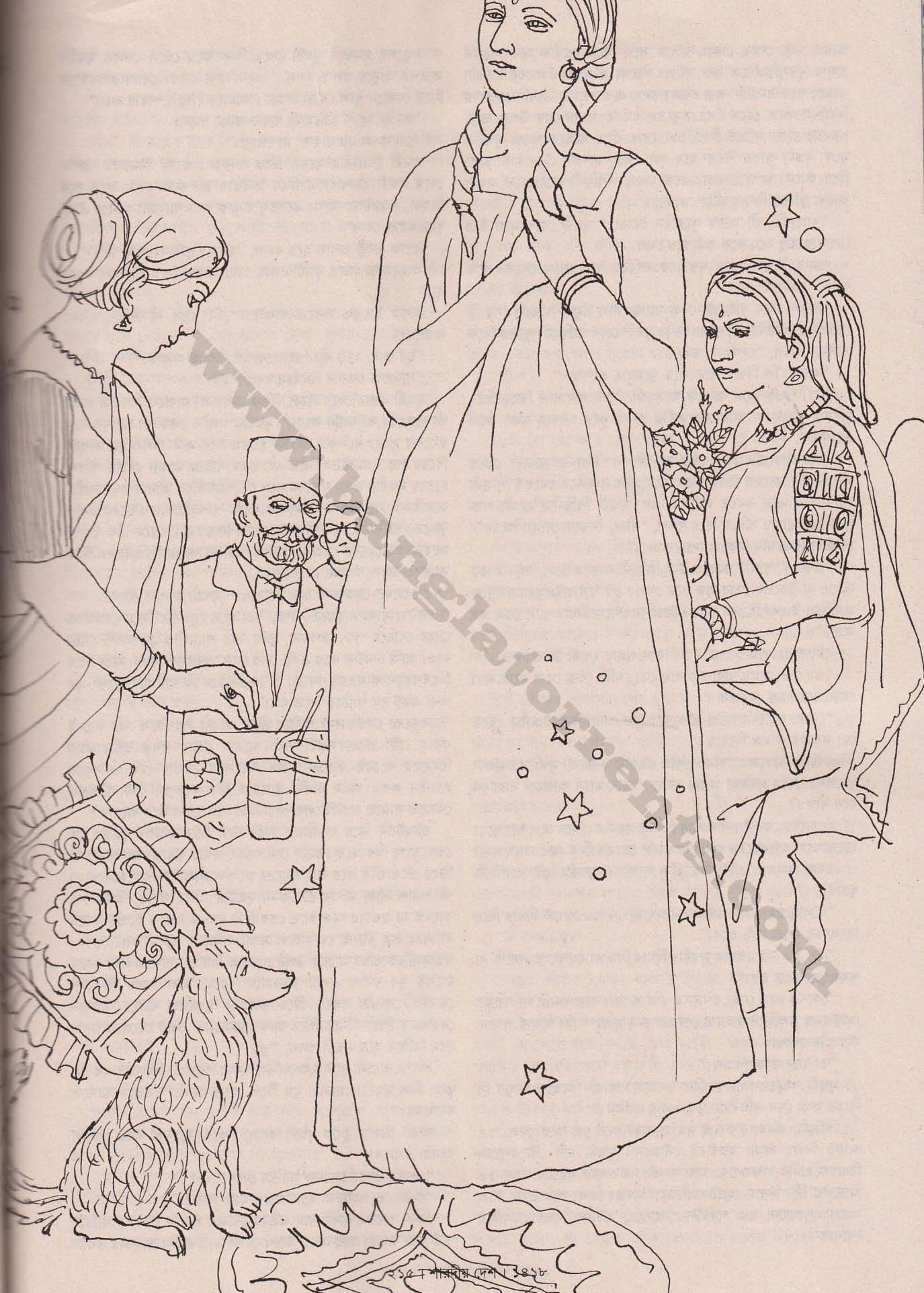

আরও মজা পেয়ে গেল। ছিটকে সরে গিয়ে মৃন্ময়ীর অন্য পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। পিংপং-ও মৃন্ময়ীর গায়ের চাদরটা কামড়ে ধরে টানাটানি শুরু করল। তনয়া এতক্ষণ মজা দেখছিল। এবার খিলখিল করে হেসে উঠে সমুদ্রের ধারের জানালাটার উপর ভারী পরদাটা টেনে সরিয়ে দিল। চড়া রোদ এসে আছড়ে পড়ল মৃন্ময়ীর মুখে। মৃন্ময়ী আরও বিরক্ত হয়ে গলা থেকে চাদরটা টেনে মাথা ঢাকা দিয়ে আলো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। শিঞ্জিনী সরে এসে একটা আঙুল ডুবিয়ে দিল মৃন্ময়ীর কোমরে।

"ধ্যাত্তেরি! কী আরম্ভ করেছিস তোরা?" মৃন্ময়ী রেগেমেগে উঠে বিছানায় বাবু হয়ে বসে গুম হয়ে গেল।

তনয়া পিছন থেকে মৃন্ময়ীকে জড়িয়ে ধরে দোল খেতে-খেতে বলল, "বাইরেটা দ্যাখ।"

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। নীল সমুদ্র, আছাড়ি-পিছাড়ি ঢেউ আর থিকথিকে মানুষের ভিড়। মৃন্ময়ী চোখ পাকিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলাম, তো?"

"আমরা কি দিঘায় পড়ে-পড়ে ঘুমোতে এসেছি?"

"না!" হাই তুলে বলে উঠল মৃন্ময়ী, "ওই গাদাগাদি ভিড়ে গিয়ে দুনিয়ার লোককে আমাদের শরীর স্পর্শ করে দেখার মজা দিতে এসেছি!"

বেডসাইড টেব্‌লে মৃন্ময়ীর ল্যাপটপটা ছিল। আড়মোড়া ভেঙে ল্যাপটপটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ডালাটা খুলতে যেতেই শিঞ্জিনী ল্যাপটপটা ভাঁজ করতে লাফিয়ে এল। মৃন্ময়ী শিঞ্জিনীর হাতটা শক্ত করে ধরে মুচড়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, "দাঁড়া, দেখতে দে না। কয়েকটা গিফ্‌ট আর একটা রিবন আসার কথা..."

"উফ্‌ফ!" ব্যথায় কাতরে উঠে শিঞ্জিনী ঝামরে উঠল, "ঘুম থেকে উঠতে না-উঠতেই তোর শুরু হয়ে গেল? তুই যদি অষ্টপ্রহর ফেসবুকে ফার্মভিল-ই খেলবি, তা হলে গৌরবপুর থেকে দিঘায় এলি কেন কষ্ট করে?"

"সিম্পল। ফার্ম করতে!" নির্বিকার গলায় মৃন্ময়ী উত্তর দিল।

"ওহ গড! আরে বাবা আমরাও তো খেলি। কিন্তু তোর মতো নয়। বেড়ানোর সময় বেড়ানো।"

"তোরা তোদের মতো থাক না! ঘুরে আয়। শুধু আমাকে ছেড়ে দে। খবরের কাগজ দিয়েছে?"

খবরের কাগজের কোনও খোঁজ রাখেনি তনয়ারা। মৃন্ময়ীর খোঁজটা গায়ে না মেখে মনমরা গলায় বলল, "তার মানে আজকে সারাদিন ঘরে বন্দি?"

"তোদের কে ঘরে বন্দি থাকতে বলেছে বস। বিচে চলে যা। বুড়ো হাবড়াগুলোর কনুইয়ের খোঁচা না খেলে তো তোদের আর চলছে না!"

তনয়া বলল, "এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না মৃন্ময়ী। তুই বলেছিলি ঘুরবি!"

"বলেছিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না যে, ১৫ অগস্ট দিঘার বিচে ব্রিগেডের মতো ভিড় হবে!"

"দিস ইজ় নট ফেয়ার মৃন্ময়ী। দিঘার বিচ না হোক, তালসারি বা শঙ্করপুর অন্তত চল।"

"কোনও লাভ নেই। ওখানেও এক অবস্থা। কাল শুনলি না, চায়ের দোকানের ঝুপড়িতেও রাতে শোয়ার জন্য একটা খালি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও!"

"তা হলে তাজপুর চল!"

মৃন্ময়ী আঙুলের টোকা দিল তনয়ার মাথায়, "আহা তাজপুর সি বিচের কথা যেন পৃথিবীতে তুই একাই জানিস!"

শিঞ্জিনী, তনয়া দু'জনেই মুখ গোমড়া করে চুপ করে গেল। ১৫ অগস্ট দিঘায় আসা মৃন্ময়ীরই সৌজন্যে। মৃন্ময়ী যদি গৌরবপুরের বিধায়ক প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ে না হত, এত কম সময়ের মধ্যে ১৫ অগস্টের দিন দিঘায় হোটেল পাওয়া অসম্ভব ছিল। তার উপর লাল আলো লাগানো যে গাড়িটায় এসেছে, সেটাও মৃন্ময়ীর বাবার বদান্যতায়।

বন্ধুদের থমথমে মুখটা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল মৃন্ময়ী। তারপর আদুরে গলায় বলল, "একটা কথা বলব? তোরা রূপকদাকে নিয়ে যেখানে খুশি বেড়িয়ে আয়। আমাকে প্লিজ় স্পেয়ার কর!"

"তা হয় না," অভিমানী গলায় তনয়া বলল।

"কে বলল হয় না? যা না তোরা।"

তনয়া শিঞ্জিনীর মুখের দিকে তাকাল। ওদের নিমরাজি ভাবটা দেখে মৃন্ময়ী মোবাইলটা নিয়ে ড্রাইভার রূপককে ফোন করে ঘরে ডাকল, "অ্যাই রূপকদা। এদের দু'জনকে আর শ্যামলীকে নিয়ে একটু ঘুরে এসো তো!"

রূপক একটু অবাক হয়ে বলল, "মানে? তুমি যাবে না দিদি?"

আড়মোড়া ভেঙে মৃন্ময়ী বলল, "না। আমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

রূপক ইতস্তত করতে থাকল, "তুমি যাবে না দিদি... একলা থাকবে?"

"হ্যাঁ তাই। যাও না। পিংপংকে নিয়ে আমি থাকছি।"

"স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই?"

মৃন্ময়ী এবার রেগে উঠল, "উফ রূপকদা! বাবাকে জিজ্ঞেস করার কী হয়েছে? যা বলছি করো," মৃন্ময়ীর গলাটা শেষ হল আদেশ আর ধমকের সুরে। খানিকটা অস্বস্তি হলেও মনে-মনে খুশিও হল রূপক। বিয়ের পর শ্যামলীকে নিয়ে এই প্রথম বাইরে আসা। সেটাও অবশ্য হয়েছে মৃন্ময়ীর জন্য। বন্ধুদের সঙ্গে বউ শ্যামলীকে আনার কথা মৃন্ময়ীই বলেছিল। মেয়েটার মন এমনিতে নরম। শ্যামলীকে একবারের জন্যও বুঝতে দেয়নি যে, ও মালিকের মেয়ে। কিন্তু রেগে গেলে ঠিক বাপের মতোই এই মেয়ের মেজাজ। রূপক মিয়ানো গলায় শিঞ্জিনীদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কখন বেরোবে?"

"তোদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে?" মৃন্ময়ী জানতে চাইল।

তনয়া মাথা নাড়তেই বলল, "তা হলে রেস্তরাঁয় গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়। রূপকদা, তুমি আর শ্যামলীও ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। আমি চানটান করে একটু দেরি করে ব্রেকফাস্ট করব। নীচে গিয়ে রিসেপশনে দ্যাখ তো খবরের কাগজ দিয়েছে কি না। আর পিংপং-এর জন্য একটু দুধ পাঠিয়ে দিতে বল।"

বন্ধুদের ব্রেকফাস্টে পাঠিয়ে দিয়ে আবার ল্যাপটপে নেট কানেক্ট করার চেষ্টা করল মৃন্ময়ী এবং অনেক চেষ্টার পরও ইন্টারনেটটা কিছুতেই কানেক্ট করতে পারল না। বড্ড দরকার ছিল ফেসবুকে লগ-ইন করার। কাল একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেছে। সেটা ঠিকঠাক খেলতে পারলে ফার্মভিলের আর-একটা লেভেলে উঠে যাবে ও।

ছটফটানি নিয়ে জানালার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়াল মৃন্ময়ী। যত বেলা হচ্ছে থিকথিকে ভিড়টা যেন আরও জমাট বাঁধছে। এই গাদাগাদি ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে আর সমুদ্রের জলে লাফালাফি করে লোকগুলো কী আনন্দ পায়, মাথায় ঢোকে না মৃন্ময়ীর! খিদে পাচ্ছে, অথচ নেট কানেক্ট না হওয়ায় অস্বস্তিতে ব্রেকফাস্ট অর্ডার করতে ইচ্ছেই করছে না ওর। এর মধ্যেই মোবাইলে সকালে মায়ের প্রথম কলটা পেল। গতানুগতিক প্রশ্ন। মায়ের উপর রাজ্যের বিরক্তি দেখিয়ে কথা বলার মাঝেই খুব কর্কশ একটা আওয়াজে বেজে উঠল ঘরের ভিতরের বেলটা। ফোনটা কেটে দিয়ে দরজাটা খুলতেই বাইরে একজন বেয়ারাকে পিছনে নিয়ে পিঠে ব্যাকপ্যাকসমেত একটি ছেলেকে দেখে চরম বিস্মিত হয়ে মৃন্ময়ী বলল, "তুই!"

পিংপং অচেনা দুটো মুখ দেখে চিৎকার করতেই পিংপংকে কোলে তুলে নিল মৃন্ময়ী। ছেলেটা মুখ টিপে হেসে বলল, "ভিতরে আসতে বলবি না?"

ঘরের ভিতরে ঢুকে মৃন্ময়ী বলল, "আয়! তুই কী করে জানলি আমরা এখানে?"

"তোর লালবাতিসমেত গাড়িটা দেখে।"

"সেটা তো আমি না হয়ে বাবাও হতে পারত!"

"কাল রাতে দেখেছিলাম এই হোটেলের সামনে তোদের গাড়িটা পার্ক করা আছে। আর একটু আগে দেখলাম, তোদের ড্রাইভার তনয়-

শিঞ্জিনী আর একটা মেয়েকে নিয়ে ওল্ড দিঘার দিকে গেল। তোকে একটা সারপ্রাইজ় দিতে এলাম।"

"তুই কোথায় উঠেছিস? কবে এসেছিস? কোনও গ্যাং নিয়ে এসেছিস নাকি?" একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ছুড়ে দিল মৃন্ময়ী।

ছেলেটা ধীরেসুস্থে উত্তর দিতে থাকল, "কাল রাতে। একাই বাইক চালিয়ে চলে এলাম। রাত ১১টায় পৌঁছেছি। ওল্ড দিঘা টু নিউ দিঘা ঘুরে বেরিয়েও একটাও থাকার জায়গা পাইনি। শেষ পর্যন্ত দু'শো টাকা দিয়ে একটা হোটেলের খাবার-টেব্‌লজুড়ে একটা শোওয়ার ব্যবস্থা পেয়েছিলাম। উফ মাইরি, টেব্‌লে কী গন্ধ! গা-টা এখনও গুলোচ্ছে।"

"তুই পাগল একটা!"

"বাইক নিয়ে এভাবে ঘুরে বেড়ানোটাই তো আমার নেশা। জানিসই তো!"

"পুরো কথাটা ঠিক করে বল। বাইক নিয়ে এভাবে মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়ানোটাই তো আমার নেশা। মুখটা তো একেবারে আমসি। সকাল থেকে নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি?"

মৃন্ময়ী ব্রেকফাস্টের অর্ডার করে ছেলেটাকে বসতে বলে মুখ ধুতে গেল। বাথরুম থেকে বেরোতেই ছেলেটা ঘরের একটা কোনা দেখাল। সেখানে বেশ কয়েকটা খালি বিয়ারের বোতল। ছেলেটা মুচকি হাসল, "সারারাত টোটাল মস্তি হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"শিঞ্জিনীর খুব শখ হয়েছিল। তবে একটাই নামাতে পারল না!"

"আর তুই ক'টা নামিয়েছিস?"

"দুটো। না, আড়াইটের মতো হবে। সলিড একটা ঘুম হল। তবে তাতেই..." ল্যাপটপটাকে আবার কোলে টানল মৃন্ময়ী। ইন্টারনেটে কানেক্ট করার আরও কয়েকটা চেষ্টা করে বলল, "ধুস! এবার ফিরে গিয়ে ডেটা কার্ডের কোম্পানিটা চেঞ্জ করব। এখন মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গেলেই ভাল হত। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? চল, ব্রেকফাস্টটা করে নিই। তারপর ফোনে জানি ওরা কোথায়। তারপর তোর বাইকে করে..."

"ওদের সঙ্গে গেলি না কেন?"

"ধুস! বড্ড ভিড়ভাট্টা। কিন্তু এখন ভীষণ বোর্‌ড লাগছে। মনে হচ্ছে গেলেই ভাল হত।"

"যাসনি ভালই করেছিস। বাইরে যা ভ্যাপসা গরম। তার চেয়ে ঘরের এসি ঢের ভাল। চল, জমিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা মারি।"

ব্রেকফাস্ট আসার পরে স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে ছেলেটা বলল, "বোরডম কাটাবি? আমার কাছে একটা জিনিস আছে!"

ব্যাকপ্যাক থেকে ছেলেটা একটা ভড্‌কার বোতল বের করল।

"এই সাতসকালে?" আঁতকে উঠল মৃন্ময়ী।

"সাতসকাল আর নেই। যথেষ্ট বেলা হয়েছে।"

"তোর ইচ্ছে হলে তুই খা।"

ছেলেটা ইন্টারকমটা দেখিয়ে বলল, "সোডা বা সফ্‌টড্রিংক বলে দিবি একটু?"

"না। লোক ডেকে আমি দেখাতে পারব না, তুই এখানে মাল খেতে এসেছিস। দেখলি না, তোকে পৌঁছে দিতে হোটেলের বেয়ারাটা এল। এরা সকলেই জানে আমি কার মেয়ে।"

"ঠিক আছে। জলের বোতলটাই দে। উফ! কাল রাতের গন্ধটা..."

ছেলেটা গেলাসে মাপমতো ভড্‌কা নিয়ে জল মিশিয়ে বলল, "গান শুনবি?"

"শুনতে পারি," আলগোছে মৃন্ময়ী বলল।

"তোর ল্যাপটপটা একটু দে।"

পকেট থেকে পেন ড্রাইভ বের করে ল্যাপটপে গুঁজে ছেলেটা বলল, "তোর প্রিয় গানটা এখন 'যাও পাখি বলো' থেকে 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও' হয়ে গিয়েছে না?"

"আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গিয়েছিস দেখছি।"

ছেলেটার পেন ড্রাইভে হিন্দি গানগুলো শুনতে-শুনতে ভিতরটা ফার্মভিলের জন্য ছটফট করছিল মৃন্ময়ীর। ছেলেটার যখন দ্বিতীয় পেগ চলছে, ভিতরের ছটফটানি কাটাতে মৃন্ময়ী ছেলেটার গেলাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বলল, "দে তো, আমাকেও একটা বানিয়ে দে।"

ছেলেটা ভড্‌কা তৈরি করল। মৃন্ময়ী চোখ বন্ধ করে গানে ডুবে গিয়ে ছোট-ছোট চুমুকে ভড্‌কা খেতে থাকল। শেষ হওয়ার পর বলল, "চুলোয় যাক বেয়ারাগুলো কী মনে করল! রুম সার্ভিসে একটা ফোন করে বরফ আর লাইম কর্ডিয়াল বলে দিই। খাচ্ছিই যখন ভাল করে খাই।"

লাইম কর্ডিয়াল দিয়ে পরের রাউন্ডের ভড্‌কাটা শেষ করে মৃন্ময়ী ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই প্ল্যান করে এসেছিস, না?"

"অনেস্টলি যদি বলিস, তাই। আমি জানতাম তোরা দিঘা এসেছিস। তবে কোথায় উঠেছিস জানতাম না। কাল সারারাত তোদের গাড়িটা খুঁজেছি।"

"আর যদি শিঞ্জিনী আর তনয়া এখন থাকত?"

"সকলে মিলে একসঙ্গে ভড্‌কা খেতাম। তবে তোকে একলা পেয়ে একটা কথা বলার সুযোগ হয়ে গেল।"

"কী?"

ছেলেটা সময় নিয়ে গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে মৃন্ময়ীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আই লাভ ইউ মৃন্ময়ী।"

মৃন্ময়ী হো হো করে হেসে উঠল, "তোর ওই বাইকে রাতদুপুরে আসা, খাওয়ার টেব্‌লে রাত কাটানো ঠিক যতটা রোম্যান্টিক, 'আই লাভ ইউ' বলাটা ঠিক ততটাই বোকা-বোকা। বাংলা সিরিয়ালের ডায়ালগ ঝাড়িস না।"

"আমি সিরিয়াস!"

"শাট আপ! আমিও সিরিয়াস। তোকে আমি অন্যরকম ভাবতাম। তুই জাস্ট বন্ধু, ভাল বন্ধু। অন্য কিছু মতলবে এসে থাকলে জাস্ট গেট আউট অফ দিস প্লেস!"

ছেলেটা চুপ করে গেল। একটু পরে মৃন্ময়ী বলল, "এসির টেম্পারেচারটা আঠেরোয় কর তো, গরম লাগছে। লাইম কর্ডিয়াল দিয়ে ভাল বানিয়েছিস। আর-একটা পেগ বানা তো। মাথাটা হালকা লাগছে।"

তৃতীয় দফায় গেলাসটা শেষ হওয়ার পর খাট থেকে নামতে গিয়ে পা-টা টালমাটাল লাগল মৃন্ময়ীর। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ধর আমাকে। বাথরুমে যাব। টাল খাচ্ছি।"

মৃন্ময়ীর মসৃণ হাতটা ধরতেই ছেলেটার গায়ে একটা শিরশিরানি লাগল। মৃন্ময়ীকে বাথরুমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বলল, "ছিটকিনি দিস না।"

বাথরুমের লকটা আটকে দু'বার পরখ করে নিল মৃন্ময়ী। মাথাটা হালকা লাগলেও শরীরটা অস্থির লাগছে। ভিতর থেকে যেন একটা ভাপ উঠে আসছে। শাওয়ারটা খুলে জলের তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মৃন্ময়ী। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল ছেলেটা গেলাস দুটো ভর্তি করে মুগ্ধ একটা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"কী দেখছিস?"

"ভিজে চুলে তোকে অদ্ভুত সুন্দর দেখতে লাগছে।"

"অদ্ভুত আবার সুন্দর? বাব্বা! উসকো-খুসকো চুলে তোকেও অদ্ভুত হ্যাগার্ড দেখতে লাগছে।"

গলার কণ্ঠিটার উপর দু'বার হাত বুলিয়ে ছেলেটা বলল, "তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। প্লিজ় মৃন্ময়ী... জাস্ট ফর ওয়ান্স, আই ওয়ান্ট টু কিস ইউ। ভাল বন্ধুরা কি এসব করতে পারে না?"

"তোর আর কী-কী করতে ইচ্ছে করছে?" চান করার পর চোখটা যেন ভারী হয়ে আসছে মৃন্ময়ীর।

"তোকে দেখতে! টি-শার্টটা খুলে ফেললে তোকে কীরকম দেখতে লাগে!"

মাথাটার মধ্যে হঠাৎ যেন কীরকম করছে! একটু চুপ থেকে খাট থেকে নেমে পিংপং-কে বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে মৃন্ময়ী গা থেকে টি-শার্টটা খুলে ফেলে বলল, "জাস্ট আমার খুব গরম লাগছে বলে... যা তোকে এটুকু দেখার প্রিভিলেজ দিলাম! আচ্ছা,

সত্যি কথা বল তো, তুই ভড়্কায় কিছু মিশিয়ে এনেছিস?"

"ভড়্কায়... তুই ভাবলি কী করে?"

"কারণ, মাথাটা কীরকম করছে আর তোকেও আমার এখন চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।"

ছেলেটার গলাটা হাতে পেঁচিয়ে নিজের শরীরের উপর টেনে নিয়ে খাটে এলিয়ে পড়ল মৃন্ময়ী।

'ঘেউ ঘেউ... ঘেউ ঘেউ...' পিংপং চিৎকার করতে-করতে বন্ধ বাথরুমের দরজাটা আঁচড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে মৃন্ময়ীর মোবাইলটা বাজছে। বুকের মধ্যে থেকে চুলের মুঠি ধরে ছেলেটার মাথাটাকে তুলে পাশ ফিরে মোবাইলটা হাতের মুঠোয় নিল মৃন্ময়ী। স্ক্রিনে শিঞ্জিনীর নাম। মোবাইলের সবুজ বোতামটা টিপে কানে ধরতেই শিঞ্জিনী উচ্ছ্বসিত গলায় বক-বক শুরু করে দিল, "হ্যালো মৃন্ময়ী। কোথায় এসেছি জানিস? বাঁকিপুর। কী শান্ত রে এখানে সমুদ্রটা! তেমনই সুন্দর ঝাউবন। তোকে ভীষণ মিস করছি..."

ছেলেটা মৃন্ময়ীর হাত থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঠোঁট দু'টো ডুবিয়ে দিল মৃন্ময়ীর ঠোঁটে।

সোমবার, ২৮ অক্টোবর

বারান্দায় 'ঝপ' করে একটা আওয়াজ, আর সেটা শুনেই রোজকার অভ্যেসমতো পিংপং 'ঘেউ ঘেউ' করতে-করতে দৌড় লাগাল বারান্দার দিকে। 'ঝপ' আওয়াজটা শোনার জন্য তক্কে-তক্কে অপেক্ষা করছিল মৃন্ময়ীও। গোটা পাড়াতে খবরের কাগজ বিলি হয়ে যায় সাতটা- সওয়া সাতটার মধ্যে। আর তাপস রোজ লেট। চারখানা কাগজের মোটা বান্ডিলটা আটটা বাজিয়ে কখন যে রাস্তা থেকে নিখুঁত লক্ষ্যে মৃন্ময়ীদের দোতলার বারান্দায় ছুড়ে তাপস ভ্যানিশ হয়ে যায়, ধরা যায় না! আজ আটটা থেকেই দোতলার ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে মৃন্ময়ী তক্কে-তক্কে ছিল। 'ঝপ' আওয়াজটা পেলেই এক ছুটে গিয়ে তাপসকে ধরে আচ্ছা করে কড়কানি দেবে! কিন্তু তাপসকে ধরতে পিংপং-এর পিছন-পিছন দৌড়ে যেতে গিয়েই মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল!

কোনওরকমে দেওয়াল ধরে টালটা সামলে নিল মৃন্ময়ী। তারপর ধীরপায়ে এল বারান্দায়। তাপস ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে। অবশ্য তাপসকে আর খোঁজার চেষ্টাও করল না সে। পিংপং ছুটে বারান্দায় এসে বান্ডিলটা রোজকারের মতো কামড়ে মুখে তুলে নিয়েছে। মৃন্ময়ী ক্লান্ত হাতে পিংপং-এর মুখ থেকে কাগজের বান্ডিলটা নিয়ে ভিতরে এসে খাওয়ার টেব্‌লের উপর রাখল। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখে জল দিল।

বেসিনের উপর বড় একটা ঝকঝকে আয়না। আয়নায় নিজের মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখল মৃন্ময়ী। আঁজলা জলে ছোট্ট কপালের উপর সামনের দিকের চুলগুলো ভিজে আরও কুচকুচে হয়ে গিয়েছে। একদৃষ্টে নিজের মুখটার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে চোখটা কুঁচকে উঠল। আয়নার উপর আলোটাকে জ্বেলে মুখটা আয়নার আরও কাছাকাছি নিয়ে গেল। টানটান মাখন ত্বকের চোখের কোলটা যেন আলতো কালো ছোপ নিয়ে অল্প বসা! ছোপটার উপর কয়েকবার চেপে আঙুল ঘষল মৃন্ময়ী। জায়গাটায় অল্প আভা ছড়িয়ে পড়লেও ছোপটা মিলিয়ে গেল না। তবে আঙুলের ঘষা খেয়ে আলাদিনের আশ্চর্য ছোঁয়ায় আয়নার ছবিটা যেন এক সত্ত্বা পেয়ে গেল! গভীর চোখে আয়নার মৃন্ময়ী মানবী মৃন্ময়ীকে প্রশ্ন করল, 'ইজ় এনিথিং রং মৃন্ময়ী?'

মুখে আরও এক আঁজলা জলের ঝাপটা দিয়ে মৃন্ময়ী বিড়বিড় করে উত্তর দিল, 'কীসের রং? আয়্যাম ওকে!'

আয়নার মৃন্ময়ী অল্প বেঁকা হাসল, 'রিয়েলি! নাথিং ইজ় রং? তা হলে খবরের কাগজের বান্ডিলটা খুললে না কেন? সকাল-সকাল কাগজ না দেখলে তোমার না আবার মাথা গরম হয়!'

মানবী মৃন্ময়ী কপালের উপর জলটা ঝেড়ে বলল, 'খুলব। এবার খুলব।'

পায়ে-পায়ে পিংপং-ও বাথরুমে ঢুকে পড়েছে। মৃন্ময়ীর পায়ের কাছে মুখ ঘষছে। তোয়ালে দিয়ে মুখটাকে ভাল করে মুছে আবার আয়নার দিকে তাকাল মৃন্ময়ী। আয়নার মৃন্ময়ী তখনও ঠায় চেয়ে আছে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি। বিরক্ত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নেওয়ার আগে আয়নার মৃন্ময়ী উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, 'তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে তো মৃন্ময়ী?'

মৃন্ময়ী বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল, 'কেন কী খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে?'

'না, এমনিতে ঠিকই আছ, তবে ইদানীং সকালে যখন প্রথম এসে আমার সামনে দাঁড়াও, তোমাকে যেন বড্ড ক্লান্ত মনে হয়! তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

'তুমি কি কিছু ভুলে যাচ্ছ মৃন্ময়ী?'

'ভুলে যাচ্ছি? কী ভুলে যাচ্ছি?' বিরক্ত হয়ে মৃন্ময়ী জলের কলটা আবার খুলল। অদ্ভুত একটা শব্দ করে জলটা পড়তে থাকল। পায়ের উপর আদুরে সুড়সুড়ি থেকে বাঁচতে পিংপং-কে পা দিয়ে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মৃন্ময়ী মুখে আর-একবার আঁজলা জল ছুড়ল। আয়নার মৃন্ময়ী কিছুক্ষণের জন্য অস্পষ্ট হয়ে গেল। তারপর আবার যখন একটু-একটু করে স্পষ্ট হল, মৃন্ময়ী দেখল আয়নার মৃন্ময়ী গভীর চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'তোমার কী হয়েছে মৃন্ময়ী? সকালে রোজই তোমাকে ক্লান্ত দেখছি। এই সপ্তাহে দু'বার ওয়াক তুলেছ... মনে পড়ছে?'

'পড়ছে। ফিসফিস করে বলল মৃন্ময়ী, আসলে ফার্মভিল খেলতে গিয়ে খুব লেট নাইট হচ্ছে। তাই সকালে উঠে ক্লান্তি কাটে না। আর সেদিন, ফুচকা খেয়ে অ্যাসিডিটি হয়ে গিয়েছিল...'

আয়নায় মৃন্ময়ীর চোখের কোনায় কৌতুকের ঝিলিক, 'আজকাল তোমার বুঝি রোজ-রোজ ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে? মানে ফুচকার চেয়েও বেশি ওই টকটক তেঁতুলের জলটা?'

'অসহ্য!' মানবী মৃন্ময়ী চোখটা বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু মনে হল পিছন থেকে আয়নায় মৃন্ময়ী বলার চেষ্টা করছে, 'তুমি আমার কাছ থেকে কী আড়াল করার চেষ্টা করছ... কতদিন হল তুমি ডেট মিস করে গিয়েছে? একবারও খেয়াল করেছ? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছ।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাটে এসে ধপ করে বসে পড়ল মৃন্ময়ী। মাথার মধ্যে অদ্ভুত ভোঁ-ভোঁ একটা ডাক। 'প্রেগন্যান্ট' শব্দটা যেন তার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে! ঠোঁটটাকে দাঁতে চিপতে গিয়ে মনে হল ঠোঁটে যেন আর রক্ত নেই! বিছানার চাদরটাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে মনে হল আঙুলে শক্তি নেই। একদৃষ্টে বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল মৃন্ময়ী। তারপর শরীরের সব শক্তি একজায়গায় সঞ্চয় করে পিংপং-কে দৌড়ে হারিয়ে বাথরুমের ভিতর ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। এক নিশ্বাসে কোমর থেকে নামিয়ে ফেলল স্কার্টটাকে। টপটাকে এক টানে খুলে ফেলল। অন্তর্বাসগুলো গা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাভরণ হয়ে আয়নার সামনে মেলে ধরে শরীরটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকল। না, হতেই পারে না। শরীরের যে নির্মেদ জটিল জ্যামিতিগুলো দেখে নেশার ঘোরেও সেদিন নেশা ছুটে গিয়েছিল ছেলেটার, সেই রেখাগুলো এক চুলও এদিক-ওদিক হয়নি। আস্তে-আস্তে একটা আঙুল উঠিয়ে আনল স্তন বৃন্তের উপর। অন্য হাতটা তলপেটটার উপর চেপে চেপে হাত বোলাতে থাকল। না, কিছুই হয়নি। আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দ্যাখো, কিছু হয়নি আমার।'

আয়নার মৃন্ময়ীর চোখে অদ্ভুত একটা কৌতুক আর উদ্বেগের মিশেল। মৃন্ময়ীর গভীর নাভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটার বয়স তো দু'মাস গড়িয়েছে। এত তাড়াতাড়ি কি ফিগারের কার্ভ বদলে যায় মৃন্ময়ী?'

আয়নার মৃন্ময়ীকে থামিয়ে মানবী মৃন্ময়ী শুকনো গলায় বলে উঠল, 'যায় না?'

আয়নার মৃন্ময়ী সাবধানবাণী শোনাতে থাকল, 'সাংঘাতিক বিপদ

হয়ে গিয়েছে মৃন্ময়ী, সময় কিন্তু খুব কম...'

ক্লান্ত হাতে স্কার্টটা কোমরে তুলে নিল মৃন্ময়ী। একতলা থেকে ডোর বেলের আওয়াজ ভেসে এল। এতক্ষণ বাইরে থেকে বাথরুমের দরজায় পিংপং সমানে আঁচড়ে যাচ্ছিল। এবার পিংপং একতলার দিকে 'ঘেউ ঘেউ' আওয়াজ করে ছুটতে থাকল। পার্টির কোনও একটা ছেলে যেন কাল সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। পোস্ট-মর্টেম করে কাল মাঝরাতে বডি ফিরেছে। সাতসকালে প্রবীর দাশগুপ্ত আর মানসী দাশগুপ্ত গিয়েছিল মালা দিতে। বোধ হয় ফিরে এল। "প্লিজ় পিংপং, কাউকে কিছু বলিস না," নিজের মনে বলে উঠে দ্রুত মোবাইলটা হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল মৃন্ময়ী।

বাইক চালাতে-চালাতে ছেলেটা দূর থেকেই দেখতে পেল মৃন্ময়ী বাস স্ট্যান্ডের ছাউনির লোহার রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল ন'টা থেকে দশটা দশের মধ্যে মোবাইলে পাঁচটা ফোন পেয়েছে মৃন্ময়ীর। গলাটা কীরকম যেন নার্ভাস! কিন্তু কী হয়েছে, কেনই বা জলদি দেখা করতে চায়, কিছুই বলেনি। অদ্ভুত একটা মেয়ে মৃন্ময়ী। বিদায় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুত্বের সম্পর্কটার মোড় অন্যদিকে এক ইঞ্চিও ঘোরাতে দেয়নি মৃন্ময়ী। বরং এড়িয়ে চলারই যেন চেষ্টা করে! আজ সেই মৃন্ময়ীরই হঠাৎ করে পর-পর পাঁচ-পাঁচটা ফোন।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে শীতের একটা হালকা আমেজ পড়েছে। বাসস্ট্যান্ডের শেডের ঠান্ডা তলাটা তাই বেশ ফাঁকা। বাসস্ট্যান্ডের শেডের কাছে বাইকটাকে রাখতেই মৃন্ময়ী হাতছানি দিয়ে শেডের ভিতরের কোণটায় ডেকে নিল ছেলেটাকে। কাছে এগিয়ে এসে মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটার আরও অবাক লাগল। যে স্ট্রবেরি ঠোঁট দুটো সেদিন পাগলের মতো শুষে নিয়েছিল, সেটা আজ একেবারে ফ্যাকাসে। মৃন্ময়ীর সঙ্গে কলেজের ব্যাগও নেই। ফাঁকা হাতে এসময়ে দেখে ছেলেটা স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, "কলেজ যাবি না?"

একটু চুপ থেকে নিচু গলায় মৃন্ময়ী বলল, "আমার দু'মাস পিরিয়ড হয়নি।"

নিচু গলা আর রাস্তায় গাড়ির আওয়াজে ছেলেটা ঠিকমতো বুঝতে পারল না মৃন্ময়ীর কথা অথবা শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারল না। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, "সুস্মিতা ম্যামের ইকনমিক্স পিরিয়ডের কথা বলছিস তো? সুস্মিতা ম্যাম তো এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে ইউ কে..."

অধৈর্য হয়ে গলাটা অল্প তুলল মৃন্ময়ী, "তুই সেদিন কনডোম ব্যবহার করেছিলি? আমার দু'মাস পিরিয়ড হয়নি!"

ছেলেটার মুখের আঁকিবুকিগুলো এবার পালটাতে লাগল। একমুহূর্ত আগে পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা জীবনের সেরা আস্বাদ হিসেবে প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষকে পরিতৃপ্ত করে রেখেছিল, মুহূর্তে সেটা যেন বিভীষিকায় পালটে যাচ্ছে! আপ্রাণ ভাবার চেষ্টা করল, সেদিন যথাযথ সুরক্ষা নেওয়া হয়েছিল কি না! আসলে মাথাটা সেদিন এত এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল! স্নায়ুকোষে আস্বাদটুকু আছে, স্মৃতিতে অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ বিবরণটা এলোমেলো।

মৃন্ময়ী দেখল, যে-অদৃশ্য কালো রঙের তুলিটা ওর চোখের তলায় হাল্কা টান দিয়েছে, সেই অদৃশ্য তুলিটা এখন গাঢ় হয়ে রং করে যাচ্ছে ছেলেটার মুখে। ছেলেটার গলার কণ্ঠিটা কয়েকবার ওঠানামা করল, তারপর অচেনা এক স্বর বেরিয়ে এল ছেলেটার গলা থেকে, "তুই ডাক্তার দেখিয়েছিলি? টেস্ট করিয়ে..."

"না।"

"তা হলে?"

"মেয়েরা বোধ হয় বুঝতে পারে। আমার ভিতর থেকে কেউ বলছে, আমি প্রেগন্যান্ট। তা ছাড়া কমন সিমটমগুলোও আছে। দু'মাস পিরিয়ডও হয়নি। ক'দিন ধরে বমি-বমি ভাব। মাঝে-মধ্যে সকালে খুব ক্লান্ত লাগছে, মাথা ঘুরছে। আজ সকালেও হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে গেল।"

ছেলেটার কণ্ঠিটা আরও কয়েকবার ওঠানামা করল, "বাড়িতে কেউ জানে?"

"এখনও না। তবে টেস্টটা করে কনফার্ম করতে হবে। কিছু হয়ে থাকলে ঝামেলা মেটাতে হবে।"

ছেলেটা এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। কণ্ঠিটা আরও দ্রুত কয়েকবার ওঠানামা করল। অচেনা গলায় বলল, "তা হলে টেস্টটা করিয়ে নে।"

"সেটাই তো বিপদ। এখানে কোন ল্যাবরেটরিতে দিই বল তো? প্রত্যেকে জানে আমি প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ে। তাই ভাবছিলাম..."

ছেলেটা পৃথিবীর করুণতম দৃষ্টিতে মৃন্ময়ীর দিকে তাকাল। মৃন্ময়ী চোখটা ছোট করে ছেলেটাকে বলল, "প্লিজ়, তুই একটা সাহায্য করে দে। ইউরিন স্যাম্পেলটা অন্য কারও নাম দিয়ে..."

ছেলেটাকে মনে হল ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওরকমে বলল, "আমি মানে... আমাকেও তো অনেকেই চেনে এখানে। যদি কেউ চেনাজানা বেরিয়ে যায়... মানে বুঝতেই তো পারছিস, বাড়িতে বোন আছে..."

"পালাতে চাইছিস? দায়িত্ব নিবি না?" মৃন্ময়ীর চোখটা জ্বলে উঠল।

ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলিটা বন্দুক থেকে ছিটকে বেরিয়েছে। অব্যর্থ মৃত্যুকে বরণ করার মুখ করে ছেলেটা তোতলাতে লাগল, "মোটেই না... মানে... আমি..."

মৃন্ময়ী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে। ছেলেটা মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে... ইউরিন স্যাম্পেলটা কখন..."

"বলে দেব তোকে। এগো এবার। আমিও যাই।"

মৃন্ময়ী বাড়ি ফিরতে পারল না। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে পর্যন্ত যতটা পেরেছে মা-বাবার সামনে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। তারপর ছেলেটাকে ফোন করে ছুটে এসেছিল বাসস্ট্যান্ডে। আজ আর কলেজে যাবে না। সকাল থেকে মনে হচ্ছে, কেউ সন্দেহ করে ফেলতে পারে! সেদিন বাঁকিপুর থেকে ফিরে এসে শিঞ্জিনীরা কি কিছু বুঝতে পেরেছিল? ধুস! ওরা কী করে বুঝবে? তার আগেই তো ছেলেটা চলে গিয়েছিল। আর লাভ বাইটগুলো দেখে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। এটুকু স্পষ্ট মনে আছে, যথেষ্ট সচেতনভাবে পোশাকের আড়ালে ঢেকে রেখেছিল বন্য কামড়গুলো।

রাস্তায় এলোমেলোভাবে হাঁটতে থাকল মৃন্ময়ী। এতদিনের প্রতিটি চেনা ইট-কাঠ-ইমারতের শহরটাকে ভীষণ অচেনা মনে হচ্ছে ওর। 'প্রেগন্যান্ট'! শব্দটা মাথার মধ্যে একটা বিশাল চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি হয়ে থাকলে নিস্তার কীভাবে পাওয়া যাবে, সেটা ভাবতে হবে। তবে সেই ভাবনাটা কোথা থেকে শুরু করা যায়? তালগোল পাকানো সুতোর ডেলা থেকে সুতোটার মুখ খোঁজার মতো কিছুতেই শুরুটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

মনের মধ্যে একটার পর একটা প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মা কি আর-একটু খেয়াল করলেই বুঝে যাবে? এখনও পর্যন্ত যে কিছু বুঝতে পারেনি, সেটা নিশ্চিত। কোনও সন্দেহ হলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করত! আর বাবা? প্রশ্নই ওঠে না। বাবা নিজের পার্টি নিয়ে এত ব্যস্ত যে, মৃন্ময়ীর মুখটাই শেষ কবে ভাল করে দেখেছে মনে নেই। তবে সবচেয়ে বড় ভয় হল বাবার পার্টির লোকগুলো। একবার যদি জানতে পারে মৃন্ময়ীর এই দশার জন্য দায়ী কে, ছেলেটাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁতে দেবে। দোষ কি ছেলেটার একার? নিজের দোষটাও তো সমান-সমান। নাঃ! ছেলেটাকে আড়াল করতেই হবে।

দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলারও আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকল মৃন্ময়ী। এত সব ভাবছে কেন? কিছুই হয়নি। ঝাপসা মনে পড়ছে কনডোমের প্যাকেটটা তো ছেলেটা দেখিয়েছিল। কিন্তু প্যাকেটটা কখন ছিঁড়েছিল? আর না ছিঁড়ে থাকলেও সেসময়টা সেফ পিরিয়ডও থাকতে পারে! আগস্টে কত তারিখে পিরিয়ড হয়েছিল যেন... এমন সময় পা দুটো হঠাৎ আটকে গেল।

নতুন একটা ছ'তলা হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে গৌরবপুরে। ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটাল। গৌরবপুরের মতো শহরতলিতে এরকম বড়মাপের ঝাঁ-চকচকে হসপিটাল হবে,

কয়েকবছর আগেও ভাবা যেত না! এত দ্রুত হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে যে, এবেলা-ওবেলা ভোল বদলে যাচ্ছে। হাসপাতালটার সামনে এসে পা দু'টো থমকে গিয়েছে মৃন্ময়ীর। পরশু পর্যন্ত দেখেছিল ছ'তলা উঁচু হাসপাতালটার আগাপাশতলা স্বচ্ছ কাচে মোড়া। আজ সেই কাচের পিছনে চকচকে রিফ্লেক্টর ফিল্ম লাগানো হয়ে গিয়েছে। সামনে যেন ছ'তলা উঁচু বিশাল একটা আয়না খাড়া হয়ে আছে। আয়নাটা দেখেই বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। আবার ওখানে ফুটে বেরোবে না তো সেই আলাদিনের মৃন্ময়ী?

"কেমন আছ?"

পিছন থেকে ডাকটা শুনে ভীষণ চমকে উঠল মৃন্ময়ী। মৃন্ময়ী দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সাইকেলে দলীয় পতাকা লাগানো বাবার পার্টির কয়েকটা ছেলে। মৃন্ময়ী স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করল, "ভাল।"

"শুনেছ তো? কালকে এখানে একটা সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে উজ্জ্বল চাকলাদার মারা গিয়েছে। স্পট ডেড। প্রবীরদার কাছে খুব যেত উজ্জ্বল। ইউনিক রোলিং মিলে চাকরি করত। রোগা মতো কপালে একটা আঁচিল ছিল। মনে পড়ছে?"

মৃন্ময়ী উজ্জ্বল চাকলাদারকে মনে করতে পারল না। সেটা প্রকাশ না করে বলল, "কী করে দুর্ঘটনাটা ঘটল?"

"জানো না? ওই দ্যখো না..." পার্টির ছেলেটা হসপিটালটা দেখিয়ে বলতে থাকল, "ওই আয়নায় রোদ ঠিকরে উজ্জ্বলের চোখ ধাঁধিয়ে সোজা লরির চাকার তলায় চলে গিয়েছিল। একেবারে স্পট ডেড।"

পাশের ছেলেটা হাসপাতাল বিল্ডিংটাকে দেখিয়ে যোগ করল, "ভালই ব্যবসা ফেঁদেছে। সব কাজ বন্ধ করিয়ে দেব। প্রবীরদা আসছেন।"

মৃন্ময়ীকে আবার চমকে দিয়ে মোবাইলটা বাজতে শুরু করল। সিএলআই-তে ছেলেটা। সামনে বাবার পার্টির ছেলেরা। বাবা আসছে। "চলি," বলে দ্রুত হনহন করে খানিকটা গিয়ে ফোনটা ধরে খুব চাপা গলায় বলল, "বল।"

"একজনকে কনসাল্ট করতে পেরেছি," ছেলেটার গলায় হালকা কনফিডেন্স।

"কাকে বলেছিস?" ভয় পেয়ে উঠল মৃন্ময়ী।

"না না কাউকে বলিনি," ছেলেটা নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করল, "আমার জানাশোনা একজন ওষুধের দোকানে কাজ করে। অন্যভাবে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, সেল্ফ টেস্ট কিট আছে। বোঝা যাবে। তারপরও কিছু অঘটন ঘটে থাকলে বিদেশি একটা ওষুধ খেয়েও..."

ইস! প্রেগ কালার টেস্ট করার কথাটা একবারও মনে পড়ল না কেন? কাগজে-ম্যাগাজিনে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন বেরোয়। সবকিছুই আজকাল এত ভুল হয়ে যায়! ছেলেটার সঙ্গে একা বসে ভড়্কা খাওয়া উচিত হয়নি। ভুল হয়ে গিয়েছে। কনডোমের উপর ভরসা না রেখে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেই ট্যাবলেটটা খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল। ভুল হয়ে গিয়েছে। লম্বা শ্বাস টেনে মৃন্ময়ী বলল, "আমি বাসস্ট্যান্ডে ফিরে যাচ্ছি। তুই একটা কিট কিনে নিয়ে আয়।"

ছেলেটার কণ্ঠিটা আবার একবার ওঠানামা করল। গলার পরদাটা একটু নামিয়ে বলল, "একটু সময় দে রে। কথা দিচ্ছি তোকে আজকেই এনে দেব।"

"সময় লাগবে কেন? যে-কোনও ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবি।"

"মানে... এখানে সব ওষুধের দোকান তো চেনা। আমি অন্য-কোনও জায়গা থেকে... একটু সময় দে, প্লিজ।"

ঝাঁঝিয়ে উঠল মৃন্ময়ী, "তুই নাকি বাইকে বিশ্বভ্রমণ করিস! যেখানে খুশি যা!" তীব্র রোষের সঙ্গে কথাগুলো বলে ফোনটা কেটে দিল মৃন্ময়ী। দু' মিনিটের মধ্যে আবার ফোন। মৃন্ময়ী ফোনটা ধরতেই ছেলেটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দলাপাকানো শুকনো গলায় কথাগুলো উগড়ে দিল, "মৃন্ময়ী, সেরকম কিছু হয়ে গেলে তোকে রেজিস্ট্রি করে নেব। আমি সত্যি তোকে ভালবাসি রে!"

মৃন্ময়ী চুপ করে থাকল। লাইনটা কাটল না।

"হ্যালো... মৃন্ময়ী..."

"তুই ভাবলি কী করে তোকে আমি বিয়ে করব! তা ছাড়া ভুলে যাচ্ছিস বোধ হয় বিয়ে করার জন্য আমি সাবালিকা হলেও তুই নাবালক। আর তোর জন্য আমার কী হয়েছে, সেটা বাবার পার্টির ছেলেরা জানতে পারলে..."

মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর

একটু আগে ভোর হয়েছে। জানালার টানা পরদার ফাঁকফোকর চুঁইয়ে মৃন্ময়ীর খাটের উপর অল্প আলোর আভাস। তার মধ্যে বেজে চলেছে মৃন্ময়ীর ফোন। ফোনটা ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে রাতজাগা ক্লান্ত কাঁপা-কাঁপা গলায় ছেলেটা বলল, "তোর খেয়াল আছে তো? প্রেগ কালার টেস্ট কিটের ইনস্ট্রাকশনে লেখা আছে... সকালে ফার্স্ট ইউরিন থেকে..."

মৃন্ময়ী কোনও কথা না বলে খাটে মাথাটা হেলিয়ে দিল। আধঘণ্টা আগেই বাথরুমে জীবনের সব রং শুষে নিয়েছে সেল্ফ টেস্ট কিটের কয়েকটা গোলাপি দাগ।

শনিবার, ২১ ডিসেম্বর

"একদিন সকালে গ্রেগর সামসা ঘুম ভেঙে উঠে দেখল, আশ্চর্যজনকভাবে সে একটা বিশালাকৃতি পতঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই অদ্ভুত পরিবর্তনটা দেখে ভয় পেয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেগরের ভয়ানক দুশ্চিন্তা হল এই ভেবে যে, এই অবস্থায় সে কীভাবে তার ট্রাভেলিং সেল্সম্যানের চাকরিটা বজায় রাখবে। গ্রেগরের উপার্জনের উপর তার বাবা-মা আর বোন গ্রেটা নির্ভরশীল। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এরপর কী হবে, গ্রেগর ভেবে পেল না। নিজেকে ঘর-বন্দি করে রাখল। এদিকে গ্রেগরের খোঁজে গ্রেগরের উপরওয়ালা বাড়িতে এসে দেখল, গ্রেগর ঘরের দরজা বন্ধ করে রয়েছে। বন্ধ দরজার বাইরে ডাকাডাকি করতেই গ্রেগর উপায়ন্তর না পেয়ে কোনওরকমে বিছানা থেকে গড়িয়ে নেমে দরজাটা খুলল। পতঙ্গ গ্রেগরকে দেখে গ্রেগরের বাবা-মা-বোন-উপরওয়ালা সকলে সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল। উপরওয়ালা দৌড়ে পালাতে লাগল। গ্রেগরও পিছন-পিছন তাকে ধাওয়া করতে চাইল। কিন্তু গ্রেগরের পরিবার গ্রেগরকে ঠেলেঠুলে আবার ঘরবন্দি করে দিল। গ্রেগর সেই পতঙ্গ অবস্থাতেই দিন কাটাতে থাকল। তবে গ্রেটা সমব্যথী হয়ে দাদার যত্নআত্তি করত। গ্রেগরকে পতঙ্গদের পছন্দের বাসি-পচা খাবার খেতে দিত। এভাবে গ্রেগরের জীবন কাটতে থাকল। একজন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র হিসেবে মা-বাবাকে যাতে তার জন্য বিড়ম্বনায় না পড়তে হয়, তাই বাইরের কেউ গ্রেগরের ঘরে এলে গ্রেগর নিজেকে একটা সোফার তলার আড়ালে লুকিয়ে ফেলত। এরপর..."

"দাদা এবার কি গাঁজাখুরি সায়েন্স-ফিকশন?" পিছন থেকে বিশ্রীভাবে উড়ে এল কথাটা। ক্যান্টিনের আজকের মিটিংয়ে অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু বেশিই লোক হয়েছে। গল্প পড়াটা থামিয়ে গলাটা কার, বোঝার চেষ্টা করল সুতীর্থ।

"কে বললে ভাই?" সুতীর্থ গলা তুলে প্রশ্নকর্তাকে খুঁজতে চাইল।

"এই যে আমি সুতীর্থদা," পিছন থেকে মলয় হাতটা উঠিয়ে বলল।

সুতীর্থ গলার স্বরটা উঁচুতে রেখেই বলল, "যে গল্পটা বলার চেষ্টা হয়েছে তা হল, একজন মানুষ একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখল তার জীবনটা হঠাৎ ভীষণভাবে পালটে গিয়েছে। বিশালাকৃতি পতঙ্গে পরিণত হওয়াটা একটা প্রতীকী। গল্পটা বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক ফ্রান্জ কাফ্কার লেখা। দ্য মেটামরফসিস। আমি বাংলায় নাম দিয়েছি রূপান্তর। পুরো গল্পটা তুমি আগে শোনো মলয়। তারপর ভেবে দ্যাখো, রূপান্তরটা সায়েন্স ফিকশন, নাকি জীবনেরই কোনও দর্শন।"

"শুনুন সুতীর্থদা, আমার কয়েকটা স্পষ্ট বক্তব্য আছে," মলয় চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

পাশে বসা লোকটা মলয়কে উস্কানি দিল, "'যা না, সামনে গিয়ে বল।" আশপাশের কয়েকজনও মলয়কে সমর্থন করল।

মলয় এগিয়ে এসে সুতীর্থর টেব্‌লের পাশে দাঁড়াল। কোলাহলটা কিছুটা কমলেও মলয় গলা চড়িয়েই বলতে থাকল, "আমি আমার কথাটা রেখে-ঢেকে না বলে স্পষ্টই বলি। আমাদের বছরে একটাই নাটক হয়। এটা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটক। এখানে কোনও ইউনিয়নের রং নেই। আমরা সকলে মিলেমিশে করি। আমার সাতবছর এই কোম্পানিতে হয়ে গেল। প্রথম থেকেই দেখছি সুতীর্থদা এই নাটকের গল্প বাছা থেকে শুরু করে পরিচালনা, সব করেন। সুতীর্থদার যোগ্যতা নিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন তুলছি না। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে দেখছি, সুতীর্থদার নাটক ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে, এবার ওই কাফকা-টাফকা বাদ দিয়ে একটু সহজ-সরল নাটক করুন। কমেডি গোছের কিছু, যাতে লোকে দেখে মজা পায়।"

সামনের সারি থেকে বিতনু মলয়কে সমর্থন করে বলে উঠল, "ঠিক কথা মলয়। এবার একটু আমুদে নাটক হোক। নাটক তো শুধু আমরাই দেখি না। আমাদের বাড়ির লোকজনদেরও নিয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কী, গতবার ব্যান্ডের গানের পর নাটকটা একদম জমেনি। আর সুতীর্থদার নাটক শুধু জটিলই নয়, একপেশে পলিটিক্যাল। সায়েন্স ফিকশন হোক বা না-ই হোক, সুতীর্থদার গল্পের শেষ তো রাজনীতিতে!"

সুতীর্থ একদম চুপ করে নাকের ডগাটা চিপে ধরে চোখ বন্ধ করে বক্তব্য শুনছিল। মনটা মাঝে-মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল। এককালে বড়দিনের ঠিক আগের শনিবারের এই বাৎসরিক মিটিংটার জন্য সহকর্মীরা মুখিয়ে থাকত, সুতীর্থ পালচৌধুরী সামনের বছর নতুন কী নাটক নামাবে, সেটা ভেবে। অভিনয়ে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা উজিয়ে থাকত একটা পার্ট পাওয়ার জন্য। চোরাস্রোতের হাত ধরে কবে যে পরিবর্তনটা এই একই লোকগুলোর মানসিকতা-ধৈর্য-রুচি সব চেটেপুটে নিয়ে চলে গেল বুঝতেই পারল না!

কনভেনার নিখিল মুখার্জির কথায় সুতীর্থর সংবিৎ ফিরল, "তুমি কিছু বলো সুতীর্থ..."

সুতীর্থ চোখ মেলল। মলয় আর বিতনুর মতামতের পর কোলাহলটা থেমে গিয়ে যেন ওদের সমর্থন করে অনেকগুলো চোখ এখন সুতীর্থর দিকে তাকিয়ে আছে! সুতীর্থ ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল, "তোমরা তো পুরো গল্পটা শোনার ধৈর্যই রাখতে পারলে না। তবু প্রশ্নটা যখন উঠল, তখন বলি, সকলের মধ্যেই সচেতন বা অসচেতনভাবে একটা ইজ়ম থাকে। আমার মধ্যেও আছে। সেটা ডানপন্থী বা বামপন্থী যাই হয়ে থাকুক, তার কোনও প্রভাব কিন্তু আমার নাটকে থাকে না। মূল গল্পকার বা নাট্যকার যে দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটা বা নাটকটা লিখেছেন, সেই দৃষ্টিকোণই আমি অনুসরণ করি। গতবছরের নাটকটার কথা উঠল। আশা করি মনে আছে গতবারের নাটকটা ছিল আর্থার মিলারের বিখ্যাত নাটক 'ডেথ অফ আ সেল্‌সম্যান' অবলম্বনে 'এক ফেরিওয়ালার মৃত্যু'। নাগরিক জীবনের অসহ্য প্রাপ্তি-প্রত্যাশার কথা বলা ছিল। এখানে ডান-বাম রাজনীতি কোথায় ছিল?"

"ছিল, সুতীর্থদা ছিল। যারা দেখেছে তারা বুঝে গিয়েছে," মলয় বলতে থাকল, "তা ছাড়া আমাদেরও আশি জনের উপর সেল্‌স স্টাফ আছে। তাদের পরিবারের কারও ভাল লাগেনি নাটকটা দেখতে। আমাদের অফিসের নাটক দেখার জন্য অন্য অনেক বাইরের গেস্টকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাই। তাদের সামনে নাটকটা দেখতে, যথেষ্ট অস্বস্তি হয়েছে। কী যেন নাম ছিল আপনার হিরোর?"

"উইলি লোম্যান।"

"হ্যাঁ, ওই লোকটা যেন আমাদের কোম্পানিরই একজন কর্মী। ম্যানেজমেন্ট দিনের পর দিন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। লোকটার বাড়ির লোকজন যেন আমাদেরই বাড়িরই লোকজন। কী বিচ্ছিরি ভাবে দেখিয়েছিলেন, লোকটার ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছে না। বখে যাচ্ছে।

চুল নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন

চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুণিতে চুল উঠে এলে মন খারাপ হয় সকলেরই। কিন্তু চুল পড়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আবার অতিরিক্ত চুল পড়া নিয়েও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, আজকাল সঠিক চিকিৎসায় টাকেও চুল গজায়,জানাচ্ছেন এএমআরআই হাসপাতাল ঢাকুরিয়ার বিশিষ্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ **ডাঃ সন্দীপন ধর**।

প্রশ্ন ঃ সত্যিই টাকে চুল গজান সম্ভব?

ডাঃ ধর ঃ দেখুন টাক নানান প্রকৃতির হয়। কখনো এটি বংশগত সমস্যা কখনো বা অসুখ।'অ্যালোপেশিয়া 'এ্যারিয়েটা' রোগে মাথার কয়েকটি অংশে গোছা গোছা চুল পড়তে থাকে। উপযুক্ত চিকিৎসায় এই চুল আবার গজায়। অ্যালোপেশিয়া এ্যান্ড্রোজেনেটিকা বা বংশগত টাকেরও আজকাল উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করে দীর্ঘদিন ধৈর্য্য ধরে ওরাল ও লোকাল ট্রিটমেন্ট করলে এই টাকও চুলে ঢাকা পড়ে। তবে দু-চারটে চুল পড়া নিয়ে মাথা গরম করবেন না। প্রকৃতির নিয়মে প্রতিদিনই আপনা আপনি কয়েকটি চুল উঠে যায়, আবার কতগুলি গজায় এনিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করলে কিন্তু চুল পড়া বাড়তেই থাকবে।

প্রশ্ন ঃ দুশ্চিন্তায় চুল পড়ে?

ডাঃ ধর ঃ অবশ্যই অতিরিক্ত মেন্টাল স্ট্রেস বা স্ট্রেনে চুল পড়তে বা পাকতে দেখা যায়। সেইজন্যও পরিবারে অনেকের চুল পাকতে বা স্থায়ী ভাবে পড়ে যেতে দেখা যায়। আবার চেস্ট ইনফেকশন, ক্রনিক ডায়রিয়া, কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের অসুখ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি অসুখেও চুল পড়া, অসুখ সেরে গেলে আবার গজায়ও। তবে টাইফয়েড, চিকেন পক্স বা কেমোথেরাপির পরে অনেকেরই স্থায়ীভাবে চুল পড়ে যেতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ নিয়মিত তেল মাখলে ও শ্যাম্পুতে কি চুল ভাল থাকে?

ডাঃ ধর ঃ দেখুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো থাকতেই হবে। নিয়মিত তেল মাখলে চুলের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বাড়ে, শ্যাম্পুতে চুলের গোড়ায় ময়লা জমতে পারে না। তবে এসবই তো বাইরের দৃশ্যমান চুল বা হেয়ার শ্যাফটের জন্য। চুলের গোড়া বা হেয়ার ফলিকল থাকে ত্বকের গভীরে। এই অংশই চুলকে ধরে রাখে। তাই চুলকে সুন্দর ও মজবুত করতে বাইরে থেকে কোন ভিটামিন যুক্ত তেল বা লোশন মাখলে চলবে না খেতে হবে প্রচুর শাকসবজি ও ফল সমৃদ্ধ সুষম ডায়েট ও পান করতে হবে প্রচুর জল। আর একটা কথা যত্ন ভাল কিন্তু অত্যাচার ভাল নয় তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে স্ট্রেটনিং বা কারলিং করলে কিংবা ড্রায়ারে নিয়মিত শুকলে চুলের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্ন ঃ জলের জন্য বা স্থানগত কারণে কি চুল পাকে?

ডাঃ ধর ঃ চাকরী বা অন্য কোন কারণে স্থায়ীভাবে দেশ বা শহর বদল করলে দুশ্চিন্তায় অনেকেরই চুল পাকে বা পড়ে যায়। এর সঙ্গে জলের কোনও সম্পর্ক নেই। তাহলে তো কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু গেলে সকলের চুলই সাদা হত। পুষ্টির অভাবও কম বয়সে চুল পাকার একটা বড় কারণ। তবে হঠাৎ অল্প বয়সে চুল পাকতে শুরু করলে শ্বেতী হয়েছে কিনা জানতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

চুল বা ত্বকের সমস্যায় যোগাযোগ
M : 9874968139,
email : piubanerjee.brp@gmail.com

relation001@gmail.com

আপনি কী মেসেজ দিতে চেয়েছিলেন সুতীর্থদা?"

"আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ আ সেল্‌সম্যান' পৃথিবীর একটা বিখ্যাত মঞ্চ সফল নাটক..."

"আপনার কথায় ধরে নিচ্ছি তাই, তবে আপনাকে বেছে-বেছে ওটাই ফাইনাল করতে হল? আমি আপনাকে বলছি, নাটকটা দেখার সময় ম্যানেজমেন্টের সাহেবরাও খুব বিরক্ত হয়েছিলেন..."

দ্বিতীয় সারিতে বসা অসীম খুব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "একটা কথা জেনো মলয়, ম্যানেজমেন্টকে খুশি করার জন্য অফিস শেষে টানা তিনমাস আমরা রিহার্সাল করি না। অফিস পাড়ায় আমাদের নাটকের একটা ক্লাস তৈরি হয়েছে। সুতীর্থদার হাত ধরে বিদেশি নাটকের একটা আভিজাত্য তৈরি হয়েছে। নাটক নির্বাচনের ব্যাপারটা সুতীর্থদার হাতেই ছেড়ে দাও।"

মলয় দু'হাত উলটে বলল, "যাঃ বাবা। যদি মতামতই দিতে না পারলাম, তা হলে এই মিটিং ডাকার উদ্দেশ্য কী? সত্যি ফিডব্যাকটা দিলাম। গতবার সেল্‌সম্যানের জীবন নিয়ে যথেষ্ট আপত্তি উঠেছিল। এবার আবার সেই ট্র্যাভেলিং সেল্‌সম্যান। সে আবার পতঙ্গ হয়ে গিয়ে পচা খাবার খাচ্ছে। সত্যিটা যদি সুতীর্থদা নিতে না পারে, আমার কিছু করার নেই।"

অসীমের উত্তেজনাটা আরও বেড়ে গেল। গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমার ফিডব্যাকটা তোমার রাজনৈতিক বোধের মতোই একপেশে। গতবারের নাটকটা অনেকের ভাল লেগেছিল, সেটা তো বলছ না একবারও..."

কথার পিঠে কথা, বাক-বিতণ্ডা বাড়তেই থাকল। এক সময় নিখিল মুখার্জি অবস্থা সামাল দিতে সকলের উপর গলা চড়াল, "এভাবে সকলে মিলে কথা বললে কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকের বক্তব্য শুনব একে-একে।"

রিনরিনে গলায় রুমা বলে উঠল, "সুতীর্থদা আমার একটা কথা আছে। সেল্‌সম্যান বিতর্কে গিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' আর 'রক্তকরবী' মিশিয়ে কোলাজ জাতীয় কিছু একটা করুন না। আগের বছর পঁচিশে বৈশাখ আমাদের পাড়ায় করেছিল। একবার 'রক্তকরবী' একবার 'চণ্ডালিকা', আবার 'রক্তকরবী' আবার 'চণ্ডালিকা', কী সুন্দর করেছিল!"

সুতীর্থ ম্লান হাসল, "আমার দ্বারা রবি ঠাকুরের চচ্চড়ি রাঁধা হবে না রুমা। ইনফ্যাক্ট এতক্ষণ ধরে সকলের কথা শুনে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। এবার থেকে তোমরা আমাকে বাদ দাও।"

মলয় ঘুরে দাঁড়াল সুতীর্থর দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এই তো দাদা সেন্টু খেয়ে ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে দিলেন। আপনি ভাল করেই জানেন, আপনাকে ছাড়া নাটক হবে না। আমরা তো চাইছিলাম শুধু একটা দেশি সহজ সরল নাটক। অন্যায় করেছি কি?"

"না বিদেশি ক্ল্যাসিক। প্রত্যেকবার যেমন হয়," অসীমও এগিয়ে এল সুতীর্থর টেব্‌লের কাছে।

"রবি ঠাকুর কি আন্তর্জাতিক নয়?" রুমা গজগজ করতে থাকল।

নিরুপায় হয়ে যুযুধান সব পক্ষকে শান্ত করতে নিখিল মুখার্জি দু'হাত তুলে বলল, "আমার মনে হয়, সুতীর্থকে আরও কয়েকদিন সময় দেওয়া হোক। ও আর-একটু ভেবে দেখুক অন্য-কোনও গল্প পাওয়া যায় কি না!"

মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে নিজের ডেস্কে এসে গুম হয়ে বসে থাকল সুতীর্থ। গত ছ'মাস ধরে কাফকার এই গল্পটা নিয়ে নাটক করার চিন্তাটা ভিতরে-ভিতরে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। অন্য-কোনও গল্প ভাবার কথা এখন চিন্তাই করতে পারছে না সে। ভিতরে-ভিতরে একটা রাগও হচ্ছে। এমন সময়ে বেজে উঠল পকেটের মোবাইলটা। স্ক্রিনে ফুটে আছে জেনারেল ম্যানেজার রণেন গুপ্তর নামটা। ফোনটা ধরতেই রণেন গুপ্ত বললেন, "একবার আসবেন সুতীর্থবাবু?"

চেম্বারের দরজাটা আলতো করে ঠেলতেই রণেন গুপ্ত একটু যেন বেশিই উদাত্ত গলায় বলে উঠলেন, "আসুন, আসুন সুতীর্থবাবু। আপনাদের মিটিং কেমন হল?"

"ভাল! মৃদু স্বরে বসে সুতীর্থ দেখল রণেন গুপ্তর উলটোদিকে একজন ভারী চেহারার লোক বসে আছে। চাকচিক্যে এবং বসার ভঙ্গিমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা উঁচু দরের। রণেন গুপ্ত আহ্বানের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটাও ঘাড় ঘুরিয়ে সুতীর্থকে দেখে বলল, "কী, চেনা যাচ্ছে?"

কোনও চেনা লোকের সঙ্গে মুখটা মেলানো যাচ্ছে না। রণেন গুপ্তও রহস্য ভাঙছে না। মুখে মিটি-মিটি একটা হাসি। লোকটা এবার চেয়ার ছেড়ে সুতীর্থর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "আমি রে। আমি পার্থ। চিনতে পারছিস না?"

পার্থ নামটা বড্ড কমন। চেনাজানা যতজন পার্থ আছে, তাদের কারও সঙ্গেই মুখটা মিলছে না। সুতীর্থ অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রণেন গুপ্ত শেষ পর্যন্ত রহস্যটা ভাঙলেন, "আপনার স্কুলের বন্ধু সুতীর্থবাবু, মিস্টার পার্থপ্রতিম সেন।"

মাথার মধ্যে স্মৃতির চালচিত্রটা দ্রুত রিওয়াইন্ড করতে শুরু করল। শক্তিপুরের ভগবতী বয়েজ স্কুল। কাদা প্যাচপেচে একটা এবড়ো-খেবড়ো ফুটবল খেলার মাঠ। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করতে-করতে একটা ছেলে পায়ের বলটা কেড়ে নিতে চাইছে। তারপর তাকে ডজ করতে যেতেই পাশ থেকে একটা ল্যাং খেয়ে ছেলেটার গায়ের উপর পড়ে যাওয়া।

"হোয়াট আ ডিসকভারি," পার্থ আরও এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থকে। বড় মানুষ হলে গায়ের গন্ধও বোধ হয় পালটে যায়। পার্থর গায়ে সেই ঘামে কাদায় মাখামাখি গন্ধটা নেই। তার জায়গায় হালকা বিদেশি ফুরফুরে একটা গন্ধ। এই লোকটার পিঠে হাত দিতে আরও বেশি করে 'তুই' বলতে প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল সুতীর্থর।

"কী আশ্চর্য দ্যাখ, তোদের অফিসে আমি রণর কাছে আগেও দু'-একবার এসেছি। কিন্তু কখনও জানতে পারিনি যে, তুই এখানে আছিস। আজ যখন ঢুকছি তখন কয়েকজন রণর সঙ্গে তোদের নাটকের মিটিং নিয়ে কথা বলছিল। সুতীর্থ পালচৌধুরী নামটা দু'-একবার কানে আসতেই কীরকম সন্দেহ হল। এই নাম-সারনেম কম্বিনেশন আবার পৃথিবীতে দু'টো আছে নাকি! রণকে বলতেই কম্পিউটারে তোর এইচ আর প্রোফাইল চেক করে কনফার্ম করল, এ শালা সেই ভগবতী বয়েজ স্কুলের পাপী। তুই যে সল্টলেকে ঘাপটি মেরে আছিস, আর এই অফিসে কাজ করিস..."

এড়াতে পারল না সুতীর্থ। একটু পরই স্থান হল পার্থপ্রতিম সেনের দামী গাড়ির হিটারের হালকা উষ্ণতার আবহে তুলতুলে সিটে। হঠাৎ করে স্কুলের এক পুরনো বন্ধুকে আবিষ্কার করে পার্থর এই বাঁধাহীন উচ্ছ্বাসকে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি মনে হতে থাকল সুতীর্থর। তা ছাড়া এই পার্থ আর সেই পার্থ নেই। জি এম-কে 'রণ' 'রণ', 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। পার্থর সঙ্গে ব্যবহারে রণেন গুপ্তর চাটুকারিতাটাও চোখ এড়ায়নি সুতীর্থর।

"চল, টু সেলিব্রেট দিস রিইউনিয়ন, লেট্‌স মেক আ গ্রেট স্যাটারডে ইভনিং!"

"আজকে হবে না। বাড়িতে একটা কাজ আছে," ভাববাচ্যে কথাটা বলে পার্থকে আবার এড়াতে চাইল সুতীর্থ।

"গিন্নি বাড়িতে ডান্ডা হাতে বসে আছে, তাই তো? তো কিছু করেন শ্রীমতী?"

"ডাক্তার," ফিসফিস করে বলল সুতীর্থ।

"বলিস কী রে শালা... এক্কেবারে ডাক্তারকে ফাঁসিয়েছিস..."

কথাটা ঠক করে বুকে লাগল সুতীর্থর। এইচ আর প্রোফাইল থেকে পার্থ নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছে সুতীর্থ পালচৌধুরী একজন সামান্য সেকশন ক্লার্ক ইন চার্জ। তার বউ কী করে ডাক্তার হতে পারে?

"কেন আমার বউ কি ডাক্তার হতে পারে না?" শ্লেষের সঙ্গে বলেই ফেলল সুতীর্থ।

"আলবাত পারে," সুতীর্থর থাইয়ে একটা জোরে চাপড় মারল পার্থ, "তবে যে ক'জন ভগবতী বয়েজের পাপীর সঙ্গে কনট্যাক্ট আছে,

এই ব্যাপারে তুই-ই ফার্স্ট। আমার, অখিল, বিপ্লবের, কোনও শালার ডাক্তার বউ নেই। পঁয়তাল্লিশ প্লাস হয়ে গেল। যাব একদিন তোর গিন্নির কাছে হার্ট চেকআপ করিয়ে আসব। তা তোর ছেলেপুলে?"

"এক। পুনেতে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড ইয়ার," একসঙ্গে ছেলে সম্পর্কে সবটুকু তথ্য জানিয়ে দিল সুতীর্থ।

"সেকেন্ড ইয়ার? মাই গড। আমার মেয়ে তো সবে সেভেন। তুই কত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলি বাপ?"

"ও তখন মেডিক্যাল থার্ড ইয়ার। আমি..." সুতীর্থ নিস্পৃহ গলায় এবারও পার্থর প্রশ্নের এক সংখ্যার উত্তরের বদলে সবটুকু তথ্য দিতে আরম্ভ করলেও পার্থ সবকিছু শেষপর্যন্ত শোনার ধৈর্য দেখাল না।

"হোয়াট আ লাইফ! আর্লি ম্যারেজ, সল্টলেকে বাড়ি, বউ ডাক্তার, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার প্রায় হয়ে পড়ল... ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ্‌ড এভরিথিং ম্যান। তুই নাটক নিয়ে থাকবি না তো কে থাকবে? জমিয়ে চালিয়ে যা।"

পার্থ কি ব্যঙ্গ করছে? একটা মোড়ে ট্র্যাফিক সিগন্যালটা লাল হতে গাড়িটা দাঁড়াল। সুতীর্থ আচমকা বলল, "আমি এখানে নামব।"

পার্থ অবাক হল, "সে কী রে, তোর বাড়ি তো সল্টলেকে। এই তো বললি বাড়িতে একটা কাজ আছে। তোকে বাড়িতে ড্রপ করে বাইপাস দিয়ে আমি সাউথ সিটি পৌঁছে যাব! কোনও প্রবলেম হবে না..."

"আর-একটা কাজ মনে পড়ে গেল। প্লিজ..." পার্থকে আর জোরাজুরির অবকাশ না দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল সুতীর্থ।

উষ্ণতা থেকে বেরিয়ে পৌষের ঠান্ডায় গা ভাসিয়ে আরাম হল সুতীর্থর। বিদেশি রাজনৈতিক রঙের নাটক, রণেন গুপ্তর চেম্বারে দামি কাপে চা, পার্থর গায়ের বিদেশি গন্ধ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন যে পরতে-পরতে অস্বস্তির পুরু প্রলেপটা সারা শরীরটাকে ছেয়ে ফেলেছিল, সেটা গলতে আরম্ভ করল। সারাদিনের পুঞ্জীভূত বিরক্তি, রাগ, অপমানগুলোকে একটানে ছুড়ে ফেলে দিতে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল সুতীর্থ।

রোববার, ২২ ডিসেম্বর

মোবাইলের লাল বোতামটা টিপে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে প্রবীর দাশগুপ্ত চিৎকার করে উঠল, "ধ্যার শালা, হারামিটা বোঝেও না লাইনটা কেটে দিচ্ছি! সেই দু'মিনিট অন্তর ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে!"

তেতো মুখে প্রবীর দাশগুপ্ত এবার বউ মানসীকে নিয়ে পড়ল, "আর তুমিও তেমনি। মেয়ের পেটে বাচ্চা এল, আর তুমি পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারছ না। আমাকে এসেছ এতদিন পর বলতে।"

"বলছি তো, আমি পরশু রাতেই জেনেছি। তারপর কালকেই আরামবাগে নিয়ে গিয়েছিলাম..."

মানসী দু'চোখ লাল করে ফোলা মুখটা দু' হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল। মানসীর এভাবে বসে থাকাটা দেখে অসহ্য ন্যাকামো মনে হল প্রবীরের। চেয়ারটা সশব্দে ঠেলে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে-করতে অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, "শুয়োরের বাচ্চাটা কে, নামটা একবার বের করতে পারছ না?"

অসহায় চোখে মানসী প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ছেলেটার নামের চেয়েও বিপদটা তুমি বুঝছ না। ডাক্তার বলছে অ্যাবর্শন করা..."

প্রবীর ঝামড়ে উঠল, "এই নিয়ে চোদ্দোবার একই কথা বলে যাচ্ছ। পরশু রাতে জেনেছি... কাল আরামবাগে নিয়ে গিয়েছি... আজ ডাক্তার দেখে বলেছে অ্যাবর্শন করা যাবে না... অ্যাবর্শন করা রিস্ক আছে... কীসের রিস্ক? অ্যাবর্শনের বাপ করা যাবে। তার আগে আমার শুয়োরের বাচ্চাটার নাম চাই। কেটে কুচি-কুচি করে কুত্তাকে খাওয়াব।"

মানসীর আরও অসহায় লাগছে। ভেবেছিল প্রবীরকে না জানিয়ে ব্যাপারটা সামলে ফেলা যাবে। মেয়েটা চরম বোকার মতো কাজ করেছে। প্রথম দু'মাস নিজেই বুঝতে পারেনি। তারপর যখন বুঝতে পেরেছে, খবরটা কিছুই বলেনি। কার বুদ্ধিতে কে জানে, মেয়েটা বোকার মতো ওষুধপত্তর খেয়ে নিজেই গর্ভপাতের চেষ্টা করেছিল। নিজের মেয়েকে আর কিছুতেই শিক্ষিত-বুদ্ধিমতী-আধুনিক মেয়ে ভাবতে পারছে না। মায়ের কাছে দু' মাস ধরে লুকিয়ে গেল বোকা মেয়েটা। নিজেকে যদি অত স্মার্টই মনে করেছিল, নিজেই যদি চুপচাপ ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে ভেবেছিল, তা হলে পুরোটাই মিটিয়ে ফেলল না কেন? মানসীর নিজেকে মনে হল সে আরও বোকা মা। কিছুটি বুঝতে পারেনি! মেয়ের বাপ যে গালমন্দ করছে, কিচ্ছু অন্যায় করছে না। সত্যিই তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল! মেয়েটা এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছিল। ঢিলে পোশাক পড়ছিল। আর শেষ পর্যন্ত পরশুদিন রাতে যখন বলল, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল মানসীর। কাউকে কিছু বলার আগে আরামবাগে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল মেয়েকে নিয়ে। সেখান থেকে দূরের এক ক্লিনিকে, যেখানে কেউ ওদের পরিচয় জানে না। ক্লিনিকের ডাক্তার পরীক্ষা করে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, মেয়েটার এখন শরীরের যা অবস্থা, অ্যাবর্শন করায় রিস্ক আছে।

মানসী বুঝতে পেরেছিল, এবার এটা প্রবীরকে জানাতেই হবে। তবে প্রবীরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা কী হবে, সেটাও জানা ছিল। একটা অনর্থ ঘটিয়ে ছাড়বে। চণ্ডাল রাগ প্রবীরের। মেয়েকে হয়তো টুঁটি টিপে মেরেই ফেলবে। আর মেয়েও বাপের যোগ্য মেয়ে। হিমালয় প্রমাণ জেদ। পেটে পাপ গজিয়ে মুখে একটাও কথা বলছে না।

প্রবীর দাশগুপ্তর চিৎকার থামছে না, "তোমার জন্য... সব তোমার আশকারা আর লাই পেয়ে-পেয়ে। আর শাসন করবেই বা কী? ব্যক্তিত্ব বলে কোনও বস্তুই তো নেই তোমার মধ্যে! ছেলেটার নাম বলবে না মানে? জুতিয়ে আমি মেয়ের মুখ থেকেই আগে নামটা বের করব। তারপর দেখাব আমি কী করতে পারি, আর অ্যাবর্শন করাতে পারি কি না!"

"তুমি বুঝতে পারছ না..." মানসী মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করল।

"চোওপ! আর একটা কথা বলবে না তুমি," প্রবীর হন-হন করে ঘরের এক কোণে চলে গেল। ড্রেসিং টেব্‌লের একপাশে নামী স্যাঁকরার দোকানের টেব্‌ল ক্যালেন্ডার রাখা আছে। ডিসেম্বর মাসের ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে এক দীর্ঘ গ্রীবার সুন্দরী খোলা গায়ে এক গা গয়না পরে মাদক চাহনি নিয়ে প্রবীর দাশগুপ্তর দিকে চেয়ে আছে। সেটা দেখে মেজাজটা আরও বিগড়ে গেল। ক্যালেন্ডারটা ছিনিয়ে নেওয়ার মতো করে হাতে তুলে নিয়ে বলল, "কত মাস চলছে বললে?"

"সতেরো সপ্তাহ।"

"আঃ! মাসে বলো।"

"চার।"

"মানে আর ছ' মাস!" প্রবীর গুনতে থাকল, "ডিসেম্বর, জানুয়ারি... এপ্রিল, মে... অসাধারণ! মে মাসে ইলেকশন, অ্যাবর্শন হবে না, আইবুড়ো মেয়ে আমার বিয়োবে। কী আনন্দ। এই না হলে মেয়ে। আমার মেয়ে বাপকে যা বাঁশ দিয়েছে, বীরেশ্বর মজুমদারও এই বাঁশ দিতে পারবে না। বাড়িতে কী করতে থাক তুমি? মেয়ে কার সঙ্গে কী করে বেড়াচ্ছে খেয়াল নেই তোমার!"

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে মানসী বলে ওঠার চেষ্টা করল, "মেয়েটা তো বাড়িতে সারাক্ষণই কম্পিউটার নিয়ে থাকে। কী করে জানব যখন দিঘায় গিয়েছিল... দিঘায়... এটুকুই শুধু জানতে পেরেছি... তারপর নিজেও চেষ্টা করেছিল..."

"চেষ্টা করেছিল? ছাই করেছিল..." ক্যালেন্ডারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মানসীর দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল প্রবীর, "শোনো, তোমাকে দু'টো কথা স্পষ্ট করে বলছি। এক নম্বর, কোন ডাক্তার কী বলছে জানি না। পৃথিবীতে হয় না এমন কোনও জিনিস নেই। তোমাকে আমি এক সপ্তাহ সময় দিলাম। দশ জায়গায় ঢাক না পিটিয়ে যাকে দেখিয়েছ, তার কাছে বেশি করে নোট বিলিয়ে মেয়ের সব ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে তবেই বাড়িতে ফিরিয়ে এনো।

আর দু'নম্বর, ছেলেটার নাম আমার চাই। এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্তও হতে পারে।"

মানসী আবার দু' হাতে মুখ ঢাকল। মনে-মনে একটা আশা ছিল, প্রবীরের প্রাথমিক ঝাপটা কেটে গেলে কিছু একটা দিশা দেখাবে। মানসীর অগাধ বিশ্বাস আছে, জটিল সমস্যার সমাধান প্রবীর যেভাবে কূটকচালি করে, নিজের মেয়ের সমস্যাটার সেরকম একটা সমাধান বের করবেই ও। কিন্তু প্রবীর কিছুতেই বুঝতে চাইছে না যে, মৃন্ময়ীর গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। যে ডাক্তার দেখেছিলেন, তিনি মানসীর আকুল অনুনয় শোনেননি। উলটে চেষ্টা করার বিপদটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মানসী কান্নায় ভেঙে পড়ল, "আমি সব দোষ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একবারটি বোঝার চেষ্টা করে দ্যাখো, অ্যাবর্শনে ঝুঁকি রয়েছে!"

"ঝুঁকি? কীসের তখন থেকে ঝুঁকি-ঝুঁকি বলে যাচ্ছ?"

"প্রেগন্যান্সির সঙ্গে ওর ব্লাড প্রেশার হয়েছে, হিমোগ্লোবিন কমে গিয়েছে। যদি কিছু একটা হয়ে যায়... আমাদের একটা মাত্র মেয়ে..."

"একটা মাত্র মেয়ে তোমার। আমার কোনও মেয়ে নেই।"

মানসী আরও ফুঁপিয়ে উঠল, "ঠিক আছে, ডাক্তার রাজি না হলে মেয়েটা তা হলে গলায় দড়ি দিক।"

হঠাৎ প্রবীর দাশগুপ্ত চমকে উঠল। স্থির একটা দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। মাথার মধ্যে রাজনৈতিক স্নায়ুকোষগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আত্মহত্যা! আজকাল ছেলেমেয়েগুলো কথায়-কথায় আত্মহত্যা করে বসে। মানেই পোস্টমর্টেম। চার মাসের গর্ভবতী। রিপোর্ট যদি চাপা না যায়, বীরেশ্বর মজুমদারের হাতে নৈবেদ্য তুলে দেওয়া।

"যাও, তুমি বেরোও আমার সামনে থেকে। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও।"

মানসী বেরিয়ে যাওয়ার পরও প্রবীর দাশগুপ্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ভোটের মাস, একটা ভ্রূণ, আত্মহত্যা, একটা শুয়োরের বাচ্চা দিঘায় গিয়ে... মাথাটার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে! আলমারি খুলে একটা হুইস্কির পাইট পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে দোতলার শোয়ার ঘর থেকে নীচে নেমে এল। নীচে বড় একটা হলের লাগোয়া একটা ছোট ঘর। এই ঘরটাই প্রবীর দাশগুপ্তর বাড়ির অফিস।

অফিস ঘরে ইউনিক রোলিং মিলের মালিক আর ম্যানেজারের সঙ্গে চারজন পার্টির ছেলে বসে আছে। গম্ভীর গলায় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের প্রবীর দাশগুপ্ত বলে দিল, "আজ কথা বলতে পারব না। শরীরটা ভাল নেই।"

ইউনিক রোলিং মিলের মালিক হতাশ হল যে, উজ্জ্বল চাকলাদার অন ডিউটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়নি, তার বউকে চাকরি দেওয়া নিয়ে ইউনিয়নের একটা অশান্তি ক্রমশ তিল থেকে তাল হয়ে গিয়েছে। প্রোডাকশন মার খাচ্ছে। আসলে উজ্জ্বল চাকলাদার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। খবর আছে, কারখানায় নিজের ইউনিয়নের শক্তিকে পোক্ত করতে ভিতরে-ভিতরে প্রবীর দাশগুপ্ত কলকাঠি নাড়ছে। ব্যাপারটার সমাধান করতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আজ রোববার প্রবীর দাশগুপ্তর বাড়িতে একটা একান্ত বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেটা ভেস্তে যেতে ইউনিক রোলিং মিলের মালিক আমতা গলায় বলে উঠল, "তা হলে স্যার কবে?"

"চলুন, চলুন। প্রবীরদার শরীর ভাল হলে আমরা জানিয়ে দেব," পার্টির ছেলেরাই উত্তরটা দিয়ে দিল।

ইউনিক রোলিং মিলের মালিক একটা বড় মিষ্টির বাক্স টেব্‌লের উপর নামিয়ে রেখে বলল, "বড়দিনের জন্য একটু মিষ্টি স্যার..."

পার্টির ছেলেরা আর কথা বাড়তে দিল না। ওদের বিদেয় করে দিল। তারপর প্রবীর দাশগুপ্ত ছেলেগুলোকে বলল, "তোরাও এগো আজকে। শরীরটা আজ সত্যিই ভাল নেই।"

প্রবীর দাশগুপ্তর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মুড সাংঘাতিক অফ আজকে। নিশ্চয়ই পার্টির উপর থেকে প্রবীরদার জন্য কোনও খারাপ খবর এসেছে! ছেলেগুলো আর কথা না বাড়িয়ে উঠতে যাবে এমন সময়, প্রবীর বলে উঠল, "তোরা যাওয়ার সময় রূপককে একবার ভিতরে পাঠিয়ে দিস তো!"

রূপক একটু আগে মানসী দাশগুপ্তকে নিয়ে আরামবাগ থেকে ফিরেছে। আজ রোববার। ভেবেছিল আজকে আর কোনও ডিউটি পড়বে না। শুধু গাড়িটা গ্যারাজ করে করার হুকুম হয়ে গেলেই সাইকেল নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবে। ছ'মাসও হয়নি বিয়ে হয়েছে। এই জাঁকালো শীতে বউটাকে ছেড়ে বেশিক্ষণ মন টেকে না রূপকের। তবে ইউনিক রোলিং মিলের মালিক বেরিয়ে যাওয়ার পর-পরই ভিতরে ডাক পড়ায় ভিতরে একটা আশারও সঞ্চার হল। ইউনিক রোলিং মিলে ড্রাইভারির একটা পাকা চাকরি প্রবীর দাশগুপ্ত ভেবে দেখবে বলেছে।

উৎসুক মুখটা আড়াল করে প্রবীর দাশগুপ্তর অফিসঘরে এল রূপক। প্রবীর দাশগুপ্ত কাচের গেলাসে হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে ইস্পাত ঠান্ডা গলায় বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দে।"

রূপক দরজা বন্ধ করার সময় হুইস্কির গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়ে একদৃষ্টে রূপকের দিকে চেয়ে থাকল প্রবীর দাশগুপ্ত। ড্রাইভার জাতটা সাংঘাতিক। হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় ওদের কাছে। মানসী মৃন্ময়ীকে আরামবাগে রেখে এসেছে। মৃন্ময়ী যেমন ছেলেটাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, মেয়ের মা-ও কী-কী আড়াল করার চেষ্টা করছে জানা দরকার। তা ছাড়া... হুইস্কির কয়েকটা চুমুকে মাথাটা ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকল প্রবীর দাশগুপ্তর। "আগস্ট মাসে মৃন্ময়ীকে দিঘা তুই নিয়ে গিয়েছিলি না?"

"হ্যাঁ স্যার!" এতদিন পর প্রশ্নটা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রূপক।

"কে-কে গিয়েছিল?"

"দিদির বন্ধুরা।"

"বন্ধুরা তো জানি। কোন-কোন বন্ধুরা?"

"শিঞ্জিনীদি, তানিয়াদি আর..." রূপক একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "আর আমার বউ শ্যামলী। পিংপং-ও গিয়েছিল।"

"ক'দিন ছিল ওরা?"

"দু'দিন স্যার। চোদ্দোই আর পনেরোই অগস্ট। পরদিন সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম," চিন্তা করে ঠিকঠাক তারিখটা বলল রূপক।

"কোথায় ছিল ওরা?"

"হোটেলে..."

"তুই বউকে নিয়ে কোথায় ছিলি?"

"ওই হোটেলেই স্যার। একতলার ঘরে। দিদিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।"

"বুঝেছি!" হুইস্কিটা শেষ করে পরেরটা ঢালতে-ঢালতে প্রবীর দাশগুপ্ত জেরা চালাতে থাকল, "দিদির কোনও ছেলেবন্ধুদের দেখেছিলি ওই হোটেলে?"

"কই না তো!" রূপক থতমত খেয়ে উত্তর দিল।

গুম হয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রবীর দাশগুপ্ত গর্জে উঠল, "তা দেখবি কেন? তুই বউকে জড়িয়ে শুয়েছিলি আর সেই ফাঁকে আকাশ থেকে দেবতা এসে তোর দিদির পেটে বাচ্চা পেড়ে দিয়ে গিয়েছে!"

রূপকের পা-টা আলগা মনে হল। প্রবীর দাশগুপ্তর মুখ খুব খারাপ। কিন্তু খারাপ মুখ থেকে যে তথ্যটা বেরিয়ে এল, অনেক কিছুই যেন দু'য়ে দু'য়ে চার হয়ে যাচ্ছে! কাল সকালে মা মেয়েতে আরামবাগ গিয়েছিল। রাস্তায় কেউ কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। দু'জন জানালার দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। আজ সকালে আরামবাগ থেকে অনেকটা দূরে বউদি-দিদিকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারখানা থেকে বউদি যখন বেরোল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা। তারপর দিদিকে আরামবাগে রেখে একাই বাড়ি ফিরেছে। রাস্তায় কারও কল রিসিভ করেনি। মাঝে-মধ্যেই দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল!

"তোকে কি আমি হারামের টাকায় হনিমুন করতে দিঘা পাঠিয়েছিলাম হারামজাদা?" চিৎকার করে উঠল প্রবীর দাশগুপ্ত, "বল, কোন ছেলে এটা করেছে?"

মনে লাগল রূপকের। শ্যামলীকে নিয়ে তো যেতে চায়নি। দিদিই জোর করেছিল। সমুদ্রের ধারে শ্যামলীকে নিয়ে দু'দিন স্বপ্নের জীবন কাটিয়েছে রূপক। আর ছেলে? কোনও ছেলেকেই তো দ্যাখেনি রূপক।

প্রবীর দাশগুপ্ত রূপকের দিকে তেড়ে এসে বলে উঠল, "চুপ করে আছিস কেন? মারব শালা উলটো হাতে এক ঝাপড়... প্রবীর দাশগুপ্তকে চিনিস না তুই। তোকে আমি পাঠিয়েছিলাম কী করতে?"

শরীরটাকে কাঠ করে মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিল রূপক। ভারী অন্যায় করেছে। সত্যিই তো দিদিকে একা ছেড়ে দিদির বন্ধুদের নিয়ে বাঁকিপুর যাওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি... সেই সময়ই হয়তো... তাই প্রবীর দাশগুপ্তর উলটো হাতটা যদি গালে এসে পড়ে, দোষ দেওয়া যাবে না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে নিয়ে থাপ্পড় খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল রূপক।

ঘাড়ে প্রবীর দাশগুপ্তর জোরে থাবাটা পড়তে চমকে উঠল রূপক। মুখ তুলে দেখল প্রবীর দাশগুপ্তর হাতে ধরা গেলাসের মদ আর মেজাজ দু'টোই মিলিয়ে গিয়েছে। প্রবীর দাশগুপ্ত রূপকের কাঁধটা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, "তোকে আমি বিশ্বাস করি রূপক। আমার নিজের মেয়ে আমার কফিনে পেরেক ঠুকে দিয়েছে। বিরাট চক্রান্ত। কিন্তু চক্রান্ত করে ওরা আমাকে শেষ করে দিতে পারবে না। ক'টা দিন... যে ক'টা দিনের মধ্যে সব ঝেড়ে ফেলতে না পারি, তোকে আমার সবচেয়ে কাছের লোক হয়ে থাকতে হবে।"

রূপক দেখল, দ্রুত একটার পর একটা হুইস্কি খেতে-খেতে প্রবীরের গলা ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে। টেব্‌লের দিকে এগোতে গিয়ে একটু টাল খেয়ে টেব্‌লের কোনাটা ধরল। তারপর খাবলে টেব্‌লের উপর থেকে একটা মিষ্টির বাক্স নিয়ে এসে রূপকের হাতে দিয়ে বলল, "এটা রাখ তুই।"

মিষ্টির বাক্সটা হাতে নিল রূপক। ইউনিক রোলিং মিলের মালিককে এই মিষ্টির বাক্সটাকে নিয়ে ঢুকতে দেখেছিল। বাক্সটা বেশ ভারী। কী আছে? প্রবীর দাশগুপ্তর চোখ বাঁচিয়ে কায়দা করে একটা আঙুল মিষ্টির বাক্সে ভরে দিল। ভিতরে বইয়ের পাতার মতো কিছু আছে। ঠিক তখনই ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দিতেই টেব্‌লটা মৃদু আলোতে ভরে উঠল। গোটা রেস্তরাঁটা সাজানো হয়েছে। গোলাপি, নীল ল্যাম্প আর মোমবাতির আলোতে যেন মুখটা আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠল ডাক্তার অন্তরা পালচৌধুরীর! ওমপ্রকাশ গাড়োডিয়া অস্ফুটে বলে উঠল, "তোমাকে বিউটিফুল দেখাচ্ছে ডক।"

অন্তরা অল্প একটু হাসি ছড়িয়ে রহস্যটা আর-একটু ঘন করে বলল, "থ্যাংকস ফর ইয়োর কমপ্লিমেন্ট্‌স। এত বিউটির তুমি কী দেখলে শুনি। আমার ছেলের বয়স কুড়ি।"

"নিজের বয়স নিয়ে সবসময় এত চিন্তা করো কেন? ইয়োর বিউটি ইজ় এজলেস। অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট? দেয়ার আর সার্টেন থিংস অন দিস আর্থ হুইচ কান্ট বি ডেসক্রাইব্‌ড। লাইক ইয়োর বিউটি। হুইচ ক্যান জাস্ট বি ফেল্ট..."

"সো হোয়াট আর ইউ ফিলিং?"

"অ্যারোমা অফ বিউটি..." আলতোভাবে চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস নিল ওমপ্রকাশ।

টেব্‌লের উপর ওমপ্রকাশ দু'আঙুলে আলতো করে তাল ঠুকতে লাগল। আংটিগুলোতে চুনি-পোখরাজ মোমবাতির আলোয় চিকচিক করছে। হেসে ফেলল অন্তরা। চোখ পাকিয়ে বলল, "ইউ ফ্লার্ট, আমরা এখানে এসেছি বিজ়নেস নিয়ে কথা বলতে, তারপর ডিনার।"

"তোমাকে একটা কথা বলি ডক, প্লিজ়, ফর সাম টাইম চলো আমরা বিজ়নেস ওয়র্ল্ডটাকে ভুলে যাই। ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালের যাবতীয় সমস্যা ভুলে যাই। চিন্তা করি শুধু তিনটি বিষয় নিয়ে, তুমি, আমি অ্যান্ড দিস ক্যান্ডেল লাইট!"

এমন সময় আবার বেজে উঠল অন্তরার ফোনটা। পাঁচমিনিটের মধ্যে এই নিয়ে দু'বার। আগের দু'বারই অন্তরা দেখেছে ফোনটা এক পেশেন্ট পার্টির। লাইনটা কেটেও দেয়নি। ধরেওনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে কখন রিং হওয়া বন্ধ হয়। এবারও ফোনটা বাজতে শুরু করলে অন্তরা আর স্ক্রিনে নামটা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলল, "উফ, লোকটা মহা বাগিং। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শুধু জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছে?' যেন আমি 'ভাল আছে' বললেই পেশেন্ট ভাল হয়ে যাবে!"

"হয় আমার মতো মোবাইলটাকে অফ করে রাখো, না হলে সিম্পলি রিসিভ দ্য কল। না হলে ওটা বাজতেই থাকবে।"

অন্তরা ফোনটা ধরতেই ওমপ্রকাশ টেব্‌ল ছেড়ে উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খাওয়ার জন্য ভিতরটা আনচান করছিল। দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে গেল। অন্তরা ওর পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কথা বলুক, ততক্ষণে স্মোকিং জ়োনে গিয়ে সিগারেটটা খেয়ে নেওয়া যাবে!

সিগারেট খেয়ে ওমপ্রকাশ যখন ফিরে এল, দেখল অন্তরা চিন্তিত মুখে বসে আছে। চেয়ারে বসে ওমপ্রকাশ বলল, "হোয়াট্‌স আপ ডক?"

দু'চুমুক জল খেয়ে অন্তরা একটু গম্ভীর গলায় বলল, "ইট ওয়জ় প্রবীর দাশগুপ্ত। তোমাকেই খুঁজছিল। সুইচ অফ পেয়ে আমাকে করেছিল।"

ওমপ্রকাশ জানতে চাইল, "কী হল তার আবার? এবার কি তোমাকে চমকাচ্ছে? কাজ বন্ধ করে দেবে?"

"অন্য চমক। লোকটার মেয়ে এক কাণ্ড বাঁধিয়েছে। কনসিভ করে বসেছে!"

মেনুকার্ড থেকে চোখটা তুলল ওমপ্রকাশ, "হোয়াট আ নিউজ়! যাক ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালের কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রথম পেশেন্ট তা হলে পাওয়া গেল! তো কী চায় এখন? তোমার কাছে ফ্রি ট্রিটমেন্ট, তারপর ফ্রি মেটারনিটি বেড?"

"মেয়েটা আনম্যারেড। সেভেনটিন উইক্‌স চলছে। প্রবীর দাশগুপ্ত ওয়ান্টস টু টার্মিনেট দ্য প্রেগন্যান্সি ইমিডিয়েটলি। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে সামনা-সামনি আলোচনা করতে চায়। ফোনে বলল না।"

"ওহ! অ্যাবর্শন! কী আর আলোচনা করবে? কেউ কিচ্ছুটি জানতেও পারবে না। যাঃ! তা হলে ডেল্টা গাড়োডিয়ার প্রথম পেশেন্টটা স্লিপ করে গেল। কিন্তু তোমাকে যখন বলেছে, কাজটা তোমাকে করতেই হবে। তো কলকাতায় এনে নামিয়ে দাও। এ তো তোমার কাছে জলভাত!"

"ধুস! আমি এসব ঝামেলা নেব না। অহেতুক অ্যাবর্শন করা আমার কাছে একটা জঘন্য কাজ। কাউকে একটা রেফার করে দেব।"

ওমপ্রকাশ তেরচা হাসল, "একটা জিনিস কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ডক। ডেল্টা গাড়োডিয়ার চেন হসপিটালের যে ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্টটা আমরা গৌরবপুরে করেছি, সেটা সাকসেসফুল করতে গেলে প্রবীর দাশগুপ্তর মতো হেভিওয়েট পলিটিশিয়ানকে কিন্তু গুড হিউমারে রাখতেই হবে। ক'দিন আগে দেখেছিলে তো রিফ্লেক্টর ফিল্ম নিয়ে কী একটা ননসেন্স ইসু করেছিল। এবার গাড্ডায় পড়ে দরকার হচ্ছে তোমাকে। জাস্টিস অফ অলমাইটি। বাট ইট শুড বি গিভ অ্যান্ড টেক। গিভ-টা তুমি করে দাও, টেক অ্যাওয়ে-টা আমি বলে দেব। তোমাকে শুধু একটা কথাই বলব, ডোন্ট মিস দ্য চান্স। বিফোর আই অর্ডার ফর দ্য ড্রিংক, থ্রো অ্যাওয়ে দিস ট্র্যাশ অ্যান্ড ননসেন্স ইভনিং স্পয়লার।"

অন্তরার হাতের উপর হাত রাখল ওমপ্রকাশ, "বলো, কী অর্ডার দেব তোমার জন্য?"

"সামথিং হার্ড। ভীষণ হেকটিক টাইম যাচ্ছে, আমার নার্ভগুলোর জন্য হার্ড কিছু একটা দরকার।"

"কেন, আবার কিছু ঝামেলা হল নাকি তোমার বরের সঙ্গে?"

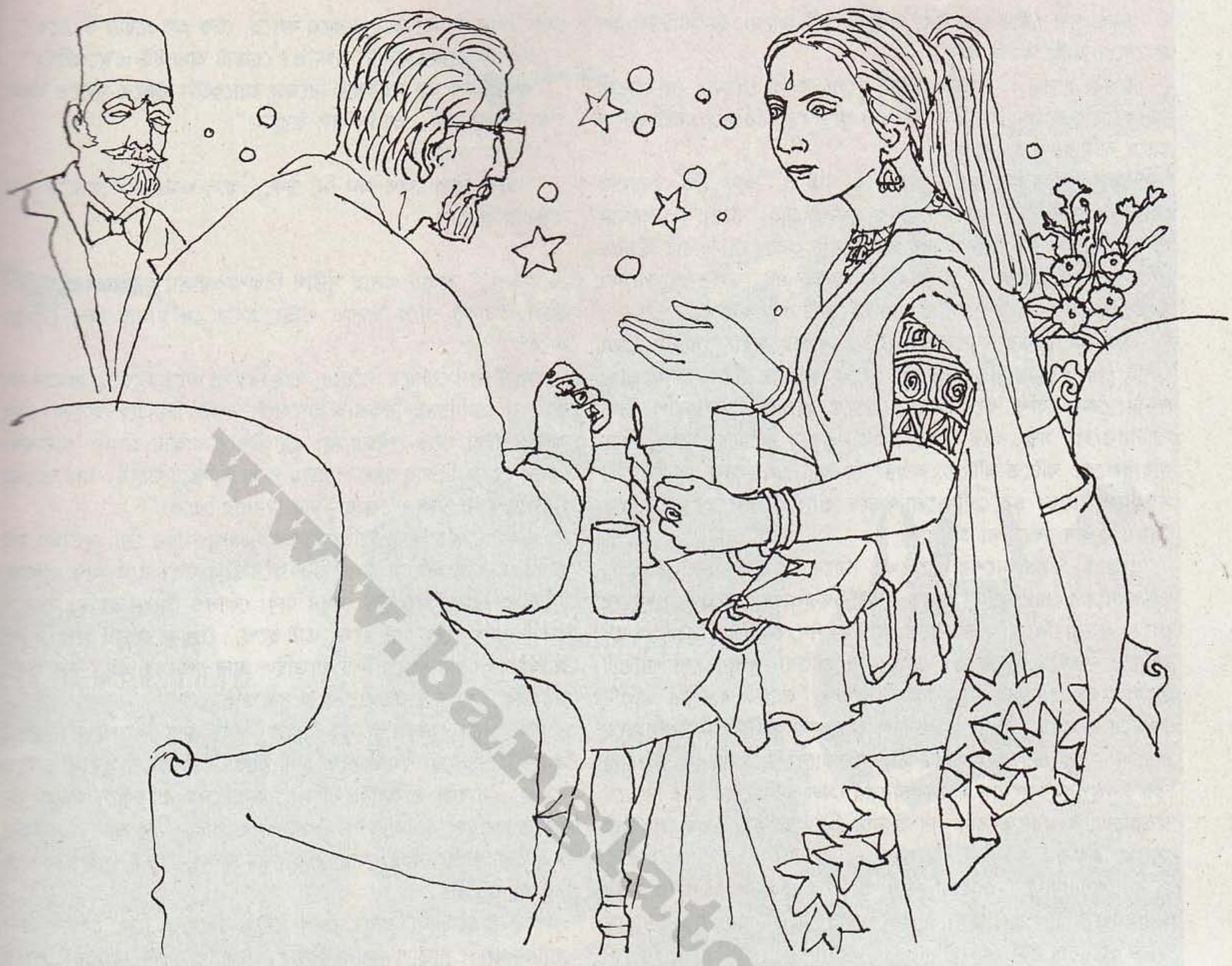

"এত বিউটির তুমি কী দেখলে শুনি! আমার ছেলের বয়স কুড়ি।"

"ঝামেলা?" চোখ কুঁচকে অন্তরা বলল, "ওই লোকটার সঙ্গে ঝামেলা করা মানে সময় নষ্ট করা। একটা স্পাইনলেস। অ্যাম্বিশনলেস, কাওয়ার্ড।"

কনুইয়ে ভর দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল অন্তরা, "আই ওয়ান্টেড টু গেট আউট অফ দিস ম্যারেজ লং ব্যাক। শুধু ছেলেটার কথা ভেবে আর কিছু সোশ্যাল কনভিনিয়েন্সের জন্য আয়্যাম ক্যারিং দিস ম্যারেজ।"

"ব্যস! ওনলি ফর সোশ্যাল কনভিনিয়েন্স?"

"তুমি তো জান, প্রপার্টির ব্যাপারটা কীরকম মেস হয়ে আছে।"

"ও ইয়েস! সল্টলেকে তোমার দোতলা বাড়িটা, যার জমিটা সুতীর্থর বাবার কেনা। কিন্তু সুতীর্থর বাবার বাড়ি বানানোর পয়সা ছিল না। বানিয়েছিলেন তোমার বাবা। এটা কোনও সমস্যা? জমির দামটা সুতীর্থর সঙ্গে সেট্‌ল করে নাও।"

"সল্টলেকে জমি ওভাবে ট্রান্সফার করা যায় না। সুতীর্থও কিছুতেই রাজি নয়। ওটাই তো ওর সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট।"

"সবকিছু করা যায় ডক। ডোন্ট ওরি। সব উপায় তোমাকে বলে দেব।"

ওমপ্রকাশ হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল। তারপর অন্তরার মুখের উপর থেকে হাতটা টেনে নিয়ে নিজের দু'হাতের মধ্যে রেখে বলল, "রিল্যাক্স ডক। এনজয় করো।"

"পারি না ওম। এই বিবাহিত জীবনটা আমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে আছে। কম বয়সের প্রেম, ইনফ্যাচুয়েশন, তারপর বিয়ে-বাচ্চা হয়ে যাওয়া যে আল্টিমেটলি আমার জীবনটাকে ছারখার করে দেবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে এখন। ওকে এটা খুব অ্যাফেক্ট করছে। ছেলেটা এবার ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়িই এল না। একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই আছে। আমি আর ক্যারি করতে পারছি না!"

"মাঝে-মধ্যে খুব জানতে ইচ্ছা করে ডক, এরকম একজনকে তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?"

"মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় একটা ফেস্টে সুতীর্থর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ও নাটক করতে এসেছিল। কেন যে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, কে জানে। তখন হয়তো ভেবেছিলাম সুতীর্থ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হোক, জীবনে কিছু একটা হবে। ওর মধ্যে ট্যালেন্ট ছিল। কিন্তু কোনও অ্যাম্বিশন যে ছিল না, সেটা তখন বুঝতে পারিনি। না হলে কেউ অফিসের নন পেয়িং নাটক নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। সেসময় আমার বাবা বার-বার বারণ করেছিল। আর আমিও ছিলাম বোকার হদ্দ। না হলে কেউ মেডিক্যালের থার্ড ইয়ারে পড়তে-পড়তে বিয়ে করে ফ্যালে?"

অন্তরা চুপ করে গেল। ওমপ্রকাশ স্টার্টারের অর্ডার দিয়েছিল। অন্তরা এক টুকরো মুখে পুরে আনমনা হয়ে প্লেটের উপর ফর্ক দিয়ে স্যালাড ঘাঁটতে থাকল। অন্তরাকে আনমনা দেখে ওমপ্রকাশ বলে উঠল, "এত রোম্যান্টিক একটা ডিনারে উই আর টকিং অ্যাবাউট আ রটন ম্যারেজ। গেট আউট অফ ইট। সোশ্যাল কনভিনিয়েন্সের যে কথা বলছ, দ্যাট ইজ় নাথিং বাট সেন্স অফ ইনসিকিয়োরিটি। লুক ডক। জীবন একটাই। নিজের জীবন যদি নষ্ট করতে না চাও, তা হলে ডিভোর্স নিয়ে ফের বিয়ে করো।"

হঠাৎ অন্তরা মুখটা তুলে বলল, "আর-একবার বিয়ে? কাকে? তোমাকে?"

ওমপ্রকাশ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, "তুমি জানো, ইনস্টিটিউশনাল ম্যারেজে আমি বিশ্বাস করি না।"

অন্তরা হাসল, "সত্যি পয়েন্টটা বলো, আমি তোমার চেয়ে সাত বছরের বড় একজন বিবাহিতা মহিলা। কুড়ি বছর বয়সের একটা ছেলে আছে আমার। তাই তো!"

ওমপ্রকাশ দু'হাত তুলে অন্তরাকে থামাল, "লুক ডক, তোমার ছেলে বা বয়স নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা হল আমার বাবা। বাঙালি বউ কোনওদিনই অ্যাকসেপ্ট করবে না। বাবার অমতে গিয়ে যদি তোমাকে বিয়ে করি, তা হলে এই ডেল্টা গাড়োডিয়া প্রজেক্টের জন্য একটা পয়সাও আর ইনভেস্ট করবে না!"

ক্রিসমাস ইভের ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের সুরটা কোথায় যেন কেটে গেল! মোমবাতির আলো থেকে অন্তরার নাকে মোমপোড়া গন্ধটা যেন বেশি করে এসে ঠেকতে লাগল। ওমপ্রকাশ দিব্য স্টার্টারগুলো যত্ন করে প্লেটে একটু-একটু দিয়েছে। ফর্ক দিয়ে খাবারগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অন্তরা দেখল, ওমপ্রকাশ দিব্যি তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। ওর ঠোঁটগুলো নড়ছে শুধু! কী বলছে, এখন আর সেসব মাথায় ঢুকছে না অন্তরার।

অন্তরা ওমপ্রকাশের চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। ওমপ্রকাশের চোখ দুটোয় অদ্ভুত একটা চুম্বকশক্তি রয়েছে। যে শক্তির কাছে অন্তরা নিঃশব্দে-নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। নিঃসংকোচে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালের প্রজেক্টে নিজেকে জড়িয়েছে, আবার ব্যবসার গণ্ডিটা পেরিয়ে খড়কুটোর মতো ওমপ্রকাশ অন্তরাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে রায়চক থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কনফারেন্সের অছিলায় দিল্লি বা তিরুঅনন্তপুরম। সুযোগ মতো শরীরের খেলায় নিঃশেষ করে দিয়েছে অন্তরাকে। অন্তরাকে বার-বার জানান দিয়েছে বন্য উন্মত্ত পুরুষের সোহাগের রকম।

চোখের সামনে হালকা দুটো তুড়ি মেরে ওমপ্রকাশ অন্তরার অন্যমনস্কতা ভাঙল, "ডক! কী হল? আই নো ইউ আর ভেরি টায়ার্ড অ্যান্ড ইউ নিড সাম রেস্ট।"

ন্যাপকিনে ঠোঁটের দু'কোনা মুছে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল ওমপ্রকাশ। তারপর অন্তরাকে নিয়ে এল লিফ্‌টের কাছে। লিফ্‌টের দরজাটা বন্ধ হতেই গভীরভাবে নিজের ঠোঁট দুটো বসিয়ে দিল অন্তরার ঠোঁটের উপর।

লিফ্‌ট থেকে নেমে লম্বা প্যাসেজ। ৫১২ নম্বর রুমটা আগে থেকেই বুক করা ছিল ওমপ্রকাশের। দরজাটা বন্ধ করে আর-একবার অন্তরার কোমরে হাতটা পেঁচিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "প্রবীর দাশগুপ্ত ক্যান ডু আ লট ফর আস..."

নিশ্বাস ঘন করে অন্তরা বলল, "নাউ উইল ইউ প্লিজ স্টপ দিস স্টুপিড প্রবীর দাশগুপ্ত।"

ওমপ্রকাশ অন্তরার স্তনের উপর হাতটা রেখে বলল, "সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্ট আমার বিজ়নেস সেন্স বাড়িয়ে দেয়। আমার বিজ়নেস সেন্স এখন আবছা-আবছা করে বলছে, টেক অ্যাওয়েটা কী হবে!"

"লোকটাকে চেনোনি এখনও? হোয়াট আর ইউ এক্সপেক্টিং?"

ওমপ্রকাশ যত্ন সহকারে নিজের জ্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বলল, "আ ফরচুন ডক... আ সিম্পল ফরচুন।"

"ড্যাম ফরচুন।"

"জাস্ট কিপ ফেথ অন মি, ডক," বলে ওমপ্রকাশ কামড়ে ধরল অন্তরার কানটা।

"আঃ," অস্ফুট গলায় সুতীর্থ রিকশাওয়ালাকে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "একটু দেখে চালাও ভাই। এবার যে মাথার ঘিলু বেরিয়ে যাবে।"

লাস্ট বাস বেরিয়ে গিয়েছে, তাই রিকশা নিতে হয়েছে। সামনে ঘন কুয়াশা। এমনিতেই রিকশার হ্যান্ডেলে একটা টিমটিমে আলো। সেই আলো রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছয় না। তার উপরে রাস্তায় অসংখ্য খানাখন্দ। থেকে-থেকে রিক্সার চাকা গাড্ডায় পড়ে লাফিয়ে উঠছে। আর তাতেই সুতীর্থর মাথা ঠুকে যাচ্ছে ছাউনির লোহার শিকে।

একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের রিকশাওয়ালা যেন সুতীর্থর এই প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিল। শুরু করে দিল সরকারকে বাপ বাপান্ত, "নিজের চোখে রাস্তাঘাট দেখুন বাবু। কোনও উন্নয়ন হয়নি। সরকার কত বিজ্ঞাপন দেয়, এই হচ্ছে, তাই হচ্ছে... দেখুন, রাস্তার হাল দেখুন। আশ্বিনে পুজোর আগে পিচ পড়েছিল আর পৌষেই এই... সব পুকুর চুরি বাবু... শালা! নেতাগুলোকে সব গুলি...."

অন্ধকারে কুয়াশার বুক চিরে ধীর লয়ে লাফাতে-লাফাতে রিকশাটা চলেছে। ব্রহ্মতালুতে হাত বুলোতে-বুলোতে সুতীর্থ ভাবতে থাকল, লোকটা মাওবাদী নাকি? অনুন্নয়নের প্রতিবাদে মানুষ খুন করতে চাওয়ার ভাবনাটা কি মাওবাদ? ব্যাপারটা ঠিক ভালভাবে জানা নেই ওর। সুতীর্থ কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, "ভাই, এই অন্ধকারে ঠিক যাচ্ছি তো?"

"ভুল হবে না বাবু। চোখ বেঁধে দিলেও ঠিক পৌঁছে দেব গোবিন্দগঞ্জ। সাতাশ বছর রিকশা চালাচ্ছি এই লাইনে। পুলক মাস্টারের বাড়ি বললেন তো?"

জনমানবশূন্য মিশমিশে অন্ধকারেও সুতীর্থ সতর্ক হল। ফিসফিসিয়ে বলল, "হ্যাঁ, পুলকের বাড়ি।"

রিকশাওয়ালা আবার আপনমনে কথা বলতে-বলতে প্যাডেল চালাতে থাকল। স্টেশন থেকে গোবিন্দগঞ্জ অনেকটা পথ। এমনিতেই পাড়াগাঁ, অল্প রাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার উপর এবার শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। পুলক মল্লিকের বাড়ির সামনে যখন রিকশাটা এসে থামল তখন এলাকাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে পুলকের টিনের চালার বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়ল সুতীর্থ। ভিতর থেকে কোনও সাড়া নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সুতীর্থ আবার জোরে-জোরে কড়া নাড়ল। এবার ভিতর থেকে একটা মহিলা কণ্ঠে ভয় মেশানো কাঁপা গলায় আওয়াজ এল, "কে?"

জমাট অন্ধকারেও এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে সুতীর্থ গলাটা নিচু রেখেই নিজের পরিচয় দিল, "আমি সুতীর্থ।"

সুতীর্থর গলাটা বোধ হয় ভিতরে পৌঁছল না। এবার একেবারে দরজার পিছন থেকে গলা এল, "কে?"

"আমি রে... সুতীর্থদা... অনু, দরজা খোল..."

ঘষটানো একটা খিল খোলার আওয়াজ। তারপর দরজাটা খুলে গেল। দরজার ওপাশে হাতে উঁচু করে লণ্ঠন ধরা এক ক্ষয়াটে যুবতী। মুখের একপাশ ঝলসানো। শিউরে উঠল সুতীর্থ। হ্যারিকেনের আলোটা পড়ছে অনুপমার ঝলসানো গালে। হলুদ আলোছায়ায় অনুপমার গালটা এরকম বীভৎসরূপে কোনওদিন দ্যাখেনি সুতীর্থ।

অনুপমার তখনও বিস্ময় কাটেনি। এতরাতে সুতীর্থ একদম অপ্রত্যাশিত। দরজার একপাশে সরে গিয়ে বলল, "এসো সুতীর্থদা।"

সুতীর্থ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল, "পুলক ঘুমিয়ে পড়েছে?"

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে-করতে অনুপমা বলল, "দাদার আজকাল রাতে ঘুম হয় না।"

"তাই? ওর কোনও গলার আওয়াজ পেলাম না," কথাটা বলেই সুতীর্থ সংযত হয়ে পড়ল। এরকম এক শীতের গহন রাতেই তো কড়া নেড়ে ওরা এসেছিল, পুলকের বাড়িতে বহ্নি উৎসব করতে। যার স্বাক্ষর এখনও অনুপমা বয়ে বেরাচ্ছে ওর গালে, শরীরের নানা জায়গায়।

ভিতরের ঘরে ঢুকতেই হ্যারিকেনের আলোয় সুতীর্থ দেখল, মশারির মধ্যে খাটের এক কোনায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বসে আছে পুলক। নিজের পরিচয়টা সন্দেহের উর্ধ্বে তুলতে মুখের কাছে হ্যারিকেনটা উঠিয়ে সুতীর্থ বলল, "আমি রে।"

অনুপমা যোগ করল, "সুতীর্থদা গো দাদা।"

পুলকের মুখের রেখাগুলো একটু-একটু করে স্বাভাবিক হল। তারপর হাড় জিরজিরে শরীরটাকে মশারির বাইরে টেনে এনে বলল, "তুই এসেছিস সুতীর্থ, বেশ করেছিস। কিন্তু স্টেশন থেকে এত রাতে এলি কীভাবে?"

সুতীর্থ মজা করে বলল, "জানিস না, আজ কত তারিখ? সান্টা ক্লজ় সেই রেন ডিয়ারের টানা স্লেজ গাড়িটা নিয়ে ওয়েট করছিলেন ষ্টেশনে। আমি বললাম, ভাই সান্টা একটু পুলক মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দেবেন? তো ভদ্রলোক পৌঁছে দিলেন আবার একটা প্যাকেটও দিলেন।"

সুতীর্থ ঝোলা থেকে ট্রেনে কেনা জয়নগরের মোয়ার একটা প্যাকেট বের করে অনুপমার হাতে দিয়ে বলল, "আমি কিন্তু থাকতে এসেছি অনু।"

অনুপমা খুশি-খুশি গলায় বলল, "আহা এই শীতের রাতে যেন তোমাকে চলে যেতে বলছি আমরা!"

"আমি শুধু আজকের কথা বলছি না! হয়তো বেশ কয়েকদিন থেকে যাব!"

অনুপমা মনের ভিতর এক অনাবিল ফুর্তির স্পর্শ পেলেও একটা খটকা লাগল। সুতীর্থদা কয়েকদিন থাকবে বলছে। কিন্তু সঙ্গে সুটকেস, বড় ব্যাগ কিচ্ছু নেই। কাঁধে শুধু একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। তাতে গামছাও এনেছে কি না সন্দেহ! আসছে, সেটা একটা ফোন করেও জানায়নি। সুতীর্থর থাকার ইচ্ছে শুনে পুলকের চোখের কোনায় খুশির ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলে উঠল, "বেশ বেশ।"

এই ঠান্ডায় সুতীর্থকে গরম ভাত ফুটিয়ে দিতে চাইল অনুপমা। সুতীর্থ শুনল না। হাঁড়িতে উদ্বৃত্ত ভাতে জল ঢালা ছিল। সেই বরফ-ঠান্ডা পান্তাই কাঁচা পেঁয়াজ, নুন-লঙ্কা-সর্ষের তেল দিয়ে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে নিল ও। আঁচিয়ে খাটে উঠে পুলকের উলটোদিকে বসে আমেজ করে একটা সিগারেট ধরাল। পুলক ততক্ষণে মশারি খুলে ফেলে দাবার একটা বোর্ড খাটের উপর সাজিয়ে ফেলেছে। সিগারেটের গন্ধটা নাকে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, "বিষটা এখনও ছাড়তে পারলি না?"

সুতীর্থ হাসল, "এবারটা ছাড়, পরেরবার দেখবি পুরো ছেড়ে দিয়েছি।"

"বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া। তুই সাদা নিয়ে শুরু কর। দেখি বিষ তোকে কত বুদ্ধি জোগায়।"

সারাদিনে এই প্রথমবার প্রাণ খুলে হেসে উঠে সুতীর্থ বলল, "তুই হলি শক্তিপুরের ভগবতী বয়েজ়ের ফার্স্ট বয়, তাও কিনা সেকেন্ড-থার্ডের চেয়ে পঞ্চাশেরও বেশি নম্বরে এগিয়ে থাকতিস! মগজে তোকে হারায় কোন শালা।"

সাদা একটা বোড়ে দু'ঘর এগিয়ে দিল সুতীর্থ। পুলক গম্ভীর হয়ে কালো বোড়ের উপর হাত রেখে বলল, "কেন বার-বার ফার্স্ট বয়ের কথাটা বলিস বল তো? আমি একটা ফেলিওর। বেঁচে থাকার জন্য একটা প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারের প্রক্সি দিয়ে..."

সুতীর্থ তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "বুঝলি পুলক, আজকে অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হল তোর এখানে চলে আসি।"

"বেশ করেছিস। অনুর মোবাইলে ফোন করে দিলি না কেন?"

"দিলাম না কেন? তা হলে বোধ হয় এভাবে আসার থ্রিলটাই থাকত না। অনু বার-বার ফোন করে জিজ্ঞেস করত কতদূর এলে? তোর কাছে অবশ্য একটা কাজে এসেছি। তবে ভুলে যাওয়ার আগে একটা খবর বলি তোকে। পার্থকে মনে আছে তোর? আরে ভগবতী বয়েজ়ের পার্থপ্রতিম সেন! সেদিন অফিসে এসেছিল। এখন মস্ত মানুষ হয়ে গিয়েছে। গায়ে আবার বড়লোকের গন্ধ।"

পুলক কোনও উত্তর দিল না। মন দিয়ে সুতীর্থর পরের চাল দেখল। অনুপমা খাটের এক কোনায় বসেছিল। দাদার সব বন্ধুদেরই তো চেনে। আহ্লাদি গলায় বলে উঠল, "সেই মোটা পার্থদা, সুতীর্থদা?"

"হ্যাঁ রে অনু, তোর মনে আছে পার্থকে? এখন অবশ্য আর মোটা নেই। জিম-টিম করে চকচকে একটা চেহারা হয়ে গিয়েছে।"

পুলক গম্ভীর। পার্থকে নিয়ে সুতীর্থ অনুপমার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠেছে। দাবায় মন নেই।

"তোর বুঝি পার্থকে দেখে আমার কথা মনে হল?" একসময় গম্ভীর গলায় বলে উঠে সুতীর্থর একটা গজ খেয়ে ফেলল পুলক।

"না, তোর কাছে আমি আসতাম-ই। সেই পুজোর পর তোদের কাছে এসেছিলাম। বললাম না, একটা কাজে এসেছি। তুই তো জানিস বহুদিন ধরেই কাফকাকে নিয়ে কিছু একটা করার কথা আমার মাথায় ঘুরছে। কাফকার একটা নভেলা থেকে এবারের অফিসের নাটকটা লিখব ভেবেছিলাম। গল্পটা সকলের পছন্দ হল না। বলল, সায়েন্স ফিকশন, একপেশে পলিটিক্যাল, আরও কতকিছু। অন্য গল্প ভাবতে বলেছিল, ক'দিন দোনামনা চলছিল। আজ ফাইনাল সিদ্ধান্ত ওদের জানিয়েই দিলাম। আমার দ্বারা হবে না। অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হল লোকে অ্যাপ্রুভ করুক বা না করুক, গল্পটা নিয়ে এত যখন ভেবেছি, তখন নাটকটা লিখব না কেন? নিজের মতো করে মনের মতো একটা জায়গায় গিয়ে লিখব। আর আমার জানা একটাই লোক আছে, যে কাফকা-কামু গুলে খেয়েছে। দু'দিস্তা কাগজ কিনে সওয়া আটটার ট্রেনটা ধরে ফেললাম।"

"কাফকার 'মেটামরফসিস' থেকে নাটক লিখবি?"

"ধরে ফেললি?"

"নভেলা বললি তো, তাই মেটামরফসিস নামটাই মনে হল। প্রথম লাইনটা হল, একদিন গ্রেগর সামসা সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখল, সে আশ্চর্যজনকভাবে বিশালাকৃতি এক পতঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। উফ! প্রথম লাইনেই কী অসাধারণ একটা মোচড় দিয়ে উপন্যাসটা শুরু!"

চমকে উঠল অনুপমা। দাদার গলাটার সঙ্গে স্মৃতিতে ভেসে উঠল হাসপাতালের একটা নোংরা বেসিন। তার উপর একটা ততোধিক ময়লা ভাঙা আয়না। এক সকালে একটা মেয়ে চমকে উঠে সেই ভাঙা আয়নায় দেখল, সে একটা কীট হয়ে গিয়েছে।

খাটের পাশ থেকে পায়ে-পায়ে সরে দাঁড়াল অনুপমা। তারপর নিজের ঘরে চলে এল। দেওয়ালে একটা আয়না। অবিকল হাসপাতালের বেসিনের উপর ভাঙা আয়নাটার মতো। হ্যারিকেনের আলোয় সেই আয়নায় কীট মুখটা দেখল। তারপর এই মধ্য তিরিশের অষ্টাদশীর মতো সাজতে ইচ্ছে করল তার।

দাবার ছকে সাদা ঘুঁটিগুলো ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। এতটা খারাপ সুতীর্থ খেলে না। আসলে মাথার মধ্যে কাফকা এমনভাবে জলপালা ছড়িয়ে আছে, দাবার বোর্ডে আর মনোযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। অহেতুক একটা কালো বোড়েকে খেয়ে নিজের রক্ষণে ফোকরটা আরও প্রশস্ত করে সুতীর্থ আর-একটা সিগারেট ধরাল। মন্ত্রীটাকে এবার সরাসরি দেখছে কালো গজটা। তবু প্রত্যাশিত চালটা না দিয়ে পুলক প্রায় ধ্যান করার মতো করে চেয়ে আছে বোর্ডের দিকে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সুতীর্থ বলল, "কী হল?"

"ভাবছি।"

বোর্ডের উপর কালো গজটার পথটা আঙুল দিয়ে টেনে সুতীর্থ দেখিয়ে বলল, "এটা নয়?"

"ওটা বড্ড সাধারণ, অবশ্যম্ভাবী। ভাবছি ওটা ছাড়া আর কীভাবে..."

সুতীর্থ সিগারেটে পরের টানটা দিয়ে খানিক উদাস হয়ে বলল, "বিশ্বাস করবি কি না জানি না, আমিও এই একটা কথাই ক'দিন ধরে ভেবে চলেছি যে, মেটামরফসিস গল্পটা অন্য কীভাবে ছকা যায়।"

"অন্যভাবে লেখার কথা ভাবছিস কেন? অফিসের লোক নেয়নি বলে?"

"ওই যে তোকে বললাম, নিজের জন্য নিজের মতো করে লিখব।"

সাদা মন্ত্রীটা না খেয়ে অন্য-একটা চাল দিয়ে পুলক বলল, "তা হলে সেটা আর কাফকা থাকবে না। মেটামরফসিস কেন, কাফকার কোনও লেখাই তুই পালটাতে পারবি না। ধর, কাফকার 'আই পাস্‌ড বাই দ্য ব্রথেল অ্যাজ় দো পাস্ট দ্য হাউস অফ আ বিলাভেড', এই কথাটা তুই কোনওভাবে পালটাতে পারবি?"

খোলা জানালা দিয়ে সিগারেটের জ্বলন্ত অর্ধাংশটুকু বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দাবার ছকে চোখ রাখল সুতীর্থ।

পুলক ম্লান হাসল, "তোর অফিসের লোকেরা ঠিকই বলছে। আজকালকার জীবন অনেক জটিলতায় ভরা। লোকে বিনোদনে কাফকার নৈরাশ্যবাদ নেবে কেন?"

সুতীর্থ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "ওদের কথা ছাড়। শালারা জানে কী? জীবনে কাফকার নাম শুনেছে? বড়জোর হয়তো জানে এগুলো আঁতেলদের পাঠ্য বা কোথাও হয়তো পড়েছে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় হচ্ছে কাফকা। ব্যস, ধরেই নিল কাফকা মানেই লাল। একপেশে পলিটিক্যাল।"

দাবার ছক ছেড়ে পুলক পুরো মন দিয়ে সুতীর্থর মুখের দিকে চেয়ে আছে। হ্যারিকেনের আলোয় এভাবে চেয়ে থাকাটা অসহ্য লাগল সুতীর্থর। চিড়বিড়িয়ে বলে উঠল, "কী দেখছিস?"

"দেখছি, তোর মধ্যেও সেই অহংটা কেমন তড়তড়িয়ে বেড়ে উঠেছে।"

"কীসের অহং?"

"বোধবুদ্ধির অহং। জাতপাতের অহং। এই অহং নিয়েই ওরা একদিন শক্তিপুরে আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল।"

সুতীর্থ মানে বুঝতে না পেরে বলল, "জাতপাত?"

"হ্যাঁ, উচ্চবর্গীয় শ্রেণি আর নিম্নবর্গীয় শ্রেণির জাতপাত। কে কাফকা পড়েছে আর কে পড়েনি, এও তো একরকম জাতপাতের অহং।

বোর্ডের উপর দাবার ঘুঁটিগুলো ঘেঁটে দিয়ে সুতীর্থ অনুপমাকে ডাকল, "অনু। অনু।"

পাশের ঘর থেকে অনুপমা আসতেই অনুপমার মুখটা একটু অন্যরকম লাগল সুতীর্থর। একটু আগের খোলা চুলটা টানটান করে বাঁধা। মুখেও যেন একটা সান্ধ্য প্রসাধন। মাঝরাতের এই ঠান্ডাতেও গায়ে চাদরটা নেই। সুতীর্থ বলল, "অনু, একটু চা খাওয়াতে পারবি?"

অনুপমার মুখে কোনও বিরক্তি দেখা গেল না। পুলককে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও খাবে দাদাভাই?"

দেওয়াল ঘড়িতে পৌনে দুটো। পুলক মাথা নাড়ল। যে জায়গাটায় পুলকের সঙ্গে কথাটায় ছেদ পড়েছিল, সেটারই জের টেনে সুতীর্থ বলল, "তুই শ্রেণি-বিভেদের কথা বলছিস?"

পুলক নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছিল। মন দিয়ে দাবার ছকে নতুন করে গুটি সাজাতে-সাজাতে বলল, "থাক ওসব কথা, তুই আর-একবার সাদা দিয়ে শুরু কর।"

বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর

কালো এসইউভিটা হাইওয়ে থেকে নেমে একরাশ ধুলো উড়িয়ে ছোটা বচ্চন সিংহর ধাবার সামনে এসে দাঁড়াল। আশপাশে ভাল-ভাল ধাবা হয়ে যাওয়ার পর ছোটা বচ্চন সিংহর ধাবার বিক্রিবাটা একদম পড়ে গিয়েছে। বড়দিনের দুপুরেও তাই ধাবাটা একদম ফাঁকা। জায়গাটা বাছা হয়েছে প্রবীর দাশগুপ্তর নির্দেশে। এটা অবশ্য ডঃ অন্তরা পালচৌধুরীর একটু বেশিই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। যদি এরকম ফাঁকা ধাবাই বাছতে হত, তা হলে তো দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কোনও ধাবাতে বসলেই হত। এন এইচ সিক্সের উপর উলুবেড়িয়া আর কোলাঘাটের মাঝামাঝি ছোটা বচ্চন সিংহর ধাবাটা অন্তরার চেম্বার থেকে বেশ অনেকখানি।

ওমপ্রকাশ রাস্তার দিকটা পিছন করে বসেছিল। অন্তরা চোখের ইঙ্গিত করতেই ওমপ্রকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রবীর দাশগুপ্ত ততক্ষণে ধাবার ভিতর ঢুকে পড়েছে। দ্রুত এগিয়ে এসে অন্তরার উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল।

ওমপ্রকাশ মাথা ঝুঁকিয়ে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, "মশলা চা আগে বলি স্যার?"

প্রবীর দাশগুপ্ত কোনও উত্তর দিল না। কালো সানগ্লাস চোখে থমথমে মুখে খয়েরি রঙের একটা বড় খাম এগিয়ে দিল অন্তরার দিকে। খামটা খুলতেই ভিতরে আর-একটা খাম। তার মধ্যে বিভূতিনগর গোল্ডেন ডায়গোনস্টিক সেন্টারের ডঃ শুক্লা ভট্টাচার্য বলে জনৈক ডাক্তারের একটা সোনোগ্রাফি আর কয়েকটা টেস্ট রিপোর্ট। রিপোর্টে প্রথমেই ধাক্কা খেল অন্তরা। প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ের আসল নামটা আড়াল করে রিপোর্টে লেখা আছে, লিপি গাঙ্গুলি। বয়স কুড়ি। গম্ভীর মুখে পাতা ওলটাতে থাকল অন্তরা। তারপর ফাইলটা টেব্‌লের উপর রাখল। প্রবীর দাশগুপ্ত গম্ভীর গলায় বলল, "আপনাকে কাজটা করে দিতে হবে।"

কীভাবে শুরু করবে সেটা ঠিক করতে পারছিল না অন্তরা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওমপ্রকাশই যেন হাল ধরতে এগিয়ে এল, "ইজ় দেয়ার এনিথিং সিরিয়াস ডক?"

"সেভেনটিন উইক্‌স," কোনওরকমে বলল অন্তরা।

তথ্যটা নতুন নয়। 'সতেরো সপ্তাহ' কথাটা প্রবীর দাশগুপ্ত আগেই বলেছে। সোনাগ্রাফির রিপোর্টেও বলা আছে। ওমপ্রকাশ আপ্রাণ চেষ্টা করল কাজের সূত্রটা ধরিয়ে দিতে, "আমি ডাক্তার নই। কিন্তু এটা জানি যে, সতেরো সপ্তাহ মানে আ লিটল অ্যাডভান্সড স্টেজ। ডায়ালেসন করে ভ্যাকুয়াম করা যাবে?"

সতেরো সপ্তাহে ভ্যাকুয়াম? ওসব নিয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তার জায়গাই নেই। মেয়েটার যা রিপোর্ট, এই অবস্থায় কোনও কিছু করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্তরা বোঝানোর চেষ্টা করল, পুরো প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সি ইজ় ইন সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার। আমাদের দেশের মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট অনুযায়ী, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে অ্যাবর্ট করতে গেলে আরও দু'জন ডাক্তারকে কনসাল্ট করতে হবে।"

"প্লিজ় ডক্টর। দাশগুপ্ত সাব কা বাচ্চি। ইউ হ্যাভ টু সর্ট ইট আউট।"

ওমপ্রকাশ একটা আর্জি নিয়ে অন্তরার দিকে চেয়ে রইল। এই মুহূর্তে অন্তরার মনে হচ্ছে সুতীর্থর চেয়ে ওমপ্রকাশ অনেক বড় অভিনেতা। আর প্রবীর দাশগুপ্ত একজন নিশ্চুপ ধৈর্যবান দর্শক। দোনামনা করে বলল, "সোনোগ্রাফির কোয়ালিটি খুব খারাপ। তবে প্রেসক্রিপশনে ওর শরীরের যা কন্ডিশন দেখছি, তাতে অ্যানিমিয়া আর হাইপার টেনশন রয়েছে। এই অবস্থায় কিছুতেই অ্যাবর্শন করানো

যাবে না। আইনে স্পষ্ট বলা রয়েছে। তা ছাড়া লাইফ রিস্কও হয়ে যাবে। আগে এগুলো ঠিক করতে হবে।"

"কতদিন লাগবে?"

"সেটা ওভাবে বলা যায় না। কিন্তু সমস্যা হল, কন্ডিশনগুলো ঠিক করতে গিয়ে কুড়ি সপ্তাহ যদি পেরিয়ে যায়, আর অ্যাবর্শন করাই যাবে না। তা ছাড়া অ্যাবর্শনের অনেক সাইড এফেক্টও রয়েছে।"

"কী সাইড এফেক্ট?" গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল প্রবীর দাশগুপ্ত।

"মেন্টাল, ফিজিক্যাল বোথ। হয়তো ভবিষ্যতে ওর কনসিভ করতে অসুবিধা হতে পারে..."

"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে। আপনি বর্তমানের কথা বলুন।"

"আমাকে সবদিক দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"তার মানে আপনি কী বলতে চাইছেন ডক?" ওমপ্রকাশকে খুব চিন্তিত দেখাল, "অ্যাবর্শন করা নাও যেতে পারে? মানে ইন দিস কেস বাচ্চাটাকে জন্মাতে দিতেই হবে?"

ওমপ্রকাশকে অনুসরণ না করেও অন্তরার কপালে ভাঁজ পড়ল, "হয়তো হতেও পারে! ওকে না দেখে আমি কিছুই বলতে পারছি না।"

দুম করে টেব্‌লের উপর একটা ঘুসি মারল প্রবীর দাশগুপ্ত। ভর্তি গেলাসগুলো থেকে মশালা চা খানিকটা চলকে পড়ল। একটা ছেলে সেটা দেখে দৌড়ে আসছিল পরিষ্কার করে দিতে। ওমপ্রকাশ তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে চলকানো চায়ের উপর পেপার ন্যাপকিন ফেলতে-ফেলতে বলতে থাকল, "নো ডক! কিছু একটা উপায় ভেবে বার করতেই হবে।"

অন্তরার যে মাঝে-মাঝে কী হয়! ভিতরে-ভিতরে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠল ওমপ্রকাশ। মাথামোটা ডাক্তার। ভাগ্য যেখানে দরজায় কড়া নাড়ছে, সেখানে এরকম বেচাল কথা? মাথামোটা ডাক্তারটা ভেবেছে কী? প্রবীর দাশগুপ্ত দুনিয়ায় একজনই গাইনিকলজিস্টকে চেনে, যে একদম গোপনে কাজটা করে দেবে। অন্তরার মতো ডজনখানেক ডাক্তার আছে প্রবীর দাশগুপ্তর পকেটে। দ্রুত স্ক্রিপ্ট বদলে নিতে থাকল ওমপ্রকাশ। নিজের সংলাপের সঙ্গে অন্তরার সংলাপকে মিশিয়ে নিয়ে বলল, "তো আপনি যান না স্যারের বাড়ি। আবার আপনার নিজের ক্লিনিকেও স্যারের মেয়েকে নিয়ে গিয়ে টেস্ট করিয়ে, ওষুধপত্তর খাইয়ে স্টেবল করে কাজটা করে দিন। ক'দিন লাগবে ডক? ম্যাক্স সাত থেকে দশদিন। আপনি খামোকা চিন্তা করছেন ডক।"

লম্বা সংলাপটা আউড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওমপ্রকাশ তাকিয়ে আছে। প্রবীর দাশগুপ্তর সানগ্লাসে আচ্ছন্ন চোখেও নিশ্চয় একই জিজ্ঞাসা। 'আ উইক টু টেন ডেজ' প্রবীর দাশগুপ্ত আর ওমপ্রকাশ, দু'জনের কাছেই স্বস্তিদায়ক উত্তর। দশদিনে ওমপ্রকাশ গুছিয়ে ফেলবে ওর টেক অ্যাওয়ে, মিটিয়ে ফেলবে গৌরবপুরে হাসপাতাল তৈরির পথে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো আর প্রবীর দাশগুপ্ত অবাঞ্ছিত ঝামেলাটা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

এবার আর ওমপ্রকাশকে হতাশ করল না অন্তরা। গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, "ঠিক আছে, কালকে আমি যাব। মেডিসিন দিয়ে স্টেব্‌ল করি, তারপর দেখছি।"

চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলল প্রবীর দাশগুপ্ত। এই চোখের ভাষাটা অত্যন্ত জটিল মনে হলেও অসহায়তাটা ফুটে বেরোচ্ছে। তেতো গলায় বলে উঠল, "তার মানে? আপাতত ও মামাবাড়িতে আছে। ওকে বাড়িতে নিয়ে এসে ওর প্রেগন্যান্সির বিজ্ঞাপন ছড়াব নাকি?"

ওমপ্রকাশকে খুব চিন্তিত দেখাল, "পয়েন্ট ইজ় দেয়ার। বাচ্চি ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু বেশি জানাজানি হলে, লোকে বদনাম দিলে বাচ্চি কষ্ট পেতে পারে! না, না, স্যার। আপনার বাড়িতে তো প্রশ্নই উঠছে না। আপনার শ্বশুরবাড়িতেও নয়। অন্য-কোনও জায়গার কথা আমাদের ভাবতে হবে..."

"কোথায় পাঠাব? আমি যেখানেই পাঠাব, সেখান থেকেই খবরটা ছড়িয়ে যেতে পারে!"

"ডক, তোমার কলকাতার নার্সিংহোমে ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?" অন্তরার দিকে তাকাল ওমপ্রকাশ।

প্রস্তাবটা প্রবীরের খুব একটা পছন্দ হল না। বলল, "অন্তরাদেবীর গৌরবপুরের অনেক পেশেন্ট আছে শুনেছি। তারা কি ওই কলকাতার নার্সিংহোমে যায়?"

অন্তরা অস্বীকার করতে পারল না। সত্যিই এসময়ে কলকাতার নার্সিংহোমে গৌরবপুরের দু'টো পেশেন্ট আছে।

"না, অন্তরাদেবী। কোনওরকম জানাজানি হয়ে যাওয়ার রিস্ক আমি নিতে পারব না। দরকার হলে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে পাঠিয়ে দেব।"

"না, না। আপনি এতদূর চিন্তা করবেন না," লক্ষ্য ফসকে যাওয়ার আশঙ্কায় ওমপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমরা আছি তো।" গভীর চিন্তার অভিনয় করে ওমপ্রকাশ নাকের উপরটা চিপে ধরে চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে ফেলল। অন্তরা আশ্চর্য হয়ে দেখছিল যে গভীর চিন্তা করার এই অভিব্যক্তির সঙ্গে কী ভীষণ মিল রয়েছে সুতীর্থর!

"একটা পসিবিলিটির কথা ভাবছিলাম," ওমপ্রকাশ চোখটা খুলে বলল, "ডক, আপনার তো সল্টলেকে দোতলা বাড়ি আছে। আপনি আর আপনার বর থাকেন। ছেলে পুনায়। আপাতত ওর বাড়ি আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। মানে শীতের ছুটিতে আসছে না। সবকিছু মাথায় রেখেই বলছি, বাচ্চিকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। আপনার কেয়ারে থাকল। চেক আপ, টেস্ট, ট্রিটমেন্ট সব করলেন এবং সময় মতো যা-যা করার করে নিলেন। মাত্র দশদিনের ব্যাপার।"

ওমপ্রকাশের প্রস্তাবে অন্তরা কিছু বলে ওঠার আগেই প্রবীর দাশগুপ্ত সায় দিয়ে বলল, "যদি সমস্ত দিক থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়, আমার আপত্তি নেই।"

বাড়িতে রেখে কোনও পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট আজ পর্যন্ত অন্তরা করেনি। ওমপ্রকাশ এই কথাটা আগেও বলে রাখেনি। বিন্দুমাত্র আভাসও দেয়নি। তবে অন্তরা জানে, ওমপ্রকাশের মাথা থেকে যখন এই বুদ্ধিটা একবার বেরিয়েছে আর প্রবীর দাশগুপ্ত রাজি হয়েছে, তখন আর কোনওভাবেই এটা এড়ানো যাবে না। অন্তরা শুধু প্রবীর দাশগুপ্তকে দেখতে-দেখতে ভাবছিল, এতসব শোনার পরও মেয়ের জীবন-মরণ নিয়ে এক ফোঁটাও দুশ্চিন্তা নেই ঝানু এই নেতার মনে।

ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা-টা জলদি গলায় ঢেলে চোখে সানগ্লাসটা পরে নিয়ে একেবারে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ওমপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করল প্রবীর, "আপনাদের হসপিটালের কী খবর?"

ওমপ্রকাশ বিনয়ীর হাসিটা হেসে বলল, "কিছু জায়গায় বট্‌লনেক হয়ে আছে। আপনি তো জানেন আমাদের পুরো প্রজেক্টটা অস্ট্রেলিয়ার ডেল্টা হসপিটালের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে। ওরা হসপিটাল স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাসথেটিক্স, অ্যামবিয়েন্সের ব্যাপারেও খুব পার্টিকুলার। তাই সামনের জমির ক্লিয়ারেন্সটা... বাউন্ডারি ওয়ালের সামনে ঝুপড়িগুলো... হসপিটাল ওয়েস্ট ডিসপোজ়ালের মিউনিসিপ্যাল ক্লিয়ারেন্স... না স্যার, আজকে এসব প্রবলেমের কথা থাক! আপনার ফ্যামিলি প্রবলেমে আমাদের ভরসা করেছেন, এটাই অনেক। বিজ়নেস বিজ়নেসের জায়গায়। ভাববেন না এটা বলার জন্যই বলছি... আয়্যাম স্পিকিং ফ্রম মাই হার্ট," ওমপ্রকাশ নিজের বুকটা ছুঁয়ে দেখাল।

প্রথমবার প্রবীর দাশগুপ্ত মুচকি হেসে বলল, "আপনাদের প্রজেক্ট ম্যানেজারকে বলুন একদিন ফাইলপত্তর নিয়ে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে। সামনেই ভোট, তার আগেই পাঠান। দেরি হলে কিন্তু কিছু করতে পারব না," চোখে সানগ্লাসটা পরে নিয়ে কালো কাচের মধ্যে দিয়ে প্রবীর দাশগুপ্ত ওমপ্রকাশের দিকে তাকাল। দাঁতে দাঁত চিপে মনে-মনে ভাবতে থাকল, অবাঙালি লোকটা যতই বিনয় করুক, মৃন্ময়ীর ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে লোকটা বাধ্য। গৌরবপুরের ষষ্ঠীতলার মোড়ে এত টাকা ইনভেস্ট করে বসে আছে। মানসী যখন কিছুই করতে পারল না, তখন অনেক ভেবেচিন্তে কাজটা করার জন্য ওমপ্রকাশ-অন্তরা পালচৌধুরী জুটিকে বেছেছে ও।

ওমপ্রকাশও বিনয়ী হাসিটা মুখে রেখে প্রবীর দাশগুপ্তর দিকে তাকিয়ে একই কথা ভাবছিল। গৌরবপুরে লোকটাকে চাকরের মতো

রেখে রাখতে হবে। ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক, লোকটার অঞ্চলে বা প্রতিপত্তি, লোকটা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। মেয়ের গর্ভপাতের গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি একটা তুরুপের তাস।

প্রবীর দাশগুপ্ত উঠতেই ওমপ্রকাশ আর অন্তরাও উঠে দাঁড়াল। ওমপ্রকাশ বিনয়ী হাসিটা হেসে বলল, "তা হলে কবে স্যার?"

"মেয়ের কথা বলছেন না ফাইলের কথা?"

"না, না... মেয়েকে কবে ড. পালচৌধুরীর বাড়িতে পাঠাবেন?"

"ও! আপনাকে আরও কয়েকটা দরকারি কথা বলে নিই। ওর মা কিন্তু সঙ্গে যাবে না। ইনফ্যাক্ট এই সময়ে ওর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দরকার নেই। দরকার মতো আমি আপনাদের ফোন করব বা আপনারা আমাকে। শুধু আমার একজন বিশ্বস্ত ড্রাইভার আপনাদের কাছে থাকবে। ওর একটু থাকার ব্যবস্থা করে রাখবেন।"

ওমপ্রকাশ বলল, "আমার মনে হয় সেটা কোনও প্রবলেম হবে না, তাই না ডক? আপনি আমায় বলেছিলেন না, আপনার গ্যারেজের পিছনে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারটা ফাঁকাই পড়ে আছে!"

"আর একটা কুকুর ছানা। আমার মেয়েকে বাড়িতে না দেখলে কুকুর ছানাটা সারারাত চিৎকার করে। আমি চাই না...."

অন্তরার এবার অসহ্য লাগছিল। লোকটার বাড়াবাড়ি করার একটা সীমা থাকা উচিত।

"রূপক... রূপক..." গলা ছেড়ে ড্রাইভার রূপককে ডাকল প্রবীর দাশগুপ্ত।

শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর

সিঁড়িতে বসেছিল রূপক। শান্তিনিকেতনি ব্যাগ কাঁধে একটা লোক সামনে এসে অবাক চোখে ওকে জরিপ করছে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"কাউকে খুঁজছেন?" সুতীর্থ বাড়ির সামনে সিঁড়িতে বসে থাকা অচেনা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল।

"না তো!" রূপকের সামনে সুতীর্থ আগন্তুক।

"তা হলে এখানে বসে কী করছেন?" সুতীর্থ ইষৎ কড়া গলায় ধমকে উঠল।

রূপক থতমত খেয়ে বলল, "আমি ম্যাডামের ড্রাইভার।"

সুতীর্থ অবাক হল। দুটো কারণে। এক, এই ছেলেটা যদি অন্তরার নতুন ড্রাইভার হয়, তা হলে অন্তরার এতদিনের পুরনো ড্রাইভার রাঘববাবুর কী হল? দুই, অন্তরার গাড়িটা বাড়ির সামনে নেই। অন্তরা নিজে ড্রাইভিং জানে না। তা হলে গাড়ি ছাড়া নতুন এই ড্রাইভারটা কী করছে বাড়িতে?

দিনকাল ভাল নয়। বিশেষ করে সল্টলেকে ভরদুপুরগুলো এখন চোর-জোচ্চোরদের প্রিয় সময়। তবু অন্তরার ব্যাপার বলে বিশেষ মাথা ঘামাল না সুতীর্থ। চোর-জোচ্চোর আর অন্তরার লোক, সবই সুতীর্থর কাছে সমান। রূপকের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে সুতীর্থ সদর দরজায় বেল টিপল।

টুং টাং একটা আওয়াজ। তারপরই ভিতর থেকে একটা 'ঘেউ ঘেউ' আওয়াজ। আওয়াজটা এগিয়ে এল ঠিক বন্ধ দরজার অন্যপ্রান্তে। 'ঘেউ ঘেউ' করতে-করতে কুকুরটা বোধ হয় দরজাটা আঁচড়ানোর চেষ্টাও করছে। সুতীর্থর বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। এবার দরজার অন্যপ্রান্ত থেকে একটা মেয়ের গলায় আওয়াজ শোনা গেল, 'শাট আপ পিংপং...'

মেয়েটা বোধ হয় কুকুরটাকে সামলাল। 'ঘেউ ঘেউ' আওয়াজটা ক্রমশ ঘরের ভিতর দিকে চলে গেল। তিনদিন পর বাড়িতে ফিরে নিজের বাড়িকেই খুব অচেনা মনে হল সুতীর্থর। নতুন ড্রাইভার। একটা কুকুরের বাচ্চা। অচেনা মেয়ের গলা। এরা কারা? কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফের বেল টিপল।

ফের 'ঘেউ ঘেউ' আওয়াজ পাওয়া গেল। তবে আওয়াজটা দোতলা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজাটা খুলে গেল।

দরজার বাইরে দাদাবাবুকে দেখে একটু চমকেই উঠল পুরনো কাজের লোক যমুনা। দাদা-বউদির সংসারের নিত্য অশান্তির কথা যমুনার চেয়ে ভাল আর-কেউ জানে না। দাদা-বউদির মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় নেই। দু'জনের শোয়ার ঘরও আলাদা। দাদার এক তলায়। আর বউদির দোতলায়। একে অন্যকে ছাড়া মাঝে-মধ্যে কোথায় যে রাত কাটিয়ে আসে, কে খবর রাখে!

সুতীর্থর মুখে তিনদিনের না কামানো খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথার চুলও উসকো-খুসকো। শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। এই চেহারা যমুনাকে আরও শঙ্কিত করে তুলল। দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়াল যমুনা। সুতীর্থ বাড়ির ভিতর পা দিয়ে দ্রুত ভিতরে একবার চোখ বোলাল। কুকুরের বাচ্চা, অচেনা মেয়ের গলার উৎস, কিছুই চোখে পড়ল না।

নিজের ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত হল সুতীর্থ। ঘরটা ঠিকঠাকই আছে। এই শীতেও পাখাটা অল্প স্পিডে চালিয়ে গায়ের জামাটা খুলে খাটে ধপ করে বসল। যমুনা এক গেলাস জল নিয়ে এল। একবারে জলটুকু শেষ করে ধাতস্থ হয়ে যমুনাকে বাড়ির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার অবকাশ পেল সুতীর্থ।

"তোমার বউদি কি বাড়িতে কুকুর এনেছে?"

যমুনা বুঝতে পারল। অবাক হলেও দাদাবাবুকে ফিরতে দেখে যমুনা একটু স্বস্তিও পেয়েছিল। তিনদিন ধরে দাদাবাবুর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। মোবাইলও সুইচ্‌ড অফ ছিল। বউদি পর্যন্ত বেপরোয়া খোলসটা ছেড়ে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিল। যমুনার কাছে বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছে, দাদাবাবু বাড়ির ফোনে কোনও খবর দিয়েছে কি না! বউদিকে একটু বেশিই সমীহ করে যমুনা। দাদাবাবু সে জায়গায় কিছুটা খোলামেলা। গলাটা নামিয়ে যমুনা বলল, "বউদির এক পেশেন্ট বাড়িতে থাকতে এসেছে। ওর ডেরাইভারটা গ্যারেজের পিছনের ঘরে আছে, আর কুকুরটা..."

"পেশেন্ট?" ভুরু কুঁচকে যমুনার চোখের দিকে চেয়ে সুতীর্থ জানতে চাইল, "কে পেশেন্ট? কী হয়েছে?"

প্রশ্ন দুটো। প্রথমটার উত্তরটা অনায়াস। বউদির বন্ধুর মেয়ে। কাল, অনেক রাতে এসেছে। দ্বিতীয় উত্তরটা দিতে দাদাবাবুর সামনে জিভ আড়ষ্ট। মেয়েটা আইবুড়ো, পোয়াতি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে যমুনা দ্বিতীয় উত্তরটা মুখ ফুটে দিতে না পেরে সুতীর্থর চোখ থেকে চোখটা নামিয়ে নিল। সুতীর্থও আর উত্তরটা জানতে চাইল না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেল যে, উপরের পাপানের বেডরুমটায় অন্তরার এক পেশেন্ট আছে, আর তার সঙ্গে আছে একটি কুকুর।

ভিতরে-ভিতরে ফুটতে থাকল সুতীর্থ। অন্তরার সঙ্গে সম্পর্কটা তলানিতে পৌঁছে গিয়েও অল্প কয়েকটা গ্রন্থিতে এখনও বেঁচে আছে। সেরকমই একটা গ্রন্থি অনুচ্চারিত সমঝোতা। প্রেমহীন, বিশ্বাসহীন, মর্যাদাহীন এই বাড়ির বাতাসে ক্ষীণ স্রোতে ভেসে বেড়ায় সেই সমঝোতা। সেই সমঝোতা বাড়িতে অন্তরার কোনও পেশেন্টকে পাপানের ঘরে রাখার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। করতে পারে না।

মেয়েটা কে? রাতে সরাসরি অন্তরার সামনে প্রশ্নটা রাখল সুতীর্থ। দু'জনের রাতের খাবার সময়টাও আলাদা হয়ে গিয়েছে। সুতীর্থ যখন গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা ছুড়ল, তখন অন্তরা খাচ্ছিল। উত্তরটা দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল অন্তরা। চিন্তাটা যে আগে করেনি, তা নয়। কী বলবে সুতীর্থকে? যমুনাকে যা বলেছে, সুতীর্থর কাছে তা ধোপে টিকবে না। চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি মৃন্ময়ী এই বাড়িতে এসেছে। ওমপ্রকাশ যে চালটা চেলেছে, তাতে ওর থাকার স্থায়িত্ব কতদিন হবে, সেটা শুধু ঈশ্বর জানেন। ওমপ্রকাশকে যেমন জানিয়ে রেখেছে, এই ব্যাপারটায় সুতীর্থ কোনও ঝামেলা পাকালে কোনও দায়িত্ব নিতে পারবে না, তেমনই এই বাড়িতে থাকার কয়েকটা শর্ত, নিয়মকানুন মৃন্ময়ীকে বলে রেখেছে। কিন্তু অন্তরা নিজেই জানে, এসব কথার কথা। আদপে টিকবে না। এই বাড়িতে যে ক'দিন থাকবে, মৃন্ময়ীর মতো ছটফটে মেয়ে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে পারবে না। ক্রমশ এই বাড়ির আনাচ-কানাচে ওর গতিবিধি অবাধ হবে। তা ছাড়া, প্রবীর দাশগুপ্তর প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে, ব্যাপারটাকে গোপন রাখা। এই গোপনীয়তা বজায় রাখতে সুতীর্থ কী ভূমিকা নেবে, সেটাও ঈশ্বর জানেন! সুতরাং ওমপ্রকাশকে

যা-ই বলে থাক, সতর্ক হতেই হল অন্তরাকে, "মেয়েটা প্রেগন্যান্ট।"

"যমুনা বলছিল, তোমার কোনও বন্ধুর মেয়ে। কে জানতে পারি?"

"তুমি ঠিক চিনবে না।"

কথাটা যে সত্যি নয়, সেটা অন্তরার গলা শুনেই বুঝতে পারল সুতীর্থ। গম্ভীর গলায় বলল, "হুম, জানতে পারি কি, পাপানের ঘরটায় ওকে কেন থাকতে দেওয়া হয়েছে?"

ভিতর-ভিতর ওমপ্রকাশের উপর রাগটা বাড়তে থাকল অন্তরার। স্বামী সম্পর্কের এই লোকটার কাছে এত কৈফিয়ত কোনওদিন দিয়েছে কি ও? তবে এই মুহূর্তে নিজেই একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। অন্তরা বলল, "পাপান এবার ক্রিসমাসের ছুটিতে আসছে না।"

"সেটা আমিও জানি। ক্রিসমাসের ছুটি তো শেষ হতে চলল। আমি জানতে চাইছিলাম, এবার থেকে পাপান না থাকলে কি ওর ঘরটা তোমার নার্সিং হোমের এক্সটেনশন কেবিন হয়ে গেল?"

রাগটা নিজের বশে প্রাণপণে রাখার চেষ্টা করল অন্তরা। মাথা ঠান্ডা করে বলল, "মেয়েটা আনম্যারেড। অ্যাবর্শন করতে হবে। তোমাকে বলে রাখছি, এটা আমার মামলা। কোনও ইসু কোরো না।"

অ্যাবর্শন! চোয়ালটা শক্ত হল সুতীর্থর! কাটা-কাটা গলায় বলল, "এতদিন জানতাম তুমি মানুষ হিসেবে অ্যাবর্শন ব্যাপারটাকে পছন্দ করো না। সেটাও দেখছি ভুল জানতাম। তা কবে সম্পন্ন হবে তোমার এই হত্যালীলা?"

এবার আর রাগকে সামলাতে পারল না অন্তরা। ধাঁই করে মাথাটা গরম হয়ে গেল। বলে উঠল, "কী বলতে চাইছ তুমি? আমি যা করছি একটা মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, তার সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে করছি।"

"আমি তো কিছু বলিনি। শুধু জিজ্ঞেস করেছি কবে ভ্রূণটাকে মারবে? মেয়েটা পাপানের ঘরটা ছেড়ে কবে চলে যাবে?"

"নান অফ ইয়োর বিজনেস। পাপানের ঘরটা তোমার পয়সায় তৈরি হয়নি। ফর দ্যাট ম্যাটার, পাপানের পড়াশোনার খরচটা আমিই চালাই। পারলে একটা সেমেস্টারের খরচ দিয়ে তোমার পিতৃত্ব ফলিয়ো। তার আগে পিত্‌লা দরদ আর আদিখ্যেতা দেখাতে এসো না। আর ওই ট্র্যাশ বাংলাটা বলছ না, ভ্রূণটাকে কবে মারবে... এই কাজটা আমাদের করতে হয় তোমাদের মতো ইরেসপন্সিব্‌ল লোকদের জন্য, যারা ফুর্তি করে দায়িত্ব নেয় না। তোমাদের মেল ডমিনেটেড সোসাইটি যাকে স্বীকৃতি দেয় না!"

"দায়িত্ব যখন তোমার, সুতরাং মেরে ফ্যালো। মেরে ফ্যালো একটা মানুষের প্রাণকে। নো গিল্ট। সোলজার, ফাঁসুড়ে আর অ্যাবর্শন করা ডাক্তারদের পৃথিবীতে কেউ খুনি বলে না। ইউ আর লাইসেন্সড টু কিল!"

"শোনো, এই ব্যাপারে আমি পৃথিবীটা তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি। তুমি রেপ নিয়ে নাটক লিখেছ। রেপ্‌ড উইমেনদের মুখে হল ফাটিয়ে হাততালি পাওয়া ডায়ালগ লিখেছ। রেপ্‌ড মেয়ে জীবনে একটাও চোখে দেখেছ? মামা ভাগনিকে প্রেগন্যান্ট করে দিয়েছে, চোখে দেখেছ? ফুটপাথের উলঙ্গ পাগলি প্রেগন্যান্ট, চোখে দেখেছ? রিয়েল লাইফটা তোমার ড্রামা নয়।"

"পাপানের ঘরে যে আছে, সে কে? রেপ্‌ড ওম্যান, উলঙ্গ পাগলি, ভাগনি, না তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স?"

"শাট আপ। তোমাকে আবার বলছি, দিস ইজ মাই কেস। ডোন্ট পোক ইয়োর ডার্টি নোজ," অন্তরা হাঁফাতে লাগল। খাওয়ার ঘরের এক প্রান্ত থেকে পাকানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। হঠাৎ সেখান থেকে 'ঘেউ ঘেউ' করে ডাকতে-ডাকতে নামতে থাকল পিংপং।

পিছন-পিছন মৃন্ময়ী। পিংপং একতলায় নেমে এসে প্রথমেই দেখতে পেল খাবার টেব্‌লে সুতীর্থ বসে আছে। একটা আনকোরা নতুন মুখ। দৌড়ে গেল সুতীর্থর পায়ের দিকে। মৃন্ময়ী অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। অনুমান করতে পারেনি দাম্পত্যের একান্তে এসে পড়বে। যমুনার কাছে অল্পবিস্তর এই বাড়ির লোকজনদের সম্পর্কে জেনেছে। নির্ভুল আন্দাজ করে নিল অচেনা পুরুষটি ড. অন্তরা পাল চৌধুরীর হাজ্‌ব্যান্ড।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের ঘরে থাকার শর্তভঙ্গ হতে দেখে অন্তরা গম্ভীর গলায় মৃন্ময়ীকে বলল, "কিছু বলবে?"

"সরি আন্টি। তোমাদের খাওয়ার সময় এসে ডিস্টার্ব করছি।"

"বলো।"

মৃন্ময়ীর হাতে একটা পাকানো প্রেসক্রিপশন ছিল। অন্তরার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "শোয়ার আধ ঘণ্টা আগে কোন ওষুধটা খেতে বলেছিলে?"

প্রেসক্রিপশনটা এক লহমা দেখে অন্তরা বলল, "তিন নম্বরটা। কিন্তু তুমি এখনও খাওনি কেন? তোমাকে সাড়ে ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়তে বলেছি। উপর-নীচ করতে নিষেধ করেছি। এখন পৌনে বারোটা বাজে। ওষুধটাই এখনও খাওয়া হয়নি।"

"সরি আন্টি। ফেসবুকে এমন আটকে ছিলাম..."

খানিকটা সুতীর্থকে শুনিয়েই গলাটা ইস্পাত কঠিন করে অন্তরা বলল, "তুমি জানো, তুমি এখানে একটা অবজেকটিভ নিয়ে এসেছ। তুমি জানো, তার আগে তোমার একটা ট্রিটমেন্ট দরকার। সেটার জন্য দরকার একটা ডিসিপ্লিন। তোমাকে প্রথমেই সব বুঝিয়ে বলেছি। না শুনলে কিন্তু কেউ তোমাকে হেল্প করতে পারবে না!"

মৃন্ময়ীর মুখটা ছোট হল। পিংপং তখনও সুতীর্থর পায়ে মুখ ঘষে যাচ্ছে। সুতীর্থ মাথা নিচু করে দু'হাত বাড়িয়ে পিংপংকে তুলে এনে মৃন্ময়ীর দিকে এগিয়ে ধরল। পিংপংকে কোলে নিয়ে মৃন্ময়ী সুতীর্থকে বলল, "থ্যাঙ্কস আঙ্কল। আমি মৃন্ময়ী।"

অন্তরা চোয়াল শক্ত করল। মৃন্ময়ী দ্বিতীয় শর্ত ভাঙল। অন্তরা বলে দিয়েছিল, এই বাড়িতে তোমার নাম যেন লিপি গাঙ্গুলিই থাকে।

সোমবার, ৩০ ডিসেম্বর

আজও সারাদিন ধরে মৃন্ময়ীর মোবাইলটা বন্ধ বুঝতে পেরে শিঞ্জিনী তানিয়াকে আবার ফোন করে জানতে চাইল, "তানিয়া, মৃন্ময়ীকে ফোনে পেয়েছিস?"

"না রে, সেই গত শনিবারের আগের শনিবার যে আরামবাগের মামারবাড়িতে গিয়েছিল, তারপর থেকে একদম বেপাত্তা। আজও তিনটে এসএমএস করেছি, কিন্তু কোনও রিপ্লাই পাইনি। বাড়িতে ফোন করেছিলাম। কাকিমাও কিছু বলল না।"

"কী ব্যাপার বল তো?"

"কী জানি রে! তবে কাকিমার গলাটাও ভাল লাগল না। বলল, দ্যাখ হয়তো ফোনে চার্জ নেই। এক সপ্তাহ ধরে ফোনে চার্জ নেই, বিশ্বাস করতে হবে?"

"একবার ফেসবুকে দেখলে হয় না? অনলাইন পাওয়া যায় কি না..."

"ঠিক বলেছিস তো... আমি আজকাল টুইট বেশি করি বলে ফেসবুকে ঢোকা হয় না। দাঁড়া চেক করে বলছি। বুঝতে পারছি না নিউ ইয়ার্স ইভের পার্টির আগে মামার বাড়ি থেকে ফিরবে কি না..."

শনিবার, ৪ জানুয়ারি

ভোটের বছরের প্রথম শনিবার মন্দিরে ঠাকুরের কাছে একটু বেশিক্ষণ ধরেই ভক্তি সহকারে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে নেমে যেতে বলল প্রবীর দাশগুপ্ত। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে ওমপ্রকাশ গাড়োডিয়াকে ফোন করল।

"গুড ইভনিং স্যার," বিনয়ী গলায় সম্ভাষণ জানাল ওমপ্রকাশ। ওমপ্রকাশের বিনয়ী গলার পিছনে উদ্দাম সঙ্গীতের আওয়াজ।

প্রবীর দাশগুপ্ত গলাটা কঠিন করে বলল, "গাড়োডিয়া, আজ কিন্তু দশদিন হয়ে গেল।"

"আমি জানি স্যার। আজকে ড. পাল চৌধুরীর সঙ্গে বাচ্চির

আমার অনেকক্ষণ কথাও বলেছি। আপনি তো ডেভেলপমেন্টস জানেনই স্যার। প্লিজ, প্লিজ ডোন্ট ওরি। শুধু ড. পাল চৌধুরীকে আর-একটু বেশি সময় দিন।"

"অন্তরা পালচৌধুরীর কেপেবিলিটি নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। ওই অ্যানিমিয়ার কথাটা বলছে। আমি ভাবছি অন্য কথা। ওই সেদিন আইন-ফাইন বলছিলেন না। সেরকম কিছু..."

"আমি ড. পাল চৌধুরীকে বলেছি, আপনি ডাক্তারিটা দেখুন। আইনের দিকগুলো আমি দেখছি। কোনও সমস্যা নেই।"

"সমস্যা কি আর একটা গাড়োডিয়া? ভেবেছিলাম এর মধ্যে যা হওয়ার হয়ে যাবে। পরশু ওর কলেজ খুলে যাচ্ছে। ওর মোবাইলটা আমি নিয়ে রেখে দিয়েছি। মোবাইল বন্ধ দেখে বন্ধুরা বাড়িতে ফোন করছে। এবার তো কলেজে সকলে জানতে চাইবে, মৃন্ময়ী কোথায়!"

"বলুন না স্যার, মৃন্ময়ী একটা বড়সড় টুরে গিয়েছে, যেখানে মোবাইল সিগন্যাল পৌঁছয় না।"

"লোকে অত বোকা নয় গাড়োডিয়া। যদিও আপাতত ঠেকিয়ে রাখতে এরকমই কিছু বলতে হবে। কিন্তু সেটা কতদিন? সমস্যা তো আরও আছে। যে ছেলেটা এই কাণ্ডটার জন্য দায়ী, আমি এখনও তার নামটা পাইনি। মৃন্ময়ী কিছুতেই মুখ খোলেনি। কিন্তু ছেলেটার নামটা জানা ভীষণ দরকার। আপনি অন্তরা পাল চৌধুরীকে বলবেন, যদি ছেলেটার নাম উনি জানতে পারেন, তা হলে ইমিডিয়েটলি যেন আমাকে জানায়।"

"বেফিকর থাকুন স্যার।"

"শেষ আর-একটা সমস্যার কথা আপনাকে বলি। মৃন্ময়ীর মা..."

"আপনি বলেছেন স্যার! প্লিজ, ভাবিজিকে বুঝিয়ে বলুন। উনি যেন আমাদের ফ্যামিলির লোকই মনে করেন। আসলে কী জানেন তো, এমনিতে মৃন্ময়ী খুবই ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু মাকে দেখলে হয়তো সেন্টিমেন্টাল হয়ে যেতে পারে! মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যাপার তো!"

"দেখি কী করি। থ্যাংক ইউ গাড়োডিয়া। আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজার আমার কাছে এসেছিল। আপনাদের হসপিটালের সামনের ঝুপড়ির সমস্যাটা... আমি দেখছি..."

"প্লিজ স্যার! বাচ্চির সঙ্গে এটা একসঙ্গে দেখবেন না..."

বুধবার, ৮ জানুয়ারি

"অদ্ভুত ব্যাপার রে শিঞ্জিনী। সেদিন থেকে ফেসবুকে রোজই মৃন্ময়ীকে অনলাইনে পাচ্ছি, ওর ফার্মটাও বাড়ছে দেখছি। কিন্তু ফোন, ই-মেল কিছুতেই ওকে পাচ্ছি না।"

"আমিও তো তাই দেখছি। কাকিমাকে আর ফোন করেছিলি?"

"করেছিলাম। আর করব না, ভীষণ বিরক্ত হচ্ছে। বলল, রাজস্থানে গিয়েছে মেজমামার পরিবারের সঙ্গে। যেখানে গিয়েছে সেখানে নাকি ফোনের কোনও টাওয়ার নেই!"

"টাওয়ার নেই! বললেই হল? তা হলে নেট কানেকশন পাচ্ছে কী করে? দেখেছিস ফার্মভিল-এর আর-একটা লেভেল বেড়ে গিয়েছে। ফার্মটা কীরকম সাজিয়েছে!"

"জানিসই তো মেয়েটা ফার্মভিল খেলার জন্য কীরকম পাগল। মনে নেই দিঘায় গিয়ে বাঁকিপুর গেলই না!"

"তা বলে ফোনটা সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখবে?"

"নম্বর চেঞ্জ করেনি তো?"

"পালটে ফেললেও মেল আইডি তো পালটায়নি। অদ্ভুত তো!"

"জানিসই তো ও কীরকম পাগল!"

"মা একটা কথা বলছিল। বিখ্যাত নেতার মেয়ে, বেশি ভিতরে না ঢোকাই ভাল।"

"যাঃ! মৃন্ময়ী কখনও আমাদের সঙ্গে ওভাবে মিশেছে নাকি!"

শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি

"তোমাকে এত টেন্‌সড দেখাচ্ছে কেন ডক?" গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে ওমপ্রকাশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল।

"প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ের ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই একটু সিরিয়াস টার্ন নিচ্ছে। মেয়েটার ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা খুব আস্তে-আস্তে ইমপ্রুভ করছে। এখনই অ্যাবর্ট করার মতো জায়গায় নেই।"

"হয়তো সেই কারণেই গৌরবপুরের পলিটিক্যাল সমস্যাগুলো খুব স্লোলি ইমপ্রুভ করছে। হা হা। তুমি যেরকম চেষ্টা করছ, প্রবীর দাশগুপ্তও সেরকম চেষ্টা করছে। হা হা! জোক্‌স অ্যাপার্ট, সেক্সি মেয়েটাকে নিয়ে কী আর করা যাবে? যে কাজটার জন্য ওকে এনেছ, সেটা না করে তো আর ফেরত দিয়ে আসা যায় না! প্রবীর দাশগুপ্তকে সেদিন আমিও বলেছি কথাটা, কন্ডিশন খুব স্লো বাট স্টেডিলি ইম্প্রুভ করছে।"

"উফ ওম! কী যে বিচ্ছিরি ফাঁসিয়েছ! অ্যাবর্শন ব্যাপারটা আমার একদম ভাল লাগে না। আর তুমি আমাকে সেটা করার দিকেই ঠেলে দিচ্ছ। তুমি জান না, এক-একটা মেয়ে অ্যাবর্শন করার আগে কীরকম কাঁদে! হ্যান্ডেল করা যায় না। ওদের অনেক কিছু বোঝাতে হয়। বিফোর দ্য জব, কাউন্সেলিং করতে হয়। যে কাজটা আমি নিজেই মনের ভিতর থেকে সমর্থন করি না, বুকে পাথর চেপে সেটাকে সাপোর্ট করে কাউন্সেলিং রীতিমতো কঠিন ব্যাপার!"

"আশা করি, এক্ষেত্রে সেরকম কিছু হবে না। মেয়েটা রাজি, এমনকী নিজেও ট্রাই করেছিল।"

"অনেকে এরকম আছে, যারা প্রথমে রাজি হলেও পরে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করে। অ্যাবর্ট করার পর কিন্তু কারও-কারও সাংঘাতিক রিপেনটেন্স হয়। এটা তো একটা ট্রমা।"

"কিন্তু এটা তোমাকে করে দিতেই হবে ডক। তুমি ওকে এটা করার জন্যই নিয়ে এসেছ। এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। তুমি একটা কথা চিন্তা করে দ্যাখো, তোমার যদি অ্যাবর্শন করতে ইচ্ছে না করে, তা হলে প্রচুর ডাক্তার রয়েছে যারা খুশি মনে কাজটা করে দেবে। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রেখো, ভরসা রেখে প্রবীর দাশগুপ্ত যে কাজটা তোমাকে দিয়েছে, সেটা যদি করতে না পারো, তা হলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আমাদের জন্য ভাল হবে না। প্রবীর দাশগুপ্তকে গুডবুকে না রেখে তুমি কিন্তু গৌরবপুরে ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালে মেডিক্যাল ডিরেক্টর হয়ে একদিনও কাজ করতে পারবে না!"

অন্তরা কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "মেয়েটার একটা সোনোগ্রাফি করতে হবে..."

"তোমাকে প্রবীর দাশগুপ্ত একটা সোনোগ্রাফি রিপোর্ট দিয়েছে না?"

"সোনোগ্রাফিটা খুব-একটা ভাল ছিল না।"

ওমপ্রকাশ গিয়ার থেকে হাতটা ঈষৎ তুলে অন্তরাকে থামিয়ে বলল, "সোনোগ্রাফি করা মানে তো তোমার ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে। তুমি কি প্রবীর দাশগুপ্তর শর্তটা ভুলে গেলে! কোনও ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না!"

"কারণ তিনি চান, বাইচান্স যেন চেনাশোনা কেউ ওকে দেখে না ফ্যালে। হি ইজ টু মাচ নার্ভাস। এক্সট্রিম চিন্তা করে বসে আছে।"

"পলিটিশিয়ানরা এক্সট্রিম চিন্তাই করে। ধরো, আমাদের লাক যদি খারাপ হয় আর বাইচান্সটাই ক্লিক করে যায়, তুমি জানো না আমাদের জন্য কী এক্সট্রিম চিন্তাটা ও করে রেখেছে। তুমি কী ভাবছ, ওই রূপক ছেলেটাকে এমনি-এমনি তোমার বাড়িতে পার্ক করে রেখেছে? তোমার প্রত্যেকটা মুভমেন্ট, প্রত্যেকটা অ্যাকশন মনিটর এবং রিপোর্ট করা হয়।"

"তুমি বুঝতে পারছ না ওম!" অন্তরা অসহায় হয়ে বলে ওঠে, "তুমি যেরকম রিস্কের কথা বলছ, তার চেয়ে অনেক বড় রিস্ক হয়ে যাবে মেয়েটার কিছু হয়ে গেলে। ঠিক আছে, দরকার হলে ক্লিনিক

আওয়ার্সের পর আমি মেয়েটাকে নিয়ে এসে টেস্টগুলো করিয়ে নেব। তা ছাড়া অ্যাবর্শন যদি করতেই হয়, একটা স্টেজে ওকে কিন্তু নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করাতেই হবে।"

"সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করছ কেন? মাঝরাতে তোমার নার্সিংহোমে গোপনে অ্যাডমিট করিয়ে দেব। ফ্লোরে অন্য-কোনও পেশেন্ট থাকবে না। কেউ যাবে না। আবার ঠিক মাঝরাতেই ডিসচার্জ করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

"সেটাই যদি করবে, তা হলে একইভাবে সোনোগ্রাফিটা করিয়ে নিতে আপত্তি কোথায়?"

"তাঁর মেয়ের এই ব্যাপারে যে-যে কমিটমেন্টগুলো আমরা করেছিলাম, সেগুলো নিয়ে আমরা কতটা সিরিয়াস, জাস্ট সেটা প্রমাণ করার জন্য। তোমাকে বলেছি না ডক, কিছু চিন্তাভাবনা, ফরওয়ার্ড স্টেপ জাস্ট আমার উপর ছেড়ে দাও।"

শনিবার, ১১ জানুয়ারি

"হ্যালো তানিয়া? তুই ঠিকই বলেছিলি রে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এইমাত্র লাইব্রেরির সামনে বাপন আমাকে ধরেছিল। মৃন্ময়ীর ব্যাপারে কত প্রশ্ন..."

"বাপন মানে মৃন্ময়ীর বাবার চামচা? আজব তো! ও তো চব্বিশ ঘণ্টা মৃন্ময়ীর বাবার সঙ্গে ঘুর-ঘুর করে... সে আবার তোকে মৃন্ময়ীর ব্যাপারে কী জিজ্ঞেস করছিল?" খুবই কৌতূহলী গলায় তানিয়া জানতে চাইল।

"ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথা। সেই আমরা দিঘায় গিয়েছিলাম, কোথায়-কোথায় ঘুরেছিলাম, কারও সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না, এসব।"

"এতদিন পর? বাপনের সঙ্গে তো কত দেখা হয়েছে..."

"সেটাই তো..."

"তোকে কী বলেছিলাম? মায়ের কথাই ঠিক... নেতার মেয়ের ব্যাপারে বেশি না..."

"অ্যাই, আমি ছাড়ছি রে! বাপনটা এদিকে আসছে..."

শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি

বীরেশ্বর মজুমদার পার্টি অফিসে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত ছেলেগুলো।

"বীরেশ্বরদা কলেজ ইলেকশনে ওরা আমাদের একটাও নমিনেশন ফাইল করতে দিচ্ছে না! নির্মল জোর করে চেষ্টা করেছিল, বেমক্কা কেলিয়েছে। ওরা বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে বীরেশ্বরদা, এবার কিন্তু আমরা ছাড়ব না..."

বীরেশ্বর মজুমদার চেঁচিয়ে উঠল, "কী করবি? কী করতে পারবি তোরা? যত ক্যাঁচর-ম্যাঁচর শালা আমার কাছে কাছে এসে। কিছু করার থাকলে করে এসে বলতিস।"

উত্তেজিত ছেলেগুলো চুপ করে গেল। আর কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ছোটখাটো স্তরে প্রত্যেকটা নির্বাচনই একটা প্রেস্টিজ ইসু। এসব নির্বাচন জেতা মানে বড় যুদ্ধের আগে পার্টির ছেলেদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠা। কলেজের ইউনিয়ন ইলেকশন হলেও বীরেশ্বর মজুমদারের মতো ডাকসাইটে নেতার কাছে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইসু। ক'দিন ধরে উঠে-পড়ে লেগেছে এই কলেজ ইলেকশন নিয়ে।

টেব্‌লের উপর কাগজে মোড়া কয়েকটা পান। মোড়ক খুলে একটা পান মুখে পুরে আয়েস করে চিবোতে থাকল বীরেশ্বর মজুমদার। তারপর দার্শনিকের মতো বলতে থাকল, "গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনে নমিনেশন জমা করতে পারবে না, এটা কোনও কথা হল? ওদের সব নমিনেশন জমা পড়ল কী করে?"

একজন মিনমিনে গলায় বলার চেষ্টা করল, "কিন্তু বীরেশ্বরদা আমাদের অনেক প্রার্থী ভয় পেয়ে..."

একটা ব্যবহৃত চায়ের ভাঁড়ে পানের পিক ফেলে বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "যে ঢ্যামনাগুলো ভয় পাচ্ছে, শালাদের নামগুলো কেটে দিয়ে অন্য প্রার্থী দে।"

ছেলেগুলো এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করল। বীরেশ্বর মজুমদার আবার দার্শনিকতায় ফিরে গেল, "ফুলবাবু হয়ে সক্রিয় রাজনীতি করা যায় না। কথাটা তোদের বহুবার বলেছি। আমাকে দ্যাখ, তোরাই তো আড়ালে আমার নাম দিয়েছিস 'অষ্টাবক্র মজুমদার'! নামটা শুনলে আমার গর্ব হয়। রাজনীতি করতে গিয়ে আটবার হাড়গোড় ভেঙেছে আমার। পাঁচবার ওরা, তিনবার পুলিশের লাঠি। কিন্তু কোনও শালা মাইকা-লাল আমাকে রাজনীতি থেকে সরাতে পেরেছে? তোদের জন্য আমি আছি। আমার কোনও গডফাদার ছিল না যে, ক্যাঁউ-ক্যাঁউ করে গিয়ে বলব 'দাদা, ওরা পেঁদাচ্ছে। উফ দাদা বড্ড লাগছে।'

ছেলেগুলো ভিতরে ফুটছে, কিন্তু চুপ। বীরেশ্বর মজুমদার তাড়িয়ে-তাড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করতে-করতে বলল, "আমি এস পি-র সঙ্গে কথা বলছি। কাল প্রিন্সিপালটাকে ঘেরাও কর। বাথরুমেও যেতে দিবি না। তার আগে আমাদের লিস্টিটা আর-একবার দে তো। আমাদের ঢ্যামনাগুলোর নামগুলো কাটি।"

একটা ছেলে পকেট থেকে একটা বড়সড় কাগজ বের করল। এপক্ষ এবং ওপক্ষের ক্লাস রিপ্রেজেনটেটিভ প্রার্থীদের নাম পাশাপাশি লেখা রয়েছে। কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে থাকল বীরেশ্বর মজুমদার। চোখে চশমাটা গলিয়ে ওপক্ষের নামগুলোতে আগাপাস্তলা চোখ বুলিয়ে বলল, "দাশগুপ্ত নামটা দেখছি না?"

"দাশগুপ্ত মানে?" জি এস ক্যান্ডিডেট ভাস্কর জিজ্ঞেস করল।

"আঃ!" বিরক্ত হল বীরেশ্বর মজুমদার, "প্রবীর দাশগুপ্তর ডাগর মেয়েটা। গতবার সি আর ছিল না?"

মিনমিনে গলার ছেলেটা বলল, "মৃন্ময়ী তো কলেজে আসাই ছেড়ে দিয়েছে বীরেশ্বরদা।"

"কেন রে? বাপের আগেই ময়দান ছেড়ে পালাল নাকি রে?"

আর-একজন বলল, "শুধু কলেজেই নয় বীরেশ্বরদা। শুনছি হপ্তা তিনেক হল গৌরবপুর ছেড়েই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। শুনছি তো মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না!"

বীরেশ্বর মজুদার নড়েচড়ে বসল, "কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে?"

"কেউ ঠিকঠাক জানে না। বাড়ি থেকে তো বলছে, মামাবাড়ি থেকে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছে। ছাড়ুন দাদা মৃন্ময়ীর কথা। অরিন্দমের বিরুদ্ধে গো হারা হেরে যেত। ওকে আমরা ধরিইনি।"

কাগজের মোড়ক ছাড়িয়ে আর-একটা পান মুখে পুরে নিল বীরেশ্বর মজুমদার। চোখ দু'টো আবার অর্ধেক বন্ধ করে দার্শনিক হয়ে বলল, "তোদের হাতে ধরিয়ে রাজনীতিটা শেখালেও তোরা শিখবি না। প্রতিপক্ষের প্রতিটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খবর রাখতে হয় রাজনীতিতে। খোঁজ কর প্রবীর দাশগুপ্তর ডাগর মেয়েটা এই ভোটে না দাঁড়িয়ে চুপচাপ রাজস্থানে হাওয়া হয়ে গেল কেন? নাকি কোনও রোমিও-র সঙ্গে পালাল? খোঁজ নে। খোঁজ নে। কে দায়িত্বটা নিবি?"

দায়িত্ব নিতে কেউই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগলো না। শেষ পর্যন্ত বীরেশ্বর মজুমদারই মৃন্ময়ীর খবরাখবর নেওয়ার জন্য বেছে নিল একটা ছেলেকে।

শনিবার, ১৮ জানুয়ারি

পার্টির নেতার নির্দেশ। ছেলেটা একদিনও সময় নষ্ট না করে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করল মৃন্ময়ীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের কাছ থেকে।

"তানিয়া, মৃন্ময়ীর কী খবর রে? শুনলাম রাজস্থান গিয়েছে! কবে ফিরবে জানিস?"

তানিয়া থমকে দাঁড়াল, ছেলেটাকে আগাপাস্তলা দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

"যাঃ বাবা! রেগে যাচ্ছিস কেন? তুই, শিঞ্জিনী, মৃন্ময়ী তোরা এত

ভাল বন্ধু, তাই। মৃন্ময়ীকে দেখছি না অনেকদিন। তাই জাস্ট জানতে চাইছিলাম।"

তানিয়া কোনও উত্তর না দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে থাকল। ছেলেটা পিছু ছাড়ল না, "অ্যাই শোন, আমার একটা বই ও নিয়েছিল, তোর কাছে ফেরত দিয়ে গিয়েছে কি?"

তানিয়া দাঁড়াল না। পিছন থেকে ছেলেটার কাঁধে একটা হাত পড়ল, চমকে উঠে ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে দেখল ক্লাসের অন্য দুটো ছেলে। মুখে একটা মজা পাওয়া হাসি, "কী গুরু? পাত্তা দিচ্ছে না?"

"ধুস! শালা ফালতু মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম মৃন্ময়ীর কথা। আলশান বকে চলে গেল।"

"কেন গুরু? মৃন্ময়ীর খবরে কী দরকার?"

"দরকার মানে... না... আসলে মৃন্ময়ী আমার একটা বই নিয়েছে। তবে যে ফেরত পাব..."

এই এক বই ফেরতের অছিলায় ছেলেটি ক্রমশ পাকা অনুসন্ধানীর কাজ শুরু করল। কলেজের ঠিক সামনেই একটা সিগারেটের দোকান। সিগারেটের দোকানদারের একটা অলিখিত কর্তৃত্ব আছে ছেলেগুলোর উপর। বছর-বছর ওরা আসে-যায়। কেউ-কেউ সিগারেট ফোঁকার নেশা নিয়েই কলেজে আসে। ধার-বাকিতে সিগারেট যায়। এর জন্য ওই দোকানদারের একটা গর্ব রয়েছে। অনুসন্ধানী ছেলেটার সঙ্গে বাকি ছেলেদের মৃন্ময়ীকে নিয়ে আলোচনা চলছিল। দোকানদার একসময় স্বগতোক্তি করল, "তোমরা আর জানবা কী কইরা? অতবড় নেতা যে বাপ সেই পর্যন্ত জানে না মাইয়া কোথায়?"

"মানে? ও রাজস্থানে যায়নি?"

দোকানি বিজ্ঞের হাসি দিয়ে বলল, "বাপ যদি রাজস্থানেই পাঠায়, তা হলে কি আর এই আমার কাছে খোঁজ লইতে পাঠায়, মাইয়া কোন ছেলের সঙ্গে মিলামেশা করত? প্রেম-পিরিত ছিল কি না?"

"মৃন্ময়ীর প্রেম? না, কারও সঙ্গে ছিল না।"

"ছাই জানো তোমরা।"

"আমরা জানব না তো কে জানবে? ক্লাসে-কোচিংয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে ও!"

"ক্লাস-কোচিংয়েই শুধু প্রেম হয় বুঝি? তার বাইরে হয় না? খোঁজ করো দিকি ওদের ডেরাইভারটা কবে থেকে ঘরে ফেরেনি? রোলিং-মিলে পাকা কাজের জন্য ওর কথা তো প্রায় পাক্কা হয়ে গিয়েছিল!"

অনুসন্ধানী ছেলেটার কাছে জল আরও গভীর মনে হল। আরও অনুসন্ধান করে জানতে পারল, ওদের ড্রাইভার রূপক নামে ছেলেটা সদ্যবিবাহিত এবং আশ্চর্যভাবে মৃন্ময়ী বেপাত্তা হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে চাকরি ছেড়ে সে-ও বেপাত্তা!

সোমবার, ২০ জানুয়ারি

"শিঞ্জিনী, তোকে সেদিন বাপন ধরেছিল না। আজকে কী হয়েছে জানিস? আমাকে সোমনাথ ধরেছিল!"

"সোমনাথ? মানে ওই বীরেশ্বর মজুমদারের চেলা?"

"হ্যাঁ রে! কালই বলতাম। তোকে তো ফোনে পেলামই না।"

"টিভি দেখছিলাম। যাই হোক, কী বলছে সোমনাথ?"

"সেই মৃন্ময়ীর কথা..."

"আমাদের দু'জনের তো আচ্ছা ঝামেলা হয়েছে। সকলে আমাদের জিজ্ঞেস করছে কেন বল তো? তুই কী বললি?"

"কিচ্ছু বলিনি। কথা না বাড়িয়ে সোজা হাঁটা দিয়েছি। তাও ব্যাটা ছাড়ে না। জানিস তো মা বলছিল, প্রবীরকাকু কলেজ ইলেকশনের গন্ডগোলে মৃন্ময়ীকে রাখবে না বলে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। ওদের তো অনেকরকম সিকিয়োরিটিও লাগে।"

"তাই হবে হয়তো। কাল রাতেও তো ফার্মভিলে বহাল তবিয়তে আছে। ছাড় না। বড়-বড় লোকদের কথা ভেবে আমাদের কী লাভ?

"একদম ঠিক কথা। চল ছাড়ছি..."

মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি

নাটকের খসড়া আর মূল সংলাপগুলো লেখা হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দগঞ্জে পুলকের বাড়িতে। এবার পুরো নাটকটা গুছিয়ে লিখে ফেলার পালা। মেটামরফসিসের প্রথম লাইনটাই কাফকার এক চিরস্মরণীয় কীর্তি। একদিন সকালে গ্রেগর সামসা ঘুম ভেঙে উঠে দেখল আশ্চর্যজনকভাবে সে একটা বিশালাকৃতি পতঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অনেক বিদগ্ধ সাহিত্যবোদ্ধা বলে থাকেন, এটাই মেটামরফসিস নভেলার সবচেয়ে শক্তিশালী লাইন। এই অসামান্য প্রথম লাইনটাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে নাটকের প্রথম দৃশ্যটার নাট্যরূপ কীরকম হবে, দিনের পর দিন সেটা নিয়ে ভেবেছে সুতীর্থ। অনেকরকম ভাবনা মাথায় এসেছে, আজ আবার নতুন একটা ভাবনা এল।

সুতীর্থ নতুন ভাবনাটা মাথায় আসতে নিজেকেই বলল, পুলক যাই বলে থাকুক, কাফকার ওই অসাধারণ প্রথম লাইনের পাঞ্চটা দর্শককে দিতে হলে একটা পরিবর্তন আনতেই হবে। ধরা যাক, গ্রেগর সামসার চরিত্রটা করবে অসীম। দৃশ্যটা শুরু হবে আগেরদিন রাত থেকে। ড্রপ স্ক্রিন উঠলে হালকা নীল আলোয় দেখা যাবে মঞ্চের মধ্যে একটা দুধসাদা খাট। দর্শকদের দিকে মুখ করে অসীম ঘুমোচ্ছে। তারপর অসীম আস্তে-আস্তে পাশ ফিরবে। সেই সঙ্গে ধীরে-ধীরে নিভে যাবে নীল আলোটা। মঞ্চ অন্ধকার। দর্শকদের দিকে মুখ করিয়ে একটা বড় আয়না অন্ধকারে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে। অসীমকে এই সময়টুকুর মধ্যে পরে ফেলতে হবে পতঙ্গের জ্যাকেট আর মুখোশ। আবহে একটা মোরগের ডাক হবে। সকাল হল। মঞ্চ সাদা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। অসীম দর্শকদের দিকে পিছন করে উঠেই আড়মোড়া ভাঙবে। উঠে এগিয়ে যাবে আয়নার সামনে। চমকে উঠবে। চমকে উঠবে দর্শকরাও। আয়নার মধ্যে দিয়ে তারা দেখবে অসীম পতঙ্গে পরিণত হয়েছে।

ভাবনাটা জুতের হল। রাত দু'টো। পরম উৎসাহে আর-একটা সিগারেট ধরাল সুতীর্থ। তারপর লিখতে আরম্ভ করল। পাক্কা এক ঘণ্টা পর প্রথম দৃশ্যটা নতুন করে লেখা শেষ করে সুতীর্থ বুঝতে পারল ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে উঠেছে। যে-কোনও সুস্থ মানুষ এই ঘরে ঢুকলে ধোঁয়ায় অসুস্থবোধ করতে পারে! মনে হল একটু টাটকা বাতাস হলে ভাল হয়। শীতের শেষ সময় জানালাগুলো খুলে দিলে ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা ঢুকে পড়তে পারে! তাই ঘরের বাইরে যাবে বলেই ঠিক করল।

এত রাতে তালা খুলে বাইরে যাওয়ার হ্যাপা অনেক। তাই খোলা আকাশের নীচে গিয়ে সিগারেট খাওয়ার বাসনাটাকে বাতিল করতে হল। বিকল্প জায়গার মধ্যে আছে একতলার পিছনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দাটা। এলোমেলো চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে সেই বারান্দাতেই এল সুতীর্থ। গ্রিলের লোহার আলপনায় হাত রেখে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার হারিয়ে গেল মেটামরফসিসে।

গ্রেগর সামসা তো এভাবে বন্দি থাকত। ওর ঘরে কোনও জানালা ছিল কি? নিজের জানালা দিয়ে সব নৈরাশ্য ও হতাশাকে কখনও মেঘে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কি?

ঘেউ ঘেউ... ঘেউ ঘেউ... একতলায় ভিতরের ঘরের দিক থেকে পিংপং-এর ডাকে সম্বিৎ ফিরল সুতীর্থর। কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মাস খানেক হয়ে গেল পাপানের ঘরে ওই মেয়েটি রয়েছে। তবে দোতলা থেকে মাঝে-মাঝে কুকুরটার ডাকের আওয়াজ পেলেও মেয়েটার উপস্থিতির কোনও সাড়াশব্দ পায় না সুতীর্থ। এমনিতেই বাড়ি ফেরে দেরি করে, অনেক রাতে। ইদানীং বাড়িতে আর খেতেও ইচ্ছে করে না ওর। বেশিরভাগ দিনই দোকানে তড়কা-রুটি খেয়ে নিজের ঘরে চুপচাপ চলে আসে। বাড়িতে যে মেয়েটা আছে, সেটা মাঝে-মাঝেই ভুলে যায়। কৌতূহলবশে যমুনার কাছে একদিন শুধু খোঁজ করে জেনেছিল, অন্তরা মেয়েটাকে ঘরের বাইরে বেরোতে একদম নিষেধ করে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরের দিকে চলে এল সুতীর্থ। নীচের তলাটা

অন্ধকার। শুধু সুতীর্থর ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক গলে অল্প আলো মাটি চিরে পড়ছে। কুকুরটার ডাক একতলায় শুনতে পেলেও অন্ধকারে তাকে ঠিক দেখতে পেল না। সেই সঙ্গে একতলা থেকে দোতলায় যে ঘোরানো সিঁড়িটা উঠে গিয়েছে, তার মাথা থেকে মেয়েটার চাপা গলায় আওয়াজ পেল, "পিংপং... পিংপং... উঠে আয়।"

অন্ধকারে চমকে উঠল সুতীর্থ। পায়ের কাছে একটা দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। তুলোর বলটা এবার এসে পায়ের কাছে মুখ ঘষতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মেয়েটা তখনও চাপা গলায় পিংপংকে ডেকে চলেছে। সুতীর্থ একটু সতর্ক হল। গর্ভবতী। মেয়েটা পিংপং-কে খুঁজতে গিয়ে অন্ধকার সিঁড়িতে বেকায়দায় পা ফসকালে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

আলতো করে পিংপং-কে পায়ের কাছ থেকে তুলে সুতীর্থ গলাটা অল্প তুলে বলল, "পিংপং আমার কাছে। দাঁড়াও, অন্ধকারে নেমো না। আমি আলো জ্বালছি।"

হলের আলোটা জ্বালতেই সুতীর্থ দেখল, ঘূর্ণি সিঁড়ির ব্যানিস্টার ধরে মেয়েটা অর্ধেক সিঁড়ি নেমে এসেছে। অনেকদিন পর মেয়েটাকে দেখল সুতীর্থ। মেয়েটার চেহারায় শুধু একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল। এই ক'দিনে যেন তলপেটটা আর-একটু বড় হয়েছে।

মেয়েটাকে বাকি সিঁড়িগুলো বেয়ে নীচে আসতে দেবে, নাকি সুতীর্থই উঠে গিয়ে পিংপংকে পৌঁছে দেবে, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই নীচে এসে পৌঁছে গেল মৃন্ময়ী। হাত বাড়িয়ে পিংপংকে নিজের কোলে নিয়ে বলল, "সরি আঙ্কল।"

পাপানের ঘর দখল করে থাকা মেয়েটার প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা ছিল সুতীর্থর। তবুও ভদ্রতাভাবে উত্তর দিল, "ঠিক আছে।"

"আমি একটু বসে উপরে যেতে পারি?" অল্প হাঁফ ধরা গলায় অনুমতি চাইল মৃন্ময়ী।

সুতীর্থ অল্প বিরক্ত হয়ে হলের সোফাটা দেখিয়ে বলল, "বোসো।"

ধীরেসুস্থে সোফায় এসে বসে মৃন্ময়ী আবার বলল, "সরি আঙ্কল, এত রাতে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।"

মৃন্ময়ীর ক্ষমা চাওয়ার অভিব্যক্তিতে কোনও অভিনয় নেই। সুতীর্থ বলল, "ঠিক আছে। আমি জেগেই ছিলাম।"

"আপনি বসুন না আঙ্কল।"

এবারও মৃন্ময়ীর গলার আন্তরিকতাতে হার মানল সুতীর্থ। মৃন্ময়ীর সোফার উলটোদিকে এসে বসল। কথা বলার একটা তাগিদ যেন জমে ছিল মৃন্ময়ীর গলায়। মিষ্টি হেসে বলল, "আপনি রাত জেগে নাটক লেখেন, তাই না?"

সুতীর্থ বিস্মিত হল, "তোমাকে কে বলল?"

"যমুনাদি। আমার মাঝে-মাঝে খুব ইচ্ছে হয় জানেন, একদিন রাতে আপনার ঘরে এসে উঁকি মেরে দেখি আপনি কী লিখছেন!"

সুতীর্থ ফের সতর্ক হল। এই পিংপংকে ছেড়ে দেওয়া কি মাঝরাতে সুতীর্থর ঘরে আসার একটা বাহানা? অন্তরা একটা মেডিক্যাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে শহরের বাইরে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে যথারীতি বলে যায়নি। এই মেয়েটার চরিত্রর পবিত্রতা অজানা নয়। উদ্দেশ্য সন্দেহজনক হতে পারে! মুখে কাঠিন্য এনে সুতীর্থ বলল, "আমার মনে হয় এই অবস্থায় তোমার রাতজাগা ঠিক নয়। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল। একটা ম্লান হেসে মৃন্ময়ীও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর সময় পিংপংকে ঠিক ধরে রাখতে পারল না। মৃন্ময়ীর হাত থেকে বেরিয়ে পিংপং 'ঘেউ ঘেউ' করে দাপাদাপি করতে শুরু করল এবং এক সময় সুতীর্থর ঘরের দরজার ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সুতীর্থ তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এল। পিংপং লাফিয়ে উঠে পড়েছে খাটে। পেপারওয়েট উলটে মেটামরফসিসের খসরা লেখা ফুলস্কেপ কাগজগুলো তছনছ করে দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। পিংপংকে ছেড়ে সুতীর্থ ব্যস্ত হয়ে উঠল ছড়ানো কাগজগুলো গুছিয়ে তুলতে।

মৃন্ময়ী দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইল, "আই অ্যাম সো সরি আঙ্কল। আমি হেল্প করব?"

"না!" মৃন্ময়ীর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল সুতীর্থ, "এই ঘরে সিগারেটের যা ধোঁয়া, সেটা তোমার আর তোমার বাচ্চা কারও জন্যই ভাল নয়। তা ছাড়া তোমার নিচু হওয়াও ঠিক নয়।"

কাগজগুলো গুছিয়ে তুলে সুতীর্থ দেখল মৃন্ময়ী অনুমতির তোয়াক্কা না করে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। নিজের পেটের উপর হাত রেখে অদ্ভুত একটা ম্লান তেরচা হাসি হেসে বলল, "আপনি জানেন না আঙ্কল, এটাকে আন্টি কয়েকদিনের মধ্যেই মেরে ফেলবে।"

সুতীর্থর মনটা ভারী হয়ে গেল। মেয়েটার গর্ভস্থ ভ্রূণের জন্য শরীরে যে বহিঃপ্রকাশ আছে, তার ভিতর থেকে এক হৃৎস্পন্দন কে শুনতে পাচ্ছে ও! সুতীর্থর মনে হল, এই স্পন্দন স্তব্ধ করে দেওয়াটা শুধু অনৈতিক নয়, নির্মম পৈশাচিক। অন্তরাও এককালে তাই বিশ্বাস করত। তবে এই অনৈতিক কাজটা করার জন্য আজকের অন্তরার মতো উচ্চাভিলাষী ডাক্তারের হাত যে একটুও কাঁপবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত সুতীর্থ। একই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগল, ভ্রূণমুক্তিই যদি এদের পরিকল্পনা হয়, তা হলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে একটু-একটু করে বাড়তে দিচ্ছে কেন?

সুতীর্থর ভিতরটা তালগোল পাকাচ্ছে। অন্তরার গর্ভে পাপানের বেড়ে ওঠার কুড়ি বছরের পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। একটা সময়ের পর ভ্রূণ যখন তার উপস্থিতির কথা, প্রাণের সঞ্চারের কথা গর্ভধারিণীকে জানায়, মাতৃত্বের অনুভূতির জন্ম হয়। মা ব্যাকুল থাকে তার আত্মজ সম্পর্কে। অথচ এই মেয়েটা এতদিনের জমাট বিশ্বাসকে চূর্ণ করে অনায়াসে বলছে, এটাকে আন্টি কয়েকদিনের মধ্যেই মেরে ফেলবে।

"তুমিও কি মেরে ফেলতেই চাও?"

মৃন্ময়ী খাটের এক কোণে এসে বসল। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো সেই প্রথম দিন থেকেই, মানে যেদিন প্রথম জানতে পেরেছিলাম, সেদিন থেকেই এটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। তবে ভুল করেছিলাম। নিজের মতো খোঁজখবর নিয়ে অ্যাবর্শনের ওষুধপত্তর খেয়েছিলাম। কিছুই হয়নি। মাঝখান থেকে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"আর তোমার আন্টি সময় নষ্ট করছে কেন?" তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

"আমার কিছু কমপ্লিকেশন আছে। আন্টি ওষুধপত্তর দিচ্ছে। বলেছে আর দু'সপ্তাহের মধ্যেই কিছু-একটা ডিসিশন নেবে। আচ্ছা আঙ্কল, আপনি কী ধরনের নাটক লিখছেন?"

এই বোকা মেয়েটাকে উত্তরটা দেওয়ার কোনও দায় ছিল না সুতীর্থর। বলল, "যাও, এবার তুমি উপরে যাও।"

মৃন্ময়ী উঠে পড়তে-পড়তে চারদিকে ছড়ানো বইপত্তরগুলো দেখে বলল, "আপনার কাছে কত বই। আমি কি পড়তে পারি? মাঝে-মাঝে আজকাল নেটে এত বোর্ড হয়ে যাই..."

কাফকার বইটার দিকে চোখ পড়ল সুতীর্থর। ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, এই নাও কাফকার বই, পড়ে ফিল করো কাফকা বিশ্বসাহিত্যে কী জিনিস! কিন্তু এই বোকা মেয়েটাকে শেষপর্যন্ত কিছুই বলল না। ঘরের এক কোনায় অবহেলায় স্তূপাকৃতি হয়ে বিক্রির জন্য পড়ে থাকা কিছু পুরনো ম্যাগাজিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওগুলো নিয়ে যাও।"

বুধবার, ২২ জানুয়ারি

রায়চকে গঙ্গাটা অনেকটা চওড়া। ওদিকটায় হলদিয়া। মরা শীতের শিরশিরানি গায়ে মেখে এই সময়টা চুপ করে বসে গঙ্গা দেখতে খুব ভাল লাগছিল অন্তরার। ওপ্রান্তে একটা ধোঁয়াশার পাতলা আস্তরণ। তার মধ্যে হলদিয়ায় আবছা করে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু আলো। গঙ্গার বুক চিরে শান্ত লয়ে একটা স্টিমার এগিয়ে চলেছে সাগরের দিকে। কলকাতায় নাভিশ্বাস তোলা পেশাগত শ্রান্তি, ডেল্টা গাড়োডিয়া

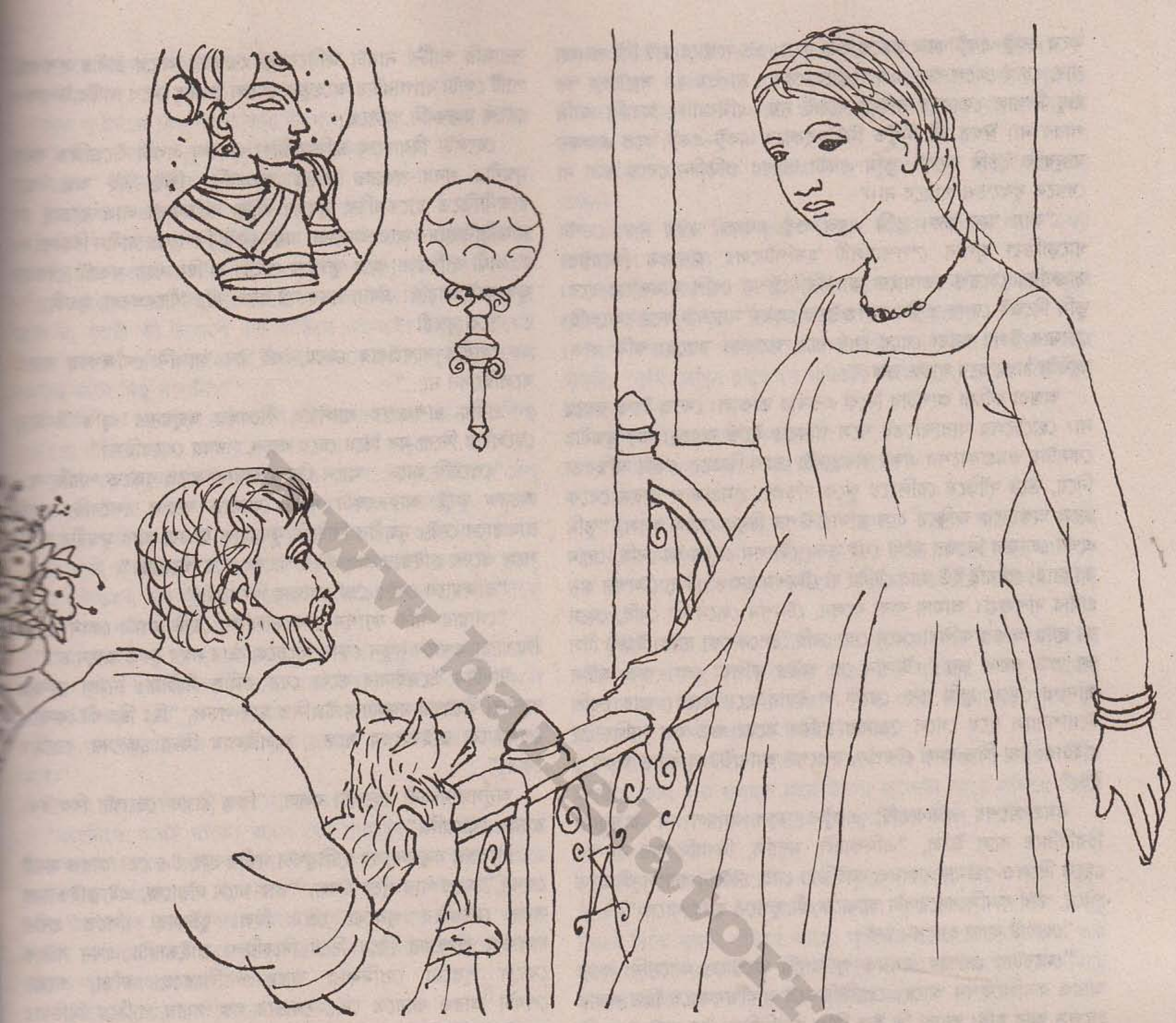

"পিংপং আমার কাছে। দাঁড়াও অন্ধকারে নেমো না। আমি আলো জ্বালছি।"

সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটাল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম, দিনের পর দিন সুতীর্থর মতো অপদার্থ একটা লোককে জীবনে বয়ে নিয়ে চলার ক্লান্তি, সব ধুইয়ে-মুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়াশায় মাখা স্টিমারের প্রপেলারের শান্ত ঢেউগুলো।

হোটেলের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে এলিয়ে বসে শ্রান্তি ঝরাচ্ছিল অন্তরা, তখনই ওমপ্রকাশের মোবাইলে ই-মেলটা আওয়াজ করে আছড়ে পড়ল। ওমপ্রকাশ বলল, "প্যাক আপ ইয়োর ব্যাগেজ ডক। অস্ট্রেলিয়া থেকে ডেল্টা স্পেশ্যালিটি ইকুইপমেন্টের একমাস ট্রেনিংয়ের ডেট্স কনফার্ম করে দিল। তোমার টিমকে রেডি করো। ভিসার জন্য সকলের পাসপোর্ট নিয়ে নাও।

"কবে?" রায়চকের পশ্চিমে গঙ্গার বুকে ডুবন্ত সূর্যের দিকে চেয়ে অন্তরা বলল। সূর্যটা এখন স্তিমিত, তাই চোখ রাখা যায়। যদিও এসময়ে সূর্যের দিকে চোখ রাখাটা চোখের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে, তবুও অদ্ভুত একটা সম্মোহনী শক্তি আছে ওই লাল আলোর বলটার মধ্যে।

ই-মেলটা পড়ে দেখার জন্য ওমপ্রকাশ ব্ল্যাকবেরিটা অন্তরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব টু টোয়েন্টি ফার্স্ট মার্চ।"

অন্তরার মুখটা একটু গম্ভীর হল। মেলটা পড়তে-পড়তে জিজ্ঞেস করল, "ওম, এক মাস আউট অফ স্টেশন হয়ে যাব, বাড়িতে মেয়েটার কী হবে?"

"এত চিন্তা করছ কেন? এখনও একমাসের উপর সময় রয়েছে। তার মধ্যে যা করার করে ফ্যালো।"

"তোমাকে বহুবার বলেছি, কুড়ি সপ্তাহর পর প্রসিডিয়োর করাটা কিন্তু বেআইনি।"

ওমপ্রকাশ একটু বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "আমি বহুবার বলেছি, আইন নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না! যেটা দরকার তুমি শুধু সেটা করো।"

অন্তরা পালটা বিরক্তি দেখিয়ে চুপ করে থাকল। ওমপ্রকাশ অন্তরার কাঁধে হাত রেখে বলল, "দু'-একটা সপ্তাহ ইধার-উধারে কী এসে যায়? জাস্ট ওর ইউটেরাসটাকে ক্লিয়ার করে কিউরেট করে দাও!"

স্টিমারটা চলে গিয়েছে। গঙ্গার জল শান্ত হয়ে গিয়েছে। সূর্য আরও তেজ হারিয়ে ফেলেছে। কীরকম যেন একটা মন খারাপ করা আবহাওয়া। অন্তরার কাঁধে ওমপ্রকাশের আঙুলগুলো চোখে পড়ল। কয়েকটা চুনি পোখরাজ চিকচিক করছে। পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে অন্তরা বলল, "আংটিগুলো তোমাকে কে পরতে বলেছে ওম?"

"বিখ্যাত এক ব্যক্তি। ইট রিয়েলি ওয়ার্কস। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব। দেখবে, তোমারও কোনও প্রবলেম থাকবে না। তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু গিভ হিম ইয়োর রাইট ডেট, টাইম অ্যান্ড প্লেস অফ বার্থ।"

"টাইম অফ বার্থ? সত্যিকারের টাইম অফ বার্থ কবে হয় ওম? মায়ের গর্ভে সাত সপ্তাহে লিভার, লাংস, কিডনি, প্যাংক্রিয়াস সব ফর্ম

করে একটু-একটু কাজ করতে শুরু করে। ১৪ সপ্তাহে হার্ট বিট পাওয়া যায়, চোখ মেলে যায়, ২০ সপ্তাহে ব্রেন... না ওম ২০ সপ্তাহের পর শুধু লিগাল স্কোপের বাইরে বলেই নয়, এথিক্যালি, মরালি আমি পারব না। ঈশ্বর কী নিখুঁত নিষ্ঠাসহকারে একটু-একটু করে একজন মানুষকে তৈরি করেন, তুমি একটা ভ্রূণের প্রতিদিন বেড়ে ওঠা না দেখলে বুঝতেও পারবে না।"

"কাম অন ডক। তুমি এখন শুধু একজন ডক্টর নও। ডেল্টা গাড়োডিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটালের অন্যতম ডিরেক্টর। ডাক্তারির চেয়েও তোমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বেশি সামলাতে হবে। তুমি নিজেই দেখছ প্রবীর দাশগুপ্তকে কেমন ম্যানেজ করে ফেলেছি। তোমার উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। কফি খাও। কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ডক।"

অন্তরা কফির কাপটার দিকে একবার তাকাল। খেতে ইচ্ছে করছে না। হোটেলের বারান্দাতেই বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। তবু মৃন্ময়ীর কেসটায় ওমপ্রকাশের একই অবস্থানটা দেখে ভিতরে একটা অস্থিরতা নিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। ওমপ্রকাশ পিছন থেকে এসে অন্তরাকে জড়িয়ে ধরে মাথার উপর চিবুক রেখে বলল, "তুমি এখন তোমার নিজের মধ্যে নেই ডক। টেনশন লেনে কা নেহি, দেনে কা হ্যায়। হোয়াই ইউ আর টেকিং দ্য টেনশন ডক? পুট দ্য টেনশন অন প্রবীর দাশগুপ্ত। আমার বাবা বলেন, টেনশন লেনে কা নেহি, দেনে কা হ্যায় আওর রুপিয়া দেনে কো নেহি, লেনে কো হ্যায়। ইজ্‌ন্ট দিস আ গুড ওয়ান ডক? টেনশন দো অউর রুপিয়া লো। অত আইন জানতে গেলে তুমি ডক থেকে ল ইয়ার হয়ে যাবে। আর বেশি ইমোশন্যাল হয়ে গেলে তোমার হাবির মতো গুড ফর নাথিং প্লে রাইটার। সো গিভ আপ টেনশন, ফরগেট অ্যাবাউট ল অ্যান্ড জাস্ট ডু ইট।"

ওমপ্রকাশের রসিকতাটা একটুও ভাল লাগল না অন্তরার। চিরবিরিয়ে বলে উঠল, "এথিক্যালি, মরালি, লিগালি সব ব্যাপার ছেড়ে দিলেও তোমার কোনও আইডিয়া নেই, চেষ্টাটা করলে কী হতে পারে, তার কনসিকোয়েন্সটা আমাকে কী ভুগতে হতে পারে!"

"হোয়াট ক্যান হ্যাপেন ডক?

"মেয়েটার প্রেশার এখনও পুরোপুরি কন্ট্রোলে আসেনি। অন্য আরও কমপ্লিকেশন আছে। প্রোসিডিওরে মারাত্মকভাবে ব্লিড করার চান্সেস আর হাই। অ্যান্ড শি ইজ় স্টিল অ্যানিমিক। ইন দ্যাট কেস শি উইল ডাই। সিম্পলি মরে যাবে।"

ওমপ্রকাশ একটু চুপ থাকল। তারপর চওড়া হেসে বলল, "তোমার লাইফটা এত কমপ্লিকেটেড, এত মেসি কেন জানো? বিকজ় ইউ অলওয়েজ় ট্রাই টু ফাইন্ড আউট অল দ্য সলিউশনস ইন ওয়ান ট্র্যাক। তুমি মিসক্যারেজ করিয়ে দেওয়ার কথাটা ভেবে দেখেছ কি? কোনও 'ল' আছে নাকি? ধরো, তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করছ মেয়েটার পেটের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে, অথচ মেয়েটাই পারল না। মিসক্যারেজ হয়ে গেল!"

বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি

নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান আর বক্তৃতা সেরে বীরেশ্বর যখন পার্টি অফিসে ফিরে এল, ছেলেটাও পিছন-পিছন হাজির হল। বীরেশ্বরকে একটু ফাঁকা পেতেই কাছে এসে ছেলেটা বলল, "খবর নিয়েছি বীরেশ্বরদা।"

"কী খবর?" বীরেশ্বর মজুমদার ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছে ছেলেটাকে কী খবর নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল। এই ক'দিন খুব ঝড়ঝাপ্‌টা গিয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল টানা আঠারো ঘণ্টা ঘেরাও থাকার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সোজা হাসপাতালে। বিশেষ একটি খবরের কাগজের ভিতরের পাতায় ছবিসহ চার কলামের খবর হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলোর ব্রেকিং নিউজ়ে এসেছিল খবরটা। দায়টা বর্তেছে পার্টির উপর। কিছু খবরের কাগজ সরাসরি পার্টির নামটা জড়িয়েছে। ভোটের আগে প্রবীর দাশগুপ্ত পার্টি গোটা ব্যাপারটায় অহেতুক ফায়দা তুলছে দেখে পার্টির উপর থেকে কড়কানি আসছে!

ছেলেটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িয়েছিল। এরকম একটা উত্তেজিত সময়ে মৃন্ময়ীর খবরা-খবরের গুরুত্ব কতখানি? কিন্তু এই অল্প বয়সে রাজনীতিতে হাতেখড়ির সুবাদে এটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যে রাজনীতিকদের জাত আলাদা। এরা একটা পিঁপড়ের স্বাধীন বিচরণকে সংগ্রামী হাতিয়ার করে তুলতে পারে। ক'দিন ধরে খবরটা দেওয়ার ফুরসতই পায়নি। এবার সময় নষ্ট করল না, "বীরেশ্বরদা, মৃন্ময়ী..."

"কে মৃন্ময়ী?"

"প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ে, ওই যে আপনি খোঁজখবর করতে বলেছিলেন না..."

প্রবীর দাশগুপ্তর ব্যাপারে বীরেশ্বর মজুমদার স্মৃতি টনটন ছেলেটার দিকে মন দিয়ে চেয়ে বলল, "খবর পেয়েছিস?"

"পেয়েছি মানে... মানে ঠিক কোথায় আছে বুঝতে পারছি না। অনেক কষ্টে আর-একটা খবর জোগাড় করতে পেরেছি। মৃন্ময়ী রাজস্থানে নেই। মৃন্ময়ীর বিলিতি কুত্তাটাও হাওয়া আর মৃন্ময়ীর সঙ্গে ওদের ড্রাইভার রূপকটাও গায়েব হয়ে গিয়েছে।"

"রাজস্থানে নেই? তো কোথায় গিয়েছে?"

"গোয়ায় নাকি ফ্যাশন টেকনোলজির ছোট একটা কোর্স করতে গিয়েছে। ওখানে নতুন ফোন নিয়েছে, তার নম্বর কেউ জানে না।"

টানটান উত্তেজনার মধ্যে যেন কমিক রিলিফ! নির্মল কেশ্যে আনন্দ। বীরেশ্বর মজুমদার উল্লসিত হয়ে পড়ল, "ছিঃ ছিঃ কী কেস! শেষকালে ড্রাইভারের সঙ্গে... বলেছিলাম কিনা তোদের, রেপিং কেস।"

অনুসন্ধানকারী ছেলেটা বলল, "কিন্তু রূপক ছেলেটা বিবাহিত। বছরও ঘোরেনি।"

বীরেশ্বর মজুমদারের হাসিমুখটা গম্ভীর হল, "এ তো আরও জমাট কেচ্ছা," মুখে পান পুরে বলল, "তার মানে দাঁড়াচ্ছে, এই ড্রাইভারের সঙ্গে মেয়েটার পুরনো প্রেম ছিল। ছুটকারা পেতে প্রবীর দাশগুপ্ত রূপকের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। ড্রাইভারটা এখন বউকে ফেলে পুরনো প্রেমিকার কাছে পালিয়েছে। দাঁড়া, গল্পের শেষটা আরও ভাবতে দে... গোয়ার গল্প গয়ায় পাঠিয়ে মিডিয়ার অ্যাটেনশনটা ঘোরাতে হবে।"

বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি

'ঝপ!' গ্রিলের ফাঁক গলে দু'টো খবরের কাগজ বারান্দায় এসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দোতলা থেকে 'ঘেউ ঘেউ' আওয়াজ করতে-করতে সিঁড়ি বেয়ে পিংপং দৌড়ে এসে খবরের কাগজ দু'টো কামড়ে মুখে তুলে নিয়ে হেলেদুলে নিজেকে সামলে, আবার উপরের দিকে ছুট লাগাল।

সুতীর্থ নিজেও খবরের কাগজটা তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পিংপং-এর কাণ্ড দেখে বেশ আশ্চর্য হল। মৃন্ময়ী এই বাড়িতে আছে বেশ কয়েকদিন, কিন্তু আগে কখনও পিংপংকে এরকমভাবে দৌড়ে এসে মুখে করে কাগজ তুলতে দ্যাখেনি ও।

সকালবেলায় টাটকা খবরের কাগজের উপর চোখ না বোলালে সুতীর্থরও একটা অতৃপ্তি লাগে। অন্তরা একটু বেলা পর্যন্তই ঘুমোয়। আর উঠে পড়লেও পারতপক্ষে সুতীর্থ অফিস বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নীচে নেমে আসে না। যদি মৃন্ময়ী নিজে এসে কাগজটা পৌঁছে দিয়ে যায়, তা হলে খবরের কাগজটা অফিস যাওয়ার আগে পড়া হবে, না হলে নয়। খবরের কাগজে চোখ না বোলানোর অতৃপ্তিটা নিয়েই সুতীর্থ বাথরুমে গিয়ে অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে বেরিয়ে টেব্‌লে এসে বসল। যমুনা প্রত্যেকদিনের মতো টেব্‌লে জলখাবার, চা দিতে এলে সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, "কাগজটা উপর থেকে এসেছে?"

"কাগজটা আবার উপরে এখন কে নিয়ে গেল?" যমুনা বিস্মিত

[illegible] চাইল, "দাঁড়ান দেখছি।"

সুতীর্থ বলল, "না থাক।"

যমুনা সুতীর্থকে কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল, একবার সিঁড়ির [illegible] তাকিয়ে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব দাদা?"

"বলো," পাঁউরুটিতে কামড় দিয়ে সুতীর্থ বলল।

"বলছিলাম, ওই মেয়েটা কতদিন থাকবে?"

সুতীর্থ নিশ্চিত যে, যমুনা বিলক্ষণ জানে অন্তরার সঙ্গে সুতীর্থর [illegible] ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। এটাও জানে মৃন্ময়ীকে কে এই [illegible] এনেছে এবং মৃন্ময়ীর শারীরিক অবস্থা কী। শুধু এটা হয়তো [illegible] না মৃন্ময়ী কী উদ্দেশে এই বাড়িতে এসেছে। যমুনার প্রশ্নের [illegible] পালটা প্রশ্ন করে একই উত্তর জানতে চাইল সুতীর্থ, "কেন [illegible] বউদি কিছু বলেনি?"

"বউদি তো বলেছিল কয়েকদিন। চিকিৎসার জন্য এসেছে। কিন্তু [illegible] তো গড়িয়ে গেল। আমার কাজের চাপ তো বাড়ছে।"

সুতীর্থ যমুনার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। আপদে-বিপদে বেশ [illegible] টাকা ধার নিয়েছে অন্তরার কাছে। তথ্যটুকু যমুনাই [illegible] সুতীর্থকে। এই সুযোগটুকু দিয়ে মাইনে বাড়ানোর ক্ষেত্রে [illegible] খুবই কৃপণ। আগে কখনও কৌতূহল হয়নি। আজকে হঠাৎ [illegible] কৌতূহল হল সুতীর্থর। যমুনাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে [illegible] কাজ করতে হচ্ছে বুঝি?"

"তা দাদা একটু হচ্ছে। রোববার ছাড়া তো দুপুরে আপনারা কেউ [illegible] না। দুপুরে রান্নাটা বাড়তি হচ্ছে। তার উপর বাড়িতে কেউ থাকলে [illegible]-সেটা কাজ তো 'না' বলা যায় না। আপনি আর বউদি বেরিয়ে [illegible] পর কুকুরটা তো ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। এখানে-সেখানে নোংরা [illegible]"

"আর মেয়েটা? ও কী করে সারাদিন?"

"এমনিতে ঘরেই থাকে। আগে তো সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে [illegible] থাকত। এখন একটু কমেছে। বই-টই পড়ে, কানে তার লাগিয়ে [illegible] শোনে। খাবার সব বয়ে-বয়ে উপরেই পৌঁছে দিই। বউদি তো [illegible] উপর-নীচ করতে বারণ করে দিয়েছে। কাপড়-জামাটা অবশ্য [illegible] মেশিনে কেচে নেয় অথবা ড্রাইভার ছেলেটাকে দিয়ে বাইরে [illegible] আর আয়রন করতে পাঠায়।"

"ড্রাইভার ছেলেটা কী করে সারাদিন?"

"ওই মেয়েটা টুকিটাকি কাজ দিলে করে। বাকিটা সময় ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে এবং রাতে বাজারের হোটেলে খেতে যায়।"

সাদামাঠা উত্তরগুলো শুনতে-শুনতে সুতীর্থ ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। যমুনা আবার নিজের কথা বলতে থাকল, "ছেলেটা এবার [illegible]টে উঠল দাদা। অঙ্ক-বিজ্ঞানের জন্য মাস্টার লাগবে বলছে, মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিলে সুবিধা হত। সবকাজই তো করে দিচ্ছি [illegible]। কোন কাজই 'না' করি না!"

প্রত্যাশিত উত্তরটা ছিল, আমাকে বলছ কেন? বউদিকে বলো। তার বদলে সুতীর্থ বলে ফেলল, "মাস্টারমশাইয়ের মাইনেটা আমার কাছে আলাদা করে নিয়ে নিয়ো।"

অল্প প্রয়াসে এই প্রাপ্তিটা যমুনাকে এত উৎসাহিত করে ফেলল যে, সুতীর্থর চা শেষ হওয়ার আগেই উপরে ছুটল খবরের কাগজটা নিয়ে আসতে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে নেমে এল পিছন-পিছন মৃন্ময়ীকে নিয়ে। আর এই প্রথম মৃন্ময়ীকে দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল সুতীর্থর। এই সকালেই স্নান সেরে ফেলেছে। ভিজে চুল পাট করে আঁচড়ানো। কাছে আসতেই স্নিগ্ধ একটা গন্ধ নাকে এসে ঠেকল।

হাতের খবরের কাগজ দুটো টেব্‌লের উপর নামিয়ে মৃন্ময়ী অনুতাপের গলায় বলল, "সরি আঙ্কল। আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম। ভুল করে দরজাটা খুলে গিয়েছিলাম। পিংপং ছাড়া পেয়ে কাগজ দু'টো নিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছিল।"

"ঠিক আছে। তবে পিংপংকে ট্রেনিংটা কে দিয়েছে? দিব্যি দেখলাম কাগজগুলো ম্যানেজ করে নিল।"

"কেউ নয়। নিজে-নিজেই শিখেছে। বাড়িতে সকালে কাগজ পড়ার আওয়াজ পেলেই দৌড়ে গিয়ে মুখে করে কাগজটা নিয়ে আসে।"

মৃন্ময়ীকে হঠাৎ করে দেখতে এত পবিত্র লাগছে কেন, বুঝতে পারল না সুতীর্থ। 'বাড়ি' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে চোখে যেন একটা কষ্ট দেখতে পেল!

"বসো। চা খাবে?" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে মৃন্ময়ী বসল, "থ্যাঙ্কস আঙ্কল। আমি একটু আগেই চা খেয়েছি।"

স্বাভাবিক ভদ্রতায় এরপর যেটা জিজ্ঞেস করা উচিত সেটাই মুখে আটকে গেল সুতীর্থর, "তোমার শরীর কেমন আছে?"

প্রশ্নটা করতেই আড়ষ্টতা। নিঃসংকোচে বরং কথা বলতে থাকল মৃন্ময়ী, "তুমি সেদিন রাতে যে নাটকটা লিখেছিলে, সেটার রিহার্সাল কোথায় হয়?"

"এখনও লেখাটাই শেষ হয়নি।"

"রিহার্সাল শুরু হলে এই বাড়িতে হবে?"

"না।"

"ইস! এখানে হলে কী ভাল হত! আন্টির কাছে পারমিশন চাইতাম, যদি আমাকে দেখতে দিত। এখানে আর আমাকে কে চেনে বলো! আসলে বাড়িতে একদম বদ্ধ হয়ে হাঁফিয়ে উঠছি আঙ্কল।"

সুতীর্থ ঘড়ি দেখল। শরীরীভাষায় বুঝিয়ে দিল এবার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মৃন্ময়ী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার অবস্থার জন্য আমিই দায়ী আঙ্কল। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে খুব গ্রেটফুল। তোমরা আমাকে টলারেট করছ।"

সুতীর্থ কিছু বলতে পারল না। মনে হল কথাগুলো বলতে গিয়ে মৃন্ময়ীর চোখ অল্প ছলছল করে উঠল। জুতোটা পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধায় মন দিল। তারপর ছোট্ট করে মৃন্ময়ীকে বলল, "চলি!"

"টা টা আঙ্কল!"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখনও শূন্য বারান্দার দিকে আর ফিরে তাকায় না সুতীর্থ। তবে আজকে মুখটা ঘুরে গেল। বারান্দার একটু ভিতর দিকে মৃন্ময়ী দাঁড়িয়ে আছে। সুতীর্থর সঙ্গে চোখাচুখি হতে অল্প হেসে হাতটা নাড়ল। এই ছবিটা অদ্ভুত একটা ভাললাগার রেশ নিয়ে প্রশান্ত একটা ছাপ বসিয়ে দিল সুতীর্থর মনে।

সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি

মদনের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে তিন অঙ্কের মেটামরফসিসের প্রথম অঙ্কটা শুনেই অসীম রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "সুতীর্থদা, নাটকটা আমাদের করতেই হবে। উফ! কী নামাচ্ছেন আপনি। কবে শেষ করবেন দাদা?"

সুতীর্থ ফাইলটা বন্ধ করে ম্লান হাসল, "শেষ হয়তো আমি করব অসীম। কিন্তু কে দেখবে এই নাটক?"

অসীমের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "কাদের উপর আপনার অভিমান? ওই মলয়দের? ওরা কী বুঝবে কাফকার আর আপনার এই মাধুর্য? জানেন না? মলয়ের চাপে পড়ে নিখিল মুখার্জি এবার কী নাটক অ্যাপ্রুভ করেছে? ওদের উপর রাগ করে আপনি এই মাস্টারপিসটা ফাইলবন্দি করে রাখবেন?"

"দীর্ঘ বারো বছর ধরে অফিসের এই একটা মঞ্চের জন্যই কাজ করেছি। তোমাদের মতো ডেডিকেটেড ছেলেদের পাশে পেয়েছি। কিন্তু সকলকে একদিন জায়গাটা ছেড়ে চলে আসতে হয়। জায়গাটা ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে অসীম! প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম তো! তবে কী জানো? একটা লাভও হয়েছে। কাফকার একটা কোটেশন দিয়েই বলি, 'আই হ্যাভ দ্য ট্রু ফিলিং অফ মাইসেল্‌ফ হোয়েন আয়্যাম আনবিয়ারেবলি আনহ্যাপি'।"

সুতীর্থ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে অসীম হাত দুটো জড়িয়ে ধরল, "না দাদা! এই নাটক আমরা করবই।"

"সেটা কী করে সম্ভব অসীম? বললাম না, আমি ওই একটাই মঞ্চ চিনি। সেই জায়গাটা ছেড়ে আমি চলে এসেছি। লেখাটা লিখছি শুধু ভিতরের একটা তাগিদ থেকে। এতদিনের একটা পুরনো বদ নেশা থেকে। অথবা আনবিয়ারেবলি আনহ্যাপিনেস থেকে। এই সিগারেটটা যেমন ছাড়তে চেয়েও ছাড়তে পারছি না!"

"সিগারেটটা আপনি অন্য-কারওর জন্য নয়, নিজের শরীরের জন্য ছেড়ে দিন। আপনি কিন্তু আজকাল বড্ড বেশি সিগারেট খাচ্ছেন সুতীর্থদা। যাই হোক, সিরিয়াসলি ভাবুন এই নাটকটা কীভাবে মঞ্চে নামবে। চলুন না, আমরা একটা থিয়েটারের দল করি।"

সুতীর্থ আরও উদাস হয়ে বলল, "তুমি তো জানো অসীম, অনেককাল আগে একটা নাটক লিখে ভেবেছিলাম একটা নিজের দল করব। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারিনি। সেদিনের সঙ্গে আজকের কোনও তফাত নেই অসীম।"

"আছে সুতীর্থদা। তখন আপনি অপরিচিত, আনকোরা, নতুন ছিলেন। এতগুলো বছর ধরে একটার পর একটা ভাল নাটক করে আজ কিন্তু অফিস থিয়েটারে আপনার একটা নাম হয়েছে। আপনার দরকার নিজের একটা দলের আর প্রথম শোয়ের জন্য একজন স্পনসরের। নাটকটা দাঁড়িয়ে গেলে আমাদের আর স্পনসরের দরকার হবে না। আমরা কল শো পাব। আমি একটা প্রোডাকশনের খরচা বের করছি। আপনি নাটকটা শেষ করুন।"

বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি

চেম্বারের শেষ পেশেন্ট চলে যাওয়ার পর অন্তরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে প্রবীর দাশগুপ্তকে ফোন করল। প্রবীর দাশগুপ্তর কাছে অন্তরার ফোন পাওয়া মানেই টেনশনের। গম্ভীর গলায় বলল, "বলুন।"

অন্তরা এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, "স্যার, মৃন্ময়ীর ব্যাপারে আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছে।"

"বলুন।"

"স্যার, অ্যাবর্শনটা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।"

প্রবীর দাশগুপ্ত একটু থেমে বলল, "ওমপ্রকাশ আমাকে কিন্তু অন্য-একটা উপায়ের কথা বলেছিল।"

অন্তরা চিরবিরিয়ে উঠল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে বলল, "মিসক্যারেজের কথা বলেছে তো? প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করুন, অ্যাবর্শন হোক বা মিসক্যারেজ... মৃন্ময়ীর রিস্কটা একই রকম।"

প্রবীর দাশগুপ্ত গলাটা ইস্পাত কঠিন করে বলল, "আপনি যদি কাজটা করতে না পারেন দেড়মাস সময় নষ্ট করলেন কেন? আমি আগেই ভাল কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম।"

দাঁতে দাঁত চেপে অপমানটা হজম করেও মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করল অন্তরা। ঠান্ডা মাথায় বলার চেষ্টা করল, "আপনি যে-কোনও ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন স্যার। আমার মনে হয় সকলে একই কথা বলবে।"

"আপনি এখন কী বলতে চাইছেন?"

"বাচ্চাটার জন্ম হওয়া এখন ইনএভিটেব্‌ল স্যার। এরপর আপনার ইচ্ছে, আপনি মৃন্ময়ীকে আমার কাছে রাখবেন, না অন্য-কোথাও নিয়ে যাবেন!"

"মানে?" ভয়ানক রেগে উঠল প্রবীর দাশগুপ্ত, "আপনি ওকে এই অবস্থায় বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চাইছেন?"

"স্যার, আমি আপনাকে আমার দিকটা বললাম। কিছুদিনের জন্য আমাকে অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে..."

"তো... কোনও রেসপন্সিবিলিটি নেই আপনার? অস্ট্রেলিয়া যাব বলে এই অবস্থায় কম্বল ঝেড়ে দিতে চাইছেন? আমিও যদি কম্বল ঝেড়ে দিই, পারবেন আপনাদের হাসপাতালটা চালু করতে? আপনি জানেন আপনাদের হাসপাতালের জন্য আমাকে কী-কী করতে হচ্ছে? আপনি ভাবছেন আপনি অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এলেই আপনাদের হাসপাতালটা চালু হয়ে যাবে... ঠিক আছে, অনেক করেছেন আপনি, এখন যা করার আমিই করব..."

অন্তরা আর-কিছু বলার আগেই অন্যপ্রান্ত থেকে প্রবীর দাশগুপ্ত লাইনটা কেটে দিল। বাইরে থেকে চেম্বার-অ্যাসিস্ট্যান্ট সীমা বেরিয়ে ছুটি হয়ে যাওয়ার আশায় উৎকর্ণ হয়ে অন্তরার ফোনে কথা শুনছিল। অন্তরা চুপ করে যেতেই দরজাটা ঠেলে ঢুকে বলল, "আর-কোনও পেশেন্ট নেই।"

"জানি। আর-কোনও স্লিপ নেই। কিন্তু তোমাকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে," বেশ রেগে বলে উঠল অন্তরা। শুকনো মুখে সীমা বেরিয়ে যেতেই শরীরে সমস্ত রাগ প্রশমিত করতে অন্তরার জেদ চেপে গেল অকারণেই আরও কিছুক্ষণ চেম্বারে থাকতে। খেয়াল হল অনেকদিন পাপানের খোঁজ নেওয়া হয়নি। ফোন করল পাপানকে।

"হাই মম!"

"কেমন আছ?"

"আমি যে বাড়ির বাইরে আছি, তুমি সেটা ভুলেই গিয়েছ মম।"

"সরি রে। হসপিটাল প্রজেক্ট নিয়ে এমন চাপে আছি..."

"আমি জানি মম। আমিও সেমেস্টার নিয়ে খুব চাপে আছি। আদারওয়াইজ় এভরিথিং ইজ় কুল মম।"

"শোন, আমার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ডেট ঠিক হয়ে গিয়েছে। টোয়েন্টি থার্ড সিডনি যাচ্ছি।"

"দ্যাট্‌স গ্রেট মম।"

"জানি না ওখানে কী এক্সক্লুসিভ পাওয়া যায়। বল, তোর জন্য কী নিয়ে আসব?"

"উমম... একটা ক্যাঙারু নিয়ে আসতে পারো মম... হা হা... আই ওয়জ় জোকিং... তুমি শুধু নিজের খেয়াল রেখো।"

কথা বলতে-বলতেই ফোনের মধ্যে একটা বিপ-বিপ আওয়াজ পেল অন্তরা। একটা ইনকামিং কল আসার চেষ্টা করছে। পাপানকে না থামিয়ে অন্তরা বলল, "আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে ডেল্টার লোকেরা নিয়ে যাবে। কিচ্ছু চিন্তা করিস না।"

"বাই দ্য ওয়ে মম, বাবা বলছিল তোমার এক পেশেন্ট নাকি এখন বাড়িতে আছে। ইজ় সি ফাইন নাউ?"

অন্তরা রগটা চিপে আর-একবার চোখ বন্ধ করল। মৃন্ময়ীর ব্যাপারটা পাপানকে কিছু জানায়নি। দেড়মাস হল মৃন্ময়ী বাড়িতে আছে। আজকেই প্রথম পাপান জানতে চাইছে মৃন্ময়ীর কথা এবং পাপানের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা সুতীর্থর কাজ। অন্তরা চাপা গলায় বলল, "ইয়েস, সি ইজ় ফাইন। সরি রে, ওকে তোর ঘরে থাকতে দিতে হয়েছে..."

পাপানের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ অবান্তর কথা বলে লাইনটা কেটেই অন্তরা দেখল মোবাইলে ওমপ্রকাশের তিনটে মিস্‌ড কল। ওমপ্রকাশকে আর কলব্যাক করতে ইচ্ছে করল না। কিন্তু অবধারিতভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওমপ্রকাশের ফোনটা এল, "আর ইউ ক্রেজ়ি ডক? তুমি প্রবীর দাশগুপ্তকে কী বলেছ?"

অন্তরা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, "আমাকে কোনও না কোনওদিন সত্যিটা বলতেই হত ওম। ভুলে যেয়ো না মেয়েটা আমার বাড়িতে আছে। আমি যখন অস্ট্রেলিয়া যাব, বাড়িতে মেয়েটা আর সুতীর্থ থাকবে। হোপফুলি তুমি বুঝতে পারছ..."

"কাম অন ডক! তুমি যখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকবে, মৃন্ময়ীর ব্যাপারটা আমাকে হ্যান্ডল করতে দাও... শোনো আমি একজনের সঙ্গে ডিসকাস করেছি। বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সব ক্লিয়ার..."

"শাট আপ ওম! আমি যতদিন বাইরে থাকব, তুমি ওর শরীর স্পর্শ করবে না। শেষবার সেটা তোমাকে বলে দিলাম। তুমি ভেব না তোমার সঙ্গে আমার একটা এক্সট্রা ম্যারিট্যাল সম্পর্ক আছে বলে মানুষ হিসেবে আমার সব নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছি।"

[illegible], ১২ ফেব্রুয়ারি

[illegible] অফিসটা একেবারে থমথমে। ছেলেরা একেবারে মুখ কালো [illegible] বসে আছে। টেব্‌লের উপর আধডজন কাগজে মোড়া পান। [illegible] খেতেও আজ বিস্বাদ লাগছে বীরেশ্বর মজুমদারের। সব অঙ্ক [illegible] গিয়েছে। প্রবীর দাশগুপ্তর যতগুলো প্রার্থীকে কলেজ [illegible] অনায়াসে হারিয়ে দেওয়া যাবে বলে এই ক'দিন [illegible] টইটুম্বুর ছিল, সেই অঙ্ক মেলেনি। আজকাল কলেজের [illegible]গুলো যেন একটু বেশিই সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। কেরিয়ারটাকে [illegible] উর্ধ্বে রেখে সব অঙ্ক উলটে দিচ্ছে।

[illegible] দাশগুপ্ত সুযোগটা নিয়ে একটা মোক্ষম চাল দিয়েছে। জিতে [illegible] পর, আবির খেলা আর বিজয় উৎসবের মধ্যে ব্যাপক [illegible] বাঁধিয়েছে। মিডিয়ার ক্যামেরাগুলো যথারীতি ছুটে এসেছে [illegible] গোটা পশ্চিমবঙ্গে এটা প্রচার হচ্ছে যে, বীরেশ্বর মজুমদার [illegible]শনে হেরে গন্ডগোল পাকিয়েছে। দলের ছেলেগুলো এক-একটা [illegible] প্রিন্সিপ্যাল ঘেরাও-এর গন্ডগোলটার পর মিডিয়ার একচোখামো [illegible] কোনও শিক্ষা নেয়নি। প্রবীর দাশগুপ্তর গুছিয়ে পাতা ফাঁদে পা [illegible]। যথারীতি বড় ভোটের আগে দ্বিতীয়বার টিভির এই বিরুদ্ধ [illegible]কে মোটেই ভালভাবে দেখছে না শীর্ষস্থানীয় রাজ্য নেতৃত্ব। ২৪ [illegible] মধ্যে অবস্থা সামাল দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

[illegible] ঘোষণার পর গলার শির ফুলিয়ে ছেলেগুলোকে যাচ্ছেতাই [illegible] করেছে বীরেশ্বর মজুমদার, কিন্তু যতক্ষণ না এর শোধটা প্রবীর [illegible]গুপ্তর উপর তুলছে এবং ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে, [illegible] ব্লাড প্রেশারটা কমবে বলে মনে হচ্ছে না!

[illegible]গুনে দৃষ্টি ছেলেগুলোর উপর ঝড়াতে-ঝড়াতে চোখ আটকে [illegible] সেই ছেলেটার উপর। প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়েটার ব্যাপারে যে [illegible]টাকে খোঁজ নিতে বলেছিল। ছেলেটা খোঁজখবর কিছু করেও [illegible]। মুচমুচে একটা কেচ্ছা ছড়িয়ে দেওয়ার গল্পটাও তৈরি হয়েছিল। [illegible] ছিল কেচ্ছাটা রটিয়ে প্রবীর দাশগুপ্তকে একটু প্যাঁচে ফেলে দিয়ে [illegible]কে একটু স্বাদবদলের সন্ধান দেওয়া। তবে এই বাজারে [illegible]টাকে ঠিক খোলস থেকে বের করা যায়নি। এবার করতেই হবে। [illegible] দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাতছানি [illegible] ডাকল বীরেশ্বর মজুমদার।

বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি

প্রবীর দাশগুপ্তর মেজাজটা এখন বেশ ফুরফুরে। বীরেশ্বর মজুমদারকে একের পর এক ইসুতে কোণঠাসা করা যাচ্ছে। এতদিন নাওয়া-খাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না। আজ অনেকদিন পর রাতে মানসীর সঙ্গে খেতে বসল এবং আয়েস করে খাওয়ার মাঝেই লক্ষ করল মানসী কিছুই খাচ্ছে না। থালায় মাত্র দু'টো রুটি। তার প্রথমটার আধখানার পরও যেন খাওয়ার রুচি নেই। বেগুনপোড়া দিয়ে বড় একটা রুটির টুকরো মুখে পুরে প্রবীর দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, "কী হল তোমার? দুটো রুটি? শরীর খারাপ নাকি?"

মানসী গভীর অবসাদে ভুগছে। এতদিন প্রবল ব্যস্ত স্বামীকে একটা কথাও বলেনি। তবে আজ আর পারল না। ঝামড়ে বলে উঠল, "তুমি বাবা না পাষাণ?"

"কোনটা ভাবলে তোমার সুবিধে হয়?" প্রবীর দাশগুপ্ত অম্লান বদনে বলল।

"পাষাণ! পাষাণ!" চিৎকার করে উঠল মানসী।

"আস্তে," গলাটা চড়াল প্রবীর দাশগুপ্ত।

মানসী এবার ভেঙে পড়ল, "মেয়েটাকে দেখতে না দাও, একবার অন্তত কথা বলিয়ে দাও।"

ধীরেসুস্থে রুটির টুকরো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে প্রবীর দাশগুপ্ত বলল, "কুড়ি বছর তোমার উপর ভরসা করেছিলাম, তার কী ফল হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি।"

"ও একটা ভুল করে ফেলেছে, তার জন্য..."

"তার জন্য ভুলের মাসুলটা যদি ও একা দিত, আমি তাও সহ্য করার কথা ভাবতাম। কিন্তু ভুলের মাসুলটা আমি দেব না।"

"তোমার কাছে কি রাজনীতিই সব? মেয়েটা কেউ নয়?"

"তোমার মেয়ে এমন কিছু মহান কাজ করেনি যে, রাজনীতির উর্ধ্বে তাকে রাখতে হবে!"

"তোমার মনে পড়ে না, ও যেদিন জন্মাল, হাসপাতালে ওকে কোলে নিয়ে তুমি কত খুশি হয়েছিলে?"

"খুব মনে পড়ে। পার্টির ছেলেদের দেদার মিষ্টি বিলিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন ভাবিনি, কুড়ি বছর বয়সে ও এমন কাণ্ড করবে যে, মুখটাকে সমাজ থেকে আড়ালে রাখতে হবে! দাও আর-একটা রুটি দাও।"

রুটি দু'টো বের করে প্রবীর দাশগুপ্তর থালায় দিয়ে মানসী বলল, "তুমি পাষাণ হতে পারো, কিন্তু আমি পারি না। আমি তো মা!"

"চুপ করো তুমি।"

মানসীর চোখে জল নেমে এসেছিল। তালু দিয়ে চোখের কোলটা পরিষ্কার করে বলল, "আমি মৃন্ময়ীকে দেখতে চাই।"

"একটা ব্যাপার নিয়ে ভ্যানতারা কোরো না। তোমাকে আগেই বলেছি, পেটের পাপটা মরলে তবেই ওকে দেখতে পাবে।"

মানসীর গলা ধরে এল, "রাজনীতি ছেড়ে একবারের জন্যও বাবা হতে পার না?"

"কীসের বাবা? যে মেয়ে ফুর্তি করে বিয়ের আগে পেটে বাচ্চা এনেছে, তার বাবা?"

মানসী অসহায় হয়ে বলে উঠল, "তুমি কি একবারের জন্যও ওকে ক্ষমা করতে পারো না?"

"ক্ষমা ওকে করেছি বলেই তো এত ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু ওর পেটের পাপটাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না।"

"তোমার মনে নেই, ও যখন প্রথম হাঁটতে শিখল, তখন তুমি সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরলে ও কেমন টলটলে পায়ে দৌড়ে গিয়ে তোমার কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরত?"

"খুব মনে আছে। তবে সেদিন ওর পেটে বাচ্চা ছিল না।"

"একটা পেটের বাচ্চাই কি সব বদলে দিল?"

"হ্যাঁ! সব বদলে দিয়েছে," চিৎকার করে উঠল প্রবীর দাশগুপ্ত, "শালা, দিনে সতেরোটা মিটিং করে এসে বাড়িতে যে দু'টো শান্তি করে রুটি খাব তার যো নেই। মেয়ে পেটে নিয়েছে, মেয়ের গর্বে মায়ের দরদ উথলে পড়ছে।"

শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি

বেশ রাত করেই ওমপ্রকাশ অন্তরাকে ফোন করে উদাস গলায় বলল, "তুমি তো এক মাসের জন্য চললে ডক। আই রিয়েলি ডোন্ট নো, তোমাকে ছাড়া এই একমাস আমি কী করে থাকব!"

"বাজে কথা ছাড়ো ওম। তোমাকে আমি এখনই ফোন করতাম। যে মেয়েটাকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছ, যাওয়ার আগে ওর একটা ইউএসজি করে যেতে চাই।"

"তুমি কি আইন আর ইউএসজির বাইরে কিছু ভাবতে পারো না? তোমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিয়ো। কোনও এমারজেন্সি হলে আমি সামলে নেব। ইউএসজি করার দরকার নেই।"

অন্তরা বিরক্ত হয়ে বলল, "মেয়েটা আমার বাড়িতে আছে। অফিশিয়ালি অ্যান্ড প্র্যাক্টিক্যালি আমার কেয়ারে। অ্যান্ড আই ডোন্ট ইভন হ্যাভ আ প্রপার সোনোগ্রাফি রিপোর্ট। আগেও তুমি করতে দাওনি ওম। তুমি আমার ব্যাপারে একটু বেশিই ইন্টারফেয়ার করছ।"

ওমপ্রকাশ হাসতে থাকল, "তুমি আমাকে একটা কথা বলো ডক, ভারতের জনসংখ্যা একশো কুড়ি কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে কত পারসেন্ট মায়ের পেটে সোনোগ্রাফি হয়েছে?"

"তুমি আজকাল একটু বেশিই বুঝছ ওম।"

"বুঝতে হয় ডক, বুঝতে হয়। যাই হোক, তুমি যখন ব্যাডলি চাইছ, তখন সোনোগ্রাফির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তবে সেটা হবে তোমার বাড়িতে।"

"মানে?"

"মানে একদিন ক্লিনিক থেকে পুরো ইনস্ট্রুমেন্ট সেটআপটা তোমার বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। যা করার করে নিয়ে আবার সেটআপটা ফেরত চলে যাবে।"

"নিজের বুদ্ধির উপর তোমার খুব কনফিডেন্স আছে, তাই না! ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে যাওয়ার হ্যাপাটা ভেবে দেখেছ একবার? তারপর আমার টেকনিশিয়ান ছেলেটার সন্দেহ হবে না?"

"টেকনিশিয়ান লাগবে কেন? তুমি নিজে করতে পারবে না?"

"না, টেকনিশিয়ান লাগবেই।"

"দেন ইট ইজ আ প্রবলেম," ওমপ্রকাশকে চিন্তিত শোনাল, "নো, ইন দিস কেস তোমার নিজের টেকনিশিয়ানকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"মাঝে-মধ্যে আমার কী মনে হচ্ছে জানো, তুমিও প্রবীর দাশগুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জানাজানি হয়ে যাওয়া নিয়ে বড্ড বেশি চিন্তা করছ।"

"চিন্তা করতে হচ্ছে ডক। সেদিন ধাবাতে প্রবীর দাশগুপ্তকে কী কমিট করেছিলাম? যদি কথার খেলাপ হয়ে যায়, গৌরবপুরে আমার হসপিটাল তৈরি করার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। আর সেক্ষেত্রে... আমার বাবা আমার বদলে আমার দাদাকেই বেশি টাকা দেবে। এমনিতেই আমার বড় ভাইয়ার উপর বাবার অগাধ বিশ্বাস। তুমি আমার বাবাকে চেনো না, ডক!"

"চিনি! বাঙালি বউ অ্যাকসেপ্ট করবে না। জাস্ট গালি দিতে ইচ্ছে করছে আমার।"

"গুরুজনদের গালি দেওয়াটা তোমাকে মোটেই মানায় না। তা ছাড়া তোমারও তো স্বপ্ন এক, তুমিও তো বড় হতে চাও! সেক্ষেত্রে আমার বাবা তো তোমার স্বপ্নপূরণেরও চেষ্টা করছে, তাই না?"

রবিবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি

"রূপকদা... রূপকদা..."

রাস্তা থেকে ছেলের নামটা শুনে সরমা শ্যামলীকে বললেন, "দ্যাখো তো বউমা, রূপুর নাম ধরে কে ডাকছে।"

শ্যামলী শাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে গ্রিল ঘেরা বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল একটা অচেনা ছেলে মেয়ানো আলোর ল্যাম্পপোস্টের তলায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সদ্যবিবাহিতাদের সিঁথির সিঁদুরের টানে কিছু একটা বিশেষত্ব থাকে। শ্যামলীকে দেখে ছেলেটার বুঝে নিতে অসুবিধা হল না এই হল রূপকের বউ। ছেলেটা জানতে চাইল, "বউদি, রূপকদা আছে?"

শ্যামলীর মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, "না তো, ও এখন নেই।"

ছেলেটা বলল, "ডিউটি সেরে এখনও ফেরেনি বুঝি? রবিবারও এতক্ষণ ডিউটি! কখন ফিরবে?"

শ্যামলী সতর্ক হল। চাপা গলায় বলল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

ছেলেটা নিজের অভিনয়টুকু করতে থাকল। গলায় উদ্বেগ ঢেলে বলল, "খুউব দরকারি একটা কাজ ছিল। আচ্ছা, রূপকদার মোবাইল নম্বরটা কি বদলে গিয়েছে?"

শ্যামলী কাঠ হল। রূপক সত্যিটা নিজের মাকেও বলে যায়নি। বার-বার বলে দিয়েছে রূপকের নতুন মোবাইল নম্বরটা যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে না দেয়। আর জোরাজুরি করে কেউ জানতে চাইলে যেন বলে, রূপক ভাল কাজ পেয়ে মুম্বই গিয়েছে। তবে ছেলেটা যেভাবে বলছে খুব আর্জেন্ট কাজ ছিল, প্রয়োজনটা জানতে শ্যামলীর প্রাণটা আঁকুপাঁকু করতে থাকল।

ছেলেটা প্রশ্নটা করে জিজ্ঞাসু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলী কোনওরকমে বলল, "না তো, নম্বর বদলায়নি। ওই নম্বরটাই আছে।"

ছেলেটা যেন আরও চিন্তিত হল, "নম্বর পালটায়নি? আমি কাল থেকে ট্রাই করে যাচ্ছি, সমানে বলছে সুইচ্‌ড অফ। রূপকদা কোথায় আছে, বলুন তো?"

"মুম্বইয়ে..." বলতে গিয়ে কথায় আড় এল শ্যামলীর।

"মুম্বইয়ে? নতুন চাকরি বুঝি?"

"এ্যাঁ... হ্যাঁ...হ্যাঁ... ওখানে একটা অফিসে ড্রাইভারির কাজ পেয়েছে।"

"ও তা হলে তো কথাই নেই। আসলে এদিকে একটা চাকরির কথা রূপকদা কথা বলে গিয়েছিল। তারা খোঁজ করছে।"

"কারা?"

"ইউনিক রোলিং মিল। কিন্তু কোথায় এখানকার রোলিং মিল আর কোথায় মুম্বইয়ের চাকরি। এবার হয়তো শাহরুখ খান, আমির খানের গাড়ি চালাবে। যাক গে, রূপকদার সঙ্গে কথা হলে বলবেন, আমি এসেছিলাম।"

শ্যামলী খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল, "আপনার নামটা?"

"উজ্জ্বল চাকলাদার। রূপকদার সঙ্গে কথা হলে বলবেন। উজ্জ্বল চাকলাদার এসেছিল বললেই বুঝতে পারবে। আমি চলি।"

"আপনার ফোন নম্বরটা?"

"রূপকদার কাছে আছে? রূপকদাকে বলবেন... যদিও মুম্বইয়ে কাজ ছেড়ে আসবে না! তবুও যদি মনে করে যে, ইউনিক রোলিং মিলের পাকা কাজটা করবে, আপনাদের কাছে থাকবে, তা হলে যেন আমাকে একটা ফোন করে। আমি তো আর যোগাযোগ করতে পারছি না।"

ছেলেটা সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল এরকম গলায় বলল, "আপনার মোবাইল আছে বউদি? থাকলে আমাকে একটু দিয়ে রাখুন না আপনার নম্বরটা। আরও কোনও খবর থাকলে আপনাকেই বরং ফোন করে জানিয়ে দেব।"

এই ব্যাপারে রূপক কোনও আপত্তি বা সাবধান করে যায়নি। শ্যামলী সরল বিশ্বাসে নিজের ফোন নম্বরটা বলল। ছেলেটা পকেট থেকে একটা সিগারেটের বাক্স বের করে তার উপরে লিখে নিল নম্বরটা। ছেলেটার সাইকেলটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই শ্যামলী একছুটে মোবাইলটা নিয়ে চলে এল চিলেকোঠার ছাদে। একবুক উত্তেজনা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ফোন করল রূপককে, "একটা ছেলে এসেছিল, উজ্জ্বল চাকলাদার।"

রূপক ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিল। কানে ফোনটা নিয়ে নড়েচড়ে উঠল, "কী নাম বললে?"

"উজ্জ্বল চাকলাদার।"

"ঠিক শুনেছ?"

"হ্যাঁ গো ঠিক।"

"কখন এসেছিল?"

"এই তো এখনই। বলল, তোমার রোলিং মিলের চাকরিটা..." শ্যামলী ইতিবৃত্তান্ত শোনাল।

রূপকের তখনও ঘোর কাটেনি বলল, "কীরকম দেখতে বল তো ছেলেটা?"

"রোগা-পাতলা। সাইকেলে এসেছিল।"

রূপক আমতা-আমতা করে বলল, "কপালে কোনও আঁচিল ছিল?"

"আঁচিল? আমাদের বাড়ির সামনে ল্যাম্পপোস্টে আলোটা তো কেমন জানো! অন্ধকারে তাই মুখটা ঠিকমতো দেখতে পাইনি। বলল তোমার কাছে ওর নম্বর আছে। আমারও নম্বর নিল..."

উজ্জ্বল চাকলাদার তো চারমাস আগে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে! শ্যামলীকে কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রূপক।

[illegible], ১৭ ফেব্রুয়ারি

[illegible] হাওয়া খেতে-খেতে ছেলেটা চলে এল বীরেশ্বর মজুমদারের [illegible] অফিসে। গতকাল রূপকের বউটাকে খাসা চমকেছে। আজ [illegible] হেসে বীরেশ্বর মজুমদারকে নৈশ অভিযানের ঘটনাটা [illegible] বলে শ্যামলীর নম্বরটা দিয়ে দিল। বীরেশ্বর মজুমদার [illegible] নম্বর লেখা সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ফোন নম্বরটা [illegible] সার্ভিস প্রোভাইডারের জানতে চাইল। উত্তরটা পেয়ে এক খিলি [illegible] পুরে নিজের মোবাইল থেকে একটা ফোন করল। অন্যপ্রান্তে [illegible] ফোনটা ধরতেই বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "চেনা [illegible]"

অন্যপ্রান্ত বিগলিত হল, "আরে বীরেশ্বরদা! কেমন আছেন?"

"কেমন আর আছি? খোঁজ আর রাখো কোথায়? আগে তাও নিউ [illegible] একটা-আধটা এসএমএস পেতাম। এবার তো সেটাও পেলাম না। তুমি তো ভাই ফোন কোম্পানিতে আছ। তোমার তো ভাই আর [illegible] করতে পয়সা লাগে না!"

"সরি দাদা, আসলে ওই সময়ে সার্ভার এত..."

"হয়েছে। তোমাদের সবসময় এই একটা এক্সকিউজ। তোমার [illegible] অত ঝামেলা পুইয়ে বসিয়ে দিলাম আর তুমি ভুলেই গেলে। [illegible] গপ্পো শোনাচ্ছে। এই হয়! কাজ হয়ে গেলে বীরেশ্বর [illegible]কে সকলেই মেমরি থেকে সরিয়ে দেয়।"

"সরি দাদা।"

"যাক গে, দ্যাখো একটা কাজ যদি করে দিতে পারো। তোমায় [illegible] নম্বর দিচ্ছি। এই নম্বরে ফোনগুলো কোথা থেকে আসছে... [illegible] তোমরা ওসব কীসব টাওয়ার বুঝতে পারো না.... একটু বলো [illegible]"

"কোনও ঝামেলা দাদা?"

"আর বলো কেন? সেই ষোলো বছর বয়স থেকে রাজনীতি [illegible] ঝামেলা সামলাতে সামলাতেই চিতায় উঠব। যার ফোন নম্বর [illegible], শ্যামলী, আমার পার্টির এক মেয়ে, তার পিছনে শালা এক বদ [illegible] পড়েছে। ক'দিন আগে ভ্যালেন্টাইনস ডে গেল না, উত্যক্ত করে [illegible]। পুলিশে এফ আই আর করব। তার আগে তো একটু জানা [illegible] কোথা থেকে ওকে ছেলেটা জ্বালাচ্ছে। আমি দেখলাম তুমি [illegible] আছই, তোমার কাছ থেকেই খোঁজটা শুরু করি।"

"যে জ্বালাচ্ছে তার নম্বরটা সিএলআই-তে পাচ্ছে না মেয়েটা?"

"পাচ্ছে তো। কিন্তু কোথায় যে লিখলাম... তুমি বরং আগে শ্যামলীর নম্বরটা নাও। তারপর দ্যাখো তো শ্যামলীর ফোনে কোন [illegible], কোন অঞ্চল থেকে ফোন আসছে। শ্যামলীর নম্বরটা লেখো [illegible]..." বীরেশ্বর মজুমদার শ্যামলীর নম্বরটা জানাল।

অন্যপ্রান্ত দ্রুত কম্পিউটার দেখল। কয়েকটা কি-বোর্ডে ছোট এন্ট্রি। তারপর জানতে চাইল, "আপনার কোনও ই-মেল আইডি আছে বীরেশ্বরদা?"

"আছে তো একটা। যেটাতে পাবলিক অভাব-অভিযোগ জানায়। তবে ভাই সত্যি কথা কী জান তো, তোমাদের এই আধুনিক কম্পিউটারের ব্যাপার-স্যাপার আমি সেরকম বুঝি না। ওই যেমন তুমি সার্ভার জ্যাম-ট্যাম বললে। আমি বরং একটা ছেলেকে দিচ্ছি। তুমি ওর থেকে ই-মেল নম্বরটা জেনে নাও।"

বীরেশ্বর মজুমদার ফোনটা একটা ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, "দ্যাখ তো কী ই-মেল নম্বর চাইছে।"

ছেলেটা অন্য প্রান্তর সঙ্গে কথা বলে বীরেশ্বর মজুমদারকে মোবাইলটা ফেরত দিতে দিতে বলল, "দাদা, কম্পিউটার আর নেট কানেকশনটা একটু লাগবে। ওরা মেল করে সব ডিটেল পাঠিয়ে দিচ্ছে। শ্রীকুমারের বাড়িতে প্রিন্টার আছে। ঘুরে আসব?"

"যা না, কে বারণ করেছে।"

ছেলেটা একটু পরই তিন পাতার একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে এল। বীরেশ্বর মজুমদার কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে ছেলেটাকে বলল, তুই কাগজটা দেখে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দে। ছুঁড়ি বউটার ফোনে কোথা-কোথা থেকে ফোন আসে?"

পাতা দু'টোয় চোখ বুলিয়ে ছেলেটা বলল, "বেশিরভাগ তো একটাই নম্বর দেখছি বীরেশ্বরদা। সল্টলেক, রাজারহাট অঞ্চলের টাওয়ার থেকে।"

বীরেশ্বর মজুমদার আর-একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সল্টলেকে ঘাপটি মেরে বসে আছে শ্রীমান আর বউ বলছে বম্বে। ঠিক ধরেছি বউ যখন এখনও শ্বশুরবাড়িতে আছে, ফোন আসবেই। মনে হচ্ছে গোয়ার গল্পটা ফালতু। ফোন নম্বরটা ড্রাইভারটার কি না কনফার্ম কর।"

ছেলেটা নম্বরটা নিয়ে কল করল। কিছুক্ষণ পরই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, "হ্যালো!"

"হ্যালো, রূপক বিশ্বাস বলছেন?"

আচমকা প্রশ্নে নিজের পরিচয় গোপন না করতে পেরে রূপক বলল, "হ্যাঁ বলছি।"

"স্যার, আমি ইউরেকা ট্রাভেল্স থেকে বলছি। আমাদের একটা দুর্দান্ত ফরেন ট্রিপের অফার আছে স্যার।"

"আমার দরকার নেই।"

ছেলেটা রূপকের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বলতে থাকল। বীরেশ্বর মজুমদার অন্য ছেলেগুলোকে বলল, "এবার আর তাড়াহুড়ো করব না। প্রবীর দাশগুপ্তকে সবদিক দেখেশুনে গুছিয়ে ভোটের আগে কিস্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেব রাজনীতি কী করে করতে হয়। এটা আপাতত আমার মাথায় থাকতে দে। তবে তার আগে ছোট্ট কাজটা করে নিই।"

বীরেশ্বর মজুমদার ততক্ষণে আবার ফোনে ধরল মোবাইল কোম্পানির অফিসারকে। কৃতজ্ঞতার গলায় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। দেখছি তো একটা নম্বর থেকেই জ্বালাচ্ছে শ্যামলীকে। কী লজ্জা বলো তো! ছেলেটা শ্যামলীর খুড়তুতো ভাই। এই কেস নিয়ে কি পুলিশের কাছে যাওয়া সাজে? এবার বলো তো দেখি, তোমরা কী করে এই নম্বরটা শ্যামলীর ফোনে ব্লক করে দিতে পারো? মেয়েটা বড় অবলা..."

বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ

অফিস থেকে সমমনস্ক কয়েকজনকে আর কিছু বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে অসীম একটা দল করেই ফেলেছে এবং স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে 'রূপান্তর' নাটকটার হাত ধরে একটা পেশাদারি দল করার। এরা সকলে অভিজ্ঞ নয়, অনেকে সুঅভিনেতাও নয়। অথচ এরা ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে সুতীর্থর লেখা নাটকটা। একদিন সকলে মিলে পড়া হয়েছে নাটকটা। কীভাবে পেশাদারি দল হবে, কোথায় প্রথম মঞ্চস্থ হবে, এমনকী কোথায় রিহার্সাল হবে, এসব জটিল সমস্যাকে মাথার একপাশে রেখে সুতীর্থও একটা প্রবল উদ্দীপনা পেয়ে গিয়েছে। নাটকটা যেভাবে পড়া হয়েছিল, সেখানে অসীম অনবদ্য ফুটিয়ে তুলেছিল গ্রেগর সামসার চরিত্রটাকে। সামসার বাবার ভূমিকায় বিমান ঠিকঠাক করছিল। কিন্তু বোনের চরিত্রের জন্য আত্রেয়ী বলে যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল অসীম, সুতীর্থর মনে হয়েছে তাকে নিয়ে সমস্যা হবে। চরিত্রটির মধ্যে যে অমানবিকতা এবং স্বার্থপরতা আছে, সেটা করতে গিয়ে ওভারঅ্যাকটিং করে ফেলছে। কিছু ডায়ালগকে নতুন করে লিখতে হবে।

গোটা নাটকটার একসেট নতুন ফোটোকপি করিয়ে নিয়েছে সুতীর্থ। দু'রাত ধরে লাল পেন দিয়ে কেটে-কেটে আত্রেয়ীর ডায়ালগগুলোকে ঠিকঠাক করার চেষ্টা করছে। তবু কিছুতেই যেন মনের মতো হচ্ছে না। আজও অফিস থেকে ফিরে সন্ধে থেকেই বসে পড়েছে নাটক নিয়ে। হঠাৎ মনে হল দরজার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, মৃন্ময়ী।

"কিছু বলবে?" মৃদু হেসে সুতীর্থ বলল।

"তোমার ম্যাগাজিনগুলো... হাতের কয়েকটা পুরনো ম্যাগাজিন

খাটের এক কোনায় রেখে মৃন্ময়ী বলল, "সরি, অনেকদিন ধরে এগুলো আমার কাছে ছিল।"

ম্যাগাজিনগুলো ফেরত পাওয়ার কোনও ইচ্ছেই ছিল না সুতীর্থর। তবে কানে লাগল মেয়েটার 'অনেকদিন হয়ে গেল' কথাটা। মনে হচ্ছে এই তো চার-পাঁচদিন আগে রাতে মৃন্ময়ী ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা কি তখন সুতীর্থকে 'তুমি' বলে ডাকত? অবশ্য আজকাল কমবয়সিরা গুরুজনদের অক্লেশে 'তুমি' সম্বোধন করে।

মৃন্ময়ীর শরীরটা আরও স্ফীত হয়েছে। একটু দুর্বলও দেখাচ্ছে। সুতীর্থ বলল, "বসো।"

মৃন্ময়ী আগেরদিনের মতোই খাটের কোনায় এসে বসল। তবে মৃন্ময়ীকে বসতে বললেও সুতীর্থ শুরু করার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না। মনে হল বসতে না বললেই বোধ হয় ভাল হত। নাটকের ফোটোকপি করা পাণ্ডুলিপিটা আবার টেনে নিয়ে তাতে চোখ রাখল সুতীর্থ। তবে হাতে খোলা লাল পেনটা নিয়েও কিছুতেই মন বসছে না ওর। মৃন্ময়ীও খেয়াল করল পাণ্ডুলিপির উপর চোখ রেখে সুতীর্থ অন্যমনস্ক। একই লাইনের উপর পেনটা ঘোরাফেরা করছে।

পাণ্ডুলিপির উপর চোখ রেখেই সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, "পিংপং কোথায়? আজকাল আর একদম আওয়াজ পাই না।"

"যমুনাদির সঙ্গে ভীষণ অসভ্যতামি করছিল। আমি তো এখন ওর পিছনে দৌড়তে পারি না। তাই রূপকদাকে দিয়ে আরামবাগে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও চলে যাওয়ার পর বড্ড মন খারাপ করছে। ওর সঙ্গেই তো সারাদিন কথা বলতাম, তাই।"

সুতীর্থ মৃন্ময়ীর একাকিত্বটা বুঝতে পেরেও সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিচু গলায় মৃন্ময়ী বলল, "আন্টি কবে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরবে?"

সুতীর্থ মুখ তুলে বলল, "একজ্যাক্ট তারিখটা আমিও জানি না। কেন?"

মৃন্ময়ী পেটের উপর হাত রেখে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না আন্টি এটাকে নিয়ে কী ভাবছে। তুমি জানো?"

"অনেক ব্যাপারের মতোই তোমার আন্টির সঙ্গে আমার তোমার ব্যাপারেও কোনও কথা হয় না।"

মৃন্ময়ী একটু আহত হল। গলার স্বরটা নামিয়ে নিয়ে বলল, "আসলে আমি আর পারছি না আঙ্কল। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে আন্টি বলে গিয়েছে হয়তো শেষ পর্যন্ত এটাকে আমাকে জন্ম দিতেই হবে। তার মানে এই বাড়িতে মে-জুন মাস পর্যন্ত থাকতে হবে। একটা ঘরে এভাবে নিজেকে বন্দি করে রেখে আর পারছি না।"

"আমি বুঝতে পারছি মৃন্ময়ী।"

"বিশ্বাস করো আঙ্কল, কথা বলার মতো একটাও লোক নেই আমার। দিনের পর দিন কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারাটা যে কী যন্ত্রণা... বাবা আমাকে তোমাদের বাড়ির এই নির্জন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। নির্বাসনে পাঠানোর সময় আমার মোবাইলটাও কেড়ে নিয়েছে। কেন নিয়েছে জানো? যাতে আমি কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না পারি। কথা বলতে না পারি। কথা বললে যদি বাবার পলিটিক্যাল কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যায়। এত বড় নেতা, সামনে ভোট... যদি বাবা ফের এমএলএ হতে না পারে! বাবা জানে আমার প্রেগন্যান্সিটা ক্রিটিক্যাল। তবুও..." চোখ ছলছল করে উঠল মৃন্ময়ীর।

সুতীর্থ এতদিনে জানল মৃন্ময়ী তা হলে কোনও এক বিখ্যাত নেতার মেয়ে। অবশ্য সেরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, মেয়েটা কোনও কেউকেটা পরিবারের। না হলে অন্তরা একে পাপানের ঘরে এনে তুলত না। কিন্তু কে সেই নেতা? আশ্চর্য, সুতীর্থর মনে হচ্ছে লোকটা আর কেউ নয়, গ্রেগর সামসার বাবা, মিস্টার সামসা। যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের সন্তানকে আড়াল-আবডালে রেখে, সে বাঁচল না মরল তোয়াক্কা করে না।

মৃন্ময়ী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সেলফোনটা কেড়ে নিলেও বাবা বোধ হয় ল্যাপটপ-ইন্টারনেটের কথা ভুলে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমি সক্কলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু আমি [illegible] না... আমি ল্যাপটপটা সঙ্গে এনেছিলাম ফার্মভিল খেলে [illegible] কাটানোর জন্য। আস্তে-আস্তে খেলার নেশাটা কেটে গিয়েছে [illegible] আর ভাল লাগে না আঙ্কল। সময় কাটানোর জন্য কিছু একটা [illegible] আমার কাছে ল্যাপটপ আছে, তুমি আমাকে কিছু কাজ দাও না [illegible] তোমার নাটকের কোনও কাজ।"

"এই মুহূর্তে আমার কাছে সত্যিই সেরকম কোনও কাজ [illegible] মৃন্ময়ী। তবে করার মতো কিছু কাজ থাকলে নিশ্চয় তোমাকে [illegible]

শনিবার, ৮ মার্চ

"প্লিজ... প্লিজ... তানিয়া সারেগামাতে সুমনকে কয়েকটা এস[illegible] ভোট দে।"

"পারব না। আমার ব্যালেন্স নেই।"

"এই তো! আমি রিকোয়েস্ট করলাম আর তোর ফোনে [illegible] নেই। রোমি ফাইনালে উঠলে দিতিস না?"

"তখন দেখা যেত। প্লিজ-টিজ বলিস না... অ্যাই শোন [illegible] মাসে সিকিম যাওয়ার একটা প্ল্যান হচ্ছে, যাবি?"

"কে যাচ্ছে?"

"আরে আমাদের হাউসিং থেকে। মা বাবা সকলেই [illegible] কাকিমাকে বল না।"

"তোদের হাউসিং মানে তোর সেই আইআইটি-তে [illegible] জুয়েলদাও। তোকে এসএমএস পাঠাচ্ছে এখনও?"

"ধ্যাত... চল না... চল না... দাঁড়া জুয়েলদার একটা এস[illegible] তোকে ফরওয়ার্ড করছি। যা অসভ্য না..."

"ভোট দিবি না? এবার তো আমাদের প্রথম ভোট।"

"ভোটের পর... যাবি? ...যাবি?... কাকিমাকে পটা না... তুই [illegible] খুব মস্তি হবে... চল না... চল না..."

রবিবার, ৯ মার্চ

সামসা পরিবারে নতুন ভাড়াটে এসেছে। তাদের খুশি করতে [illegible] সামসা বেহালা বাজাচ্ছে। পতঙ্গ গ্রেগর সামসা, আড়ালে লুকিয়ে [illegible] প্রাণাধিক প্রিয় বোনের সঙ্গীত শুনছে। বেহালা বাজানো শেষ হলে [illegible] গ্রেটা একটা সংলাপ বলবে। সংলাপটা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। [illegible] সংলাপটা লেখা আছে, সেটা দীর্ঘ। বেহালার সুরের রেশটা কেটে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করলেই কানে বাজছে ভীষণ করুণ একটা বেহালার সুর। অথচ মনের মতো সংলাপটা কিছুতেই মাথায় আসছে না সুতীর্থর।

অলস রোববারের দুপুরটা এরকমই খুচরো-খুচরো সংলাপ সংশোধন করেছে সুতীর্থ। পরশুর মধ্যে নাটকটা চূড়ান্ত করে অসীমের সঙ্গে বসতে হবে। শনিবার অসীম একটা জায়গা ঠিক করেছে। সেখানে প্রাথমিক মহড়া আর আলোচনা হবে। অসীম নিশ্চিত নাটকটা মঞ্চস্থ করার একটা উপায় হবেই। রোববারের অলস দুপুরে একটা সময় ক্লান্ত হয়ে খাটের উপর ছড়ানো কাগজপত্তরগুলো একপাশে ঠেলে সরিয়ে সুতীর্থ ঘুমিয়ে পড়ল। একটা সময় ঘুমটা ভাঙল দরজার কাছে আবছা একটা ডাক শুনে, "আঙ্কল!"

ধড়ফড়িয়ে উঠে ধাতস্থ হয়ে সুতীর্থ দেখল দরজায় মৃন্ময়ী, হাতে একটা ছোট ট্রে-র উপর চায়ের কাপ। সুতীর্থ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "তুমি কেন?"

"যমুনাদি তো এই বেলায় নেই। আমার সঙ্গে তোমার চা-ও করে নিয়ে এলাম।"

যমুনা রোববারের বিকেলটা ছুটি নিয়েছে। অবশ্য সুতীর্থর জন্য চা, ক্যাসারোলে রাতের খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে। সুতীর্থ অবাক হল। তারপরই মনে হল, এটা হয়তো মৃন্ময়ীর একাকিত্ব কাটাতে আসার একটা চেষ্টা। তাই বলে শরীরের এই অবস্থায় অনভ্যস্ত হাতে

চা করা। সুতীর্থ উঠে গিয়ে মৃন্ময়ীর হাত থেকে চায়ের ট্রে-টা হাতে নিয়ে ভদ্রতার খাতিরে বলল, "তোমার কাপটা কোথায়?"

মৃন্ময়ীর চোখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "নিয়ে আসব আঙ্কল?"

সুতীর্থ মাথা নাড়তেই নিজের চায়ের কাপটা নিয়ে এসে খাটে নিজের পছন্দের কোনায় গিয়ে বসল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বলল, "বাঃ! ভাল বানিয়েছ। তবে তুমি কিন্তু আর চা বানাবে না।"

মৃন্ময়ী হাসল, "থ্যাঙ্কস আঙ্কল," তারপর কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "আমার তোমাকে খুব ডিপেন্ডেব্‌ল মনে হয়।"

"আমাকে? ডিপেন্ডেব্‌ল? কেন?"

"জানি না। এক-একজনের মধ্যে কিছু একটা থাকে, যাতে না চিনেও তাকে ডিপেন্ডব্‌ল মনে হয়। আমি তাই সেদিন তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আন্টি বাচ্চাটাকে নিয়ে কী ভাবছে?"

"আমি সত্যিই জানি না।"

"আসলে কী জানো তো আঙ্কল, যখন এটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম তখন একরকম ছিল। কিন্তু যখন জেনে গিয়েছি এটার জন্ম দিতে হবে, তখন মনে হচ্ছে, তারপর? বাচ্চাটার কী হবে? আন্টি কী ভেবেছে, তুমি যদি জেনে থাক..."

একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে সুতীর্থ বলল, "আমি সত্যি এসবের কিছু জানি না মৃন্ময়ী। তোমাকে শুধু একটা কথাই বলব, আগেও যখন আন্টির উপর ভরসা করেছিলে, এবারও তাই করো..."

পেটের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ী নিচু গলায় বলল, "আস্তে-আস্তে যে মায়া পড়ে যাচ্ছে আঙ্কল। এখন ভাবতেই খুব খারাপ লাগে যে, আমি ফ্লোরাকে মারতে চেয়েছিলাম!"

"ফ্লোরা কে?"

"আমি ওর নাম দিয়েছি।"

"মেয়ে? তোমাকে আন্টি বলে দিয়েছে?"

মৃন্ময়ী ম্লান হেসে মাথা নাড়ল, "না! আন্টি বুঝিয়েছিল ওটা একটা লাম্প। একটা আনসেফ সেক্সের প্রডাক্ট। লাম্পটাকে রিমুভ করা যাচ্ছে না, কারণ আমার লাইফ রিস্ক আছে!"

"তারপর?"

"অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে আন্টি বলল, আনফরচুনেটলি লাম্পটাকে আমাকে আরও কয়েকদিন ক্যারি করতে হবে। কিন্তু কী বলো তো, আমি তো ফ্লোরাকে আর শুধু একটা লাম্প ভাবতে পারছি না। ওর কিক্‌স আমি ফিল করি। ইন্টারনেটে আমি অনেক কিছু পড়েছি আঙ্কল। কী করে অ্যাবর্শন করা হয়, কীসব ক্রুয়েল মেথড তুমি ভাবতেই পারবে না আঙ্কল। ওদের ব্রেন ডেভেলপ করে যায়। কী ভীষণ যে যন্ত্রণা পায় ওরা... একটা আলপিন ফোটালেই আমাদের কত যন্ত্রণা হয়! আর ভাবতে পারো, যার ব্রেন ডেভেলপ করে গিয়েছে তাকে কখনও খুঁচিয়ে... কখনও ব্রেন সাক করে... ভাবতেই পারি না, আমি ফ্লোরাকে এত যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম কী করে!"

"থাক!" সুতীর্থ হাত তুলে মৃন্ময়ীকে থামিয়ে বলল, "এসব নিয়ে এখন আর ভেবো না। এত কষ্ট করার পর তুমি একটা পবিত্র শিশুকে পৃথিবীতে আনতে চাইছ, সেটাই পজ়িটিভলি ভাব।"

মৃন্ময়ী লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি আঙ্কল, আমি না চাইলে ফ্লোরাকে কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। কিন্তু আমি নিজেই যে জানি না, ফ্লোরাকে এই পৃথিবীতে এনে ওর জন্য কী ভবিষ্যৎ রাখব?"

ম্লান হাসল সুতীর্থ, "সেটারও বোধ হয় অনেক উপায় আছে। তুমি তোমার আন্টির সঙ্গে কথা বলো। অনেক অ্যাডপশন এজেন্সি আছে, যারা তোমার ফ্লোরাকে দত্তক নিতে ইচ্ছুক, সেরকম কোনও নিঃসন্তান দম্পতির কাছে তুলে দেবে। ও খুব আদরে থাকবে, যত্নে থাকব। ভালবাসা পাবে। ফুলের মতো বড় হবে।"

"আন্টির সঙ্গে কথা বলিনি কিন্তু এটা নিয়েও আমি ভেবেছি আঙ্কল।"

"আন্টির সঙ্গে কথা বলোনি কেন? ওর নিশ্চয়ই তেমন কোনও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।"

মৃন্ময়ী উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "কী করে আমি আন্টিকে বিশ্বাস করব আঙ্কল? প্রতিদিন আমাকে দু'বেলা ওষুধ খেতে দিয়েছে আন্টি, যাতে আমি সুস্থ হয়ে উঠি এবং সহজে ফ্লোরাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে খুন করতে সুবিধে হয় আন্টির।"

"কিন্তু তোমার আন্টি তো তা করেনি।"

"কী গ্যারিন্টি আছে ফ্লোরাকে আন্টি শেষ পর্যন্ত কোনও এক মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবে? আমার চেয়েও আমার বাবার কথাটা বেশি শুনবে আন্টি। আর বাবা নিজের পলিটিক্যাল কেরিয়ারের জন্য কিছুতেই ফ্লোরাকে বাঁচতে দেবে না। আন্টি যদি জ্যান্ত ফ্লোরাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে চায়, বাবা চাইবে তার আগে যেন ওর গলাটা টিপে শেষ করে দেওয়া হয়!"

সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, "দ্যাখো, তোমার আন্টি কেরিয়ারিস্ট হতে পারে, কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর বোধ হয় না। তা হলে এতদিন অপেক্ষা করত না। তোমার জীবনের পরোয়া না করেই কাজটা করে ফেলত। তোমার আন্টির ভিতরের মানুষটাকে আমি চিনি। তুমি আমার এটুকু কথার উপর ভরসা রাখতে পারো।"

মৃন্ময়ী দু'হাত বাড়িয়ে সুতীর্থর হাতদু'টো ধরে বলল, "আমি তোমাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করি আঙ্কল। তুমি প্লিজ় ফ্লোরার কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

"আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি মৃন্ময়ী?"

"ফ্লোরার জন্য কিছু একটা, যাতে ওর জন্মের পর ওকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে আন্টি কোনও ডাস্টবিনে ছুড়ে না ফেলে দেয়। বিশ্বাস করো আঙ্কল, এই বিষয়ে ডিপেন্ড করার জন্য আর-কেউ নেই। আমি ফ্লোরাকে বাঁচাতে চাই। তুমি আমাকে প্লিজ় হেল্প করো আঙ্কল..."

শনিবার, ১৫ মার্চ

চৈত্র মাস পড়ল। এই মাসে শুভ অনুষ্ঠানের কোনও তারিখ নেই। নামমাত্র পয়সায় পয়লাতেই অসীম ব্যবস্থা করে ফেলেছে জানাশোনা একটা বিয়েবাড়িতে। তিন অঙ্কের 'রূপান্তর' নাটকটা ছোট-ছোট করে প্রথম দুটো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা অভিনয় করতেই তিন ঘণ্টা কেটে গেল। সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিল। আত্রেয়ীকে ফিরতে হবে সেই নৈহাটিতে। আর বেশি রাত করা গেল না। তবে অসীম আর বিমান এরপর সুতীর্থকে নিয়ে পড়ল। নাটকের দলটা পুরো করে ফেলার কাজটা কী করে সেরে ফেলা যায় সেই আলোচনায়।

"কত খরচ হিসেব করে দেখেছ অসীম?"

হিসেবটা অসীমের বুক পকেটেই ছিল। প্রবল উৎসাহে কাগজটা বের করে বলল, "মোটামুটি একটা হিসেব বানিয়েছি দাদা। গ্রেগর সামসার কস্টিউমটাই সবচেয়ে দামি পড়ছে। ভাল কোয়ালিটির প্রায় কুড়ি হাজার পড়ছে।"

"এত?" চোখ বড়-বড় করে বিমান বলল।

"এটাই তো আসল। না হলে স্কুলের নাটকের খরগোশের কস্টিউম হবে।"

"ঠিক আছে, তারপর বলো," সুতীর্থ বিমানকে থামিয়ে দিল।

"মিউজ়িকটা যদি স্টক থেকে না নিয়ে রেকর্ডিং করাই, তা হলে স্টুডিয়ো মিউজ়িশিয়ান ইত্যাদি ধরে তিরিশ মতো, লাইট দশের মতো, সেট পনেরো, পোস্টার..."

চুপ করে অসীমের শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত খরচগুলো মন দিয়ে শুনল সুতীর্থ। তারপর বলল, "সবমিলিয়ে কত হল?"

অসীম একটু ইতস্তত করে বলল, "যদি আমরা সরকারি হল ভাড়ায় পেয়ে যাই, তা হলে এক লাখ আঠাশ।"

বিমান উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "অসম্ভব! একটা নাটক নামাতে এত খরচ হয় নাকি?"

"হয় বিমানদা। একটা প্রফেশন্যাল নাটকের প্রাথমিক খরচ এরকমই আসবে, কারণ আমরা তো কিছু ভাড়া করছি না। রেগুলার শো করব বলে..."

"বুঝতে পারছি। কিন্তু এত টাকা নাটকের জন্য কোথা থেকে জোগাড় হবে?"

অসীম দমল না। নিজের যুক্তি দেখাতে থাকল, "আগে থেকে ধরে নিচ্ছি কেন যে, হবে না! তা হলে তো আমাদের এতদূর এগনোই উচিত হয়নি। আচ্ছা, ধরো কাল যদি দুম করে আমার একটা বাইপাস সার্জারির জন্য এক লাখ আঠাশ হাজার টাকার দরকার হয়, তোমরা জোগাড় করে দিতে পারবে না?"

বিমান সুতীর্থকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে বলল, "দাদা, বোঝাও ছেলেকে।"

সুতীর্থও অসীমকে বোঝানোর চেষ্টা করল, "তোমার আবেগ, নাটকটার জন্য ভালবাসা সব বুঝতে পারছি অসীম। কিন্তু বিমানও প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছে। বাইপাস সার্জারি আর নাটক প্রোডাকশন তো আর এক জিনিস নয়!"

অসীম অল্প দমে বলল, "এই জন্য বলছিলাম, একটা কর্পোরেট স্পনসর দরকার।"

"কে স্পনসর করবে ভাই?"

"দাদা, আপনার বন্ধু আছেন না, অফিসে মাঝে-মধ্যে আসেন... পার্থসারথি সেন... মস্ত মানুষ... হেভি সব কানেকশন... বলুন না একবার..."

সুতীর্থ মাথা ঝাঁকাল, "না ভাই... এভাবে কাউকে বলতে পারব না... কোনওদিন বলিনি..."

অসীম নাছোড়বান্দা, "আরে বাবা, আপনার স্কুলের বন্ধু তো। বলুন না একবার..."

বুধবার, ১৯ মার্চ

বীরেশ্বর মজুমদারের বাড়িতে ছেলেটা সাতসকালে ঘন-ঘন বেল বাজাতে থাকল। কাজের লোক দরজা খুলতেই ছেলেটা বলল, "বীরেশ্বরদাকে ডেকে দাও, খুব দরকারি কথা আছে।"

অন্যদিন হলে বীরেশ্বর মজুমদার খুব বিরক্ত হত। তবে আজ বাসিমুখেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে এল। বীরেশ্বর মজুমদারকে দেখে ছেলেটার উত্তেজনা আরও বাড়ল। চোখ গোলগোল করে বলল, "দাদা, কালকে ওদের লেট নাইট মিটিং ছিল। প্রবীর দাশগুপ্তই দাঁড়াচ্ছে ভোটে।"

খবরটা নতুন নয়। কাল গভীর রাতেই খবরটা পেয়েছে বীরেশ্বর। তারপর থেকেই চোখে ঘুম নেই। একটা জোর গুজব ছিল প্রবীর দাশগুপ্ত সিটিং এমএলএ হলেও ওদের পার্টি এবার প্রার্থী পালটে দিতে পারে! গুজবটা মেলেনি। এদিকে নিজের পার্টির এক শীর্ষস্থানীয় নেতা অমল বড়াল বলেছেন, প্রবীর দাশগুপ্ত ক্যান্ডিডেট হলে শরিক দলকে সিটটা ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ভিতরে-ভিতরে সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে। প্রবীর দাশগুপ্তর সঙ্গে বীরেশ্বর মজুমদারের ইদানীংকালের রেকর্ড একেবারেই ভাল নয়, হয়তো সেই কারণে!

প্রবীর দাশগুপ্তকে ময়দান থেকে সরাতেই হবে। যে তুরুপের তাসটা তৈরি করা আছে, সময় হয়েছে সেটা এবার বের করার। বীরেশ্বর মজুমদার ছেলেটাকে বলল, "সোমনাথকে একবার এখনই আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দে তো।"

শুক্রবার, ২১ মার্চ

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে জুতোমোজা ছাড়তেই সুতীর্থ দেখল, মৃন্ময়ী পাকানো সিঁড়িটা দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামছে। মৃন্ময়ীর শরীরটা এখন যথেষ্ট ভারী। সাবধানে এক পা, এক পা করে ব্যানিস্টার ধরে নামে। সুতীর্থ গলা উঠিয়ে বলল, "তুমি নেমো না, আমি

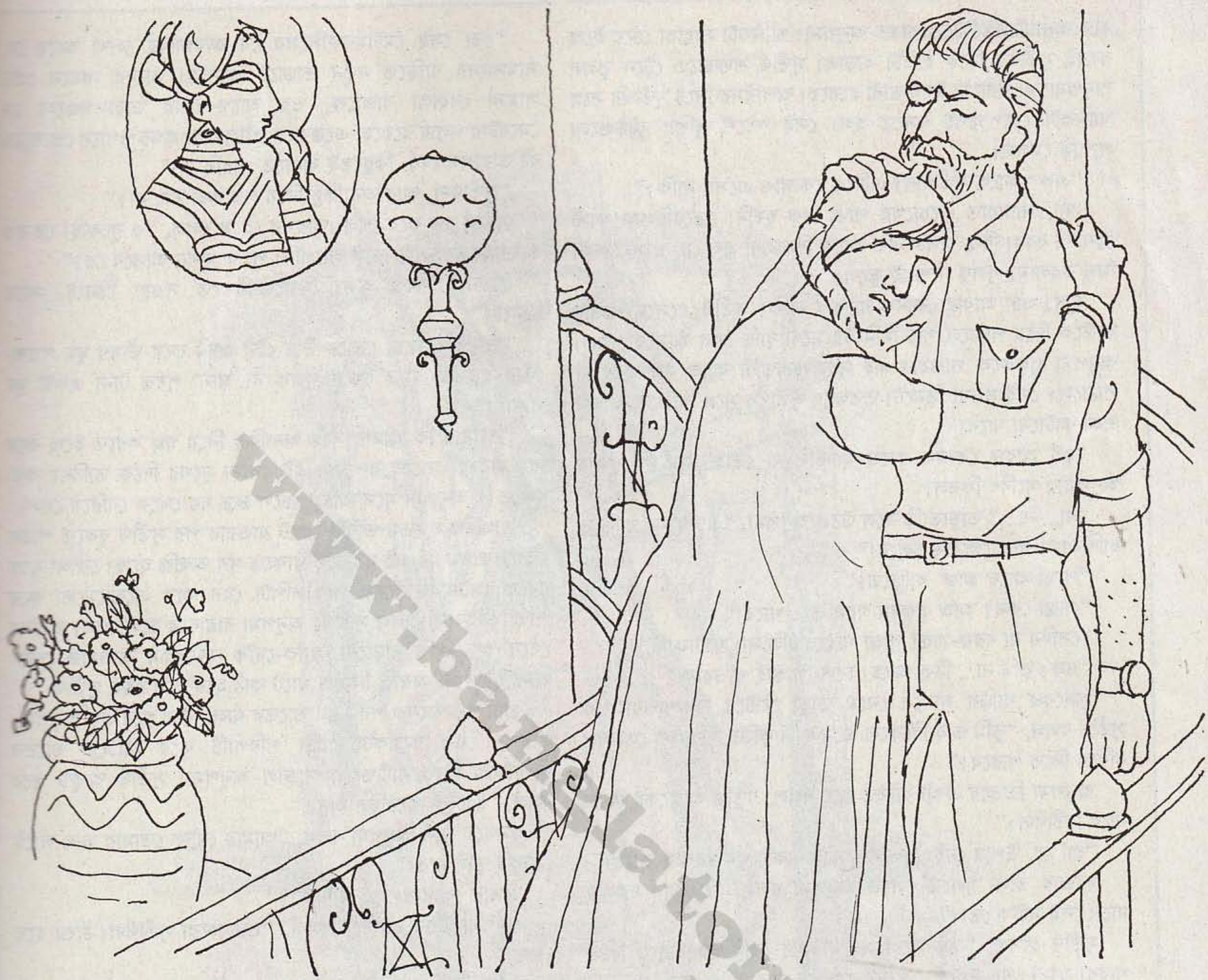

"আমি জানি না, আমি পারব কি না! তবে তোমাকে কথা দিলাম আমি চেষ্টা করে দেখব।"

আসছি।"

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে উঠে এসে সুতীর্থ বলল, "বলো।"

"কালকে আন্টি ফিরে আসছে। এই একমাস অন্তত সারা বাড়িতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পেরেছি, কথা বলতে পেরেছি। তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আঙ্কল।"

সুতীর্থর কীরকম একটা মায়া হল মৃন্ময়ীর চোখটা দেখে। বলল, "এই বাড়ির মধ্যে তুমি তোমার মতো ঘুরলে আশা করি তোমার আন্টি আপত্তি করবে না।"

"তা হয়তো হবে না, কিন্তু আমার অস্বস্তি হবে। প্রথমদিনই তো এখানে থাকার কয়েকটা শর্ত জানিয়ে দিয়েছিল আন্টি!"

একটু থেমে মৃন্ময়ী প্রায় ফিসফিস করে বলল, "তুমি একটু ফ্লোরার ব্যাপারটা মনে রেখো আঙ্কল। যদি কিছু করতে পারো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সুতীর্থ বলল, "জানি না আমি কিছু করতে পারব কি না। তারপর আমি কিছু করতে পারলেও তোমার আন্টি রাজি হবে কি না, সেটাও একটা চিন্তার বিষয়। তারপর ফ্লোরাকে কার কাছে দেব..."

মৃন্ময়ীর চোখদু'টো অল্প জ্বলে উঠল, "ফ্লোরা আমার কাছে, আমার ফ্যামিলির কাছে আনওয়ান্টেড হতে পারে, কিন্তু জন্মের পর ও কি গোটা পৃথিবীর কাছেই আনওয়ান্টেড?"

গ্রেগর সামসার মুখে এই সংলাপটা হতে পারত না? আমি আমার পরিবারের কাছে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছি। কিন্তু পৃথিবীতে একটু ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমার কি কোনও ঠাঁই নেই? সুতীর্থ একটু চুপ থেকে আলতো করে মৃন্ময়ীর হাতটা ধরে নরম গলায় বলল, "আমি জানি না, আমি পারব কি না! তবে তোমাকে কথা দিলাম আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মৃন্ময়ী চুপ করে সুতীর্থর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সুতীর্থর কাঁধে মাথাটা দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সোমবার, ২৪ মার্চ

"অ্যাই অনু..."

এখানকার রিকশায় লাল বেলুনের হর্ন নেই। রিকশাওয়ালার কাছে থাকে ছোট্ট একটা লোহার ডান্ডা। রিকশার হাতলে সেই ডান্ডা পিটিয়ে রিকশাওয়ালা রাস্তার মানুষকে সতর্ক করে সামনের রাস্তা পরিষ্কার করে। অনুপমা ঢ্যাং-ঢ্যাং সেই আওয়াজটা শুনে রাস্তার একপাশে সরে গিয়েছিল। এবার পিছন থেকে নিজের নামটা শুনে চমকে ফিরে রিকশায় সুতীর্থকে দেখে খুব অবাক হল।

"উঠে আয়," সুতীর্থ সিটের একপাশে সরে গিয়ে বসার জায়গা করে বলল। বেলা এগারোটায় অপ্রত্যাশিতভাবে সুতীর্থকে দেখে অনুপমার মনে খুশিগুলো একটা-একটা করে কুঁড়ি ফুটতে থাকল। এগিয়ে এসে রিকশার পাদানিতে পা রাখার ঠিক আগের মুহূর্তে অনুপমার মাথায় একটা অঙ্ক খেলে গেল। সুতীর্থ নিজের বাঁ পাশে অনুপমার বসার জায়গা করেছে। ওখানে বসলে সুতীর্থ মুখ ঘুরিয়ে কথা বলতে গেলেই চোখে পড়বে ঝলসানো ডানদিকের গাল আর গলাটা। রিকশাটাকে বেড় কেটে অন্যদিকে এল অনুপমা। সুতীর্থ আবার সরে গিয়ে অন্যপাশে জায়গা করে দিল। সিটের পাশে হাতলটা

ধরে অনায়াসেই উঠতে পারত অনুপমা। খানিকটা সাহায্য চেয়ে ইচ্ছে করেই সুতীর্থর দিকে হাতটা বাড়াল। সুতীর্থ শক্তহাতে টেনে তুলল অনুপমাকে। শরীরটা ঈষৎ ভারী হয়েছে। অপরিসর সিটে সুতীর্থর সঙ্গে খানিকটা চেপেচুপেই বসতে হল। সেই স্পর্শে খুশির কুঁড়িগুলো পাপড়ি মেলল।

"এত সকালে সুতীর্থদা? এদিকে কোথাও এসেছ নাকি?"

"না, সারারাত দু'চোখের পাতা এক হয়নি। ভেবেছিলাম ফার্স্ট ট্রেনটাই ধরব। কিন্তু বাসটা এত আস্তে শিয়ালদা এল যে, ফার্স্ট ট্রেনটা মিস করলাম। পুলক নিশ্চয়ই স্কুলে?"

স্কুল! ওটা আবার কোনও ব্যাপার নাকি? সুতীর্থ এসেছে খবরটা কাউকে দিয়ে পাঠালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি চলে আসবে পুলক। অনুপমা পুলককে পাওয়ার এই সহজলভ্যতাটা বলল না। খবর না পাঠালে? সেই সওয়া তিনটে। ততক্ষণে সুতীর্থর সঙ্গে বাড়িতে একদম একা কাটানো যাবে।

"তুই আবার কোনও কাজে যাচ্ছিলি না তো?" সুতীর্থর কথায় অনুপমার সংবিৎ ফিরল।

"না... না..." তাড়াতাড়ি বলে উঠল অনুপমা, "একজনের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। পরে গেলেও চলবে।"

"পান্তা আছে আজ বাড়িতে?"

"পান্তা কেন? আজ একদম গরম ভাত খাবে।"

"সেদিন যা বরফ-ঠান্ডা পান্তা খাইয়েছিলি না। ফাটাফাটি..."

"ওফ! তুমি না... ঠিক আছে। চলো পান্তাই খাওয়াব।"

পুলকের বাড়ির সামনে নেমে ভাড়া মিটিয়ে রিকশাওয়ালাকে সুতীর্থ বলল, "তুমি ভাই বিকেলে এসে ছ'টা কুড়ির শিয়ালদা লোকাল ধরিয়ে দিতে পারবে?"

অনুপমা ভিতরে একটু ব্যথিত হয়ে বলল, "তুমি আজকেই ফিরে যাবে সুতীর্থদা?"

"হ্যাঁ রে, উপায় নেই। পুলকের সঙ্গে একটা খুব দরকার আছে।"

দরজার তালা খুলতে-খুলতে অনুপমা বলল, "তোমার দরকার মানে সেই নাটক তো?"

সুতীর্থ হাসল, "ঠিক ধরেছিস। নাটকটা বোধ হয় ধরিয়ে দিতে পারব। ফার্স্ট শো দেখতে তোদের আসতে হবে।"

পুলকের ছোট দু' কামরার বাড়ির ভিতর সেই অর্থে কোনও বসার ঘর নেই। একটা ঘরে পুলক থাকে। অন্যটায় অনুপমা। এই বাড়িতে সুতীর্থর কোনও সংকোচ নেই। নিঃসংকোচে পুলকের খাটের উপর এসে বসল।

অনুপমা কিছুক্ষণের মধ্যে চা করে নিয়ে এসে সুতীর্থর পাশে বসল। জুত করে চায়ে চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বলল, "সমস্যাটা কী হয়েছে জানিস? সেবার ওই যে মেটামরফসিস নাটকটা পুলকের সঙ্গে তৈরি করে নিয়ে গেলাম... গল্পটা তো বলেছিলাম তোকে তখন... মনে আছে?"

ঘাড় হেলাল অনুপমা।

"তো সেই মেটামরফসিসের যে জায়গাটায় লেখা আছে যে সামসাদের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। তাদের সামনে গ্রেটা সামসা বেহালা বাজাচ্ছে, ওর আগে-পরের ডায়ালগগুলো যে মেয়েটার গলায় রয়েছে, এক্কেবারে গোলাচ্ছে। অথচ ওখানে ভেঙেচুরে কী ডায়ালগ দেব, কিছুতেই বানাতে পারছি না।"

"সুতীর্থদা, আর অন্যকিছু নিয়ে গল্প করা যায় না?"

সুতীর্থ চুপ করে গেল। তারপর হেসে বলল, "ও বুঝেছি। তোরও কাফকার নভেলাটা ভাল লাগেনি। পুলক কখন আসবে রে?"

"তিনটে পর্যন্ত স্কুল। ফিরতে-ফিরতে সওয়া তিনটে, সাড়ে তিনটে।"

"ভালই হয়েছে, ভোরে উঠে ট্রেন জার্নি করে ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তোর হাতের অমৃত খেয়ে পুলক না আসা পর্যন্ত টানা একটা ঘুম লাগাই।"

"তোমার কি আমার সঙ্গে অন্যকিছু নিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করে না? অবশ্য করবেই বা কেন এই পোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে?" অনুপমা মুখে আঁচল চেপে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রাথমিক হতভম্ব ভাবটা কেটে যাওয়ার পর সুতীর্থ বুঝতে পারল জীবনে প্রথমবার এই ঘরটাতে থাকতে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। ঝোলা ব্যাগ থেকে মেটামরফসিসের পাণ্ডুলিপিটা বের করে এলোমেলো করে পাতা ওলটাতে লাগল সুতীর্থ। অনুপমা রান্নাঘরে চলে গেল। রান্নাঘর থেকে হাতা-খুন্তি নাড়ানো, ছ্যাঁক-ছোঁক নানারকম আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়েও খাটে কাঠ হয়ে বসে রইল সুতীর্থ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর গরম ভাতের থালা নিয়ে ঘরে এল অনুপমা। তারপর বেশ কয়েকটা বাটি। পরিপাটি করে মাটিতে ভাতের থালাটাকে ঘিরে বাটিগুলো সাজাল অনুপমা। সুতীর্থ অস্ফুট স্বরে বলল, "এত কী করেছিস অনু?"

থমথমে মুখে অনুপমা বলল, "আমার যেটুকু তোমার ভাল লাগে সেটুকুই তুমি নাও।"

"তোর কোথায়? তুই খাবি না?"

অনুপমা উত্তর না দিয়ে বলল, "শুরু করো সুতীর্থদা। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

সুতীর্থ উঠে এসে আসনে বসল। একদৃষ্টে চুপ করে চেয়ে থাকল অল্প-অল্প ভাপ বেরনো সাদা ভাতের দিকে, তারপর গলাটা নামিয়ে বলল, "বিশ্বাস কর অনু, আমার যদি অনেক টাকা থাকত আমি তোর প্লাস্টিক সার্জারিটা করিয়ে দিতাম। আজকাল এত উন্নত..."

"তোমার টাকা থাকলে তুমি আগে দাদার চিকিৎসা করাতে। দাদা তোমাকে নাটক দেবে। আমি তোমায় কী দিতে পারি?"

"তুই আমার কাছে কী চাস অনু?"

"জানি না।"

ভাতটা ভেঙে আঙুল দিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে থাকল সুতীর্থ। নিজেকে কোথাও যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। পুলক আর অনুপমা একটা রাজনৈতিক হিংসার শিকার। পুলকের পরিণতি না হয় মেনে

নেওয়া যায়। সক্রিয় রাজনীতি করত। কিন্তু অনুপমা? ভারতে অসংখ্য নির্দোষ সাধারণ মানুষ যে রাজনৈতিক আক্রোশের ক্ষতচিহ্ন শরীরে বয়ে নিয়ে বেরায়, অনুপমা তাদেরই একজন। অথচ সেই ঘটনার পর কত হইচই না হয়েছিল। পুলিশ-প্রশাসন-মিডিয়া-সরকার-ওজনদার রাজনীতিবিদদের কয়েকদিন আবশ্যিক বিচরণক্ষেত্র ছিল অনুপমার পোড়া গালটা আর মুখে ছিল নিজেদের গালভরা প্রতিশ্রুতি। যথাযথ চিকিৎসা থেকে লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতির আরামপ্রিয় জায়গাটাতেই রয়ে গিয়েছে। নামমাত্র চিকিৎসা ছাড়া আর-কিছুই পায়নি অনুপমা। শক্তিপুরেও আর থাকতে পারেনি। চলে আসতে হয়েছিল গোবিন্দগঞ্জে। সুতীর্থও সেসময় কম চেষ্টা করেনি। খবরের কাগজের কাটিং, জেলা হাসপাতালের কাগজ নিয়ে জুতোর সুখতলা খুইয়েছে। কিছুই করতে পারেনি। উলটে নামী সরকারি হাসপাতালের এক প্রখ্যাত চিকিৎসক জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'সরকারি পয়সায় সুন্দরী করবেন? আপনারা আর কী-কী আশা করেন বলুন তো?'

আশা! ভিতরে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছিল সুতীর্থ। মনে হয়েছিল ক্ষমতা যদি থাকত ডাক্তারটার টুঁটিটা টিপে ধরে অথবা মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে ফাটিয়ে দিতে! হিন্দি ছবির রাগী হিরোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে ইচ্ছে করেছিল।

আশা! হঠাৎ মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ল সুতীর্থর। গতকালের মৃন্ময়ীর কাঁধে মাথা রেখে ঝরঝর করে কান্না। মৃন্ময়ীর শরীর বয়ে সেই প্রথম ফ্লোরার স্পর্শ পেয়েছিল নিজের শরীরে। যে সুতীর্থ একটা সময়ে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারটার মতোই রূঢ় থাকত মৃন্ময়ীর সঙ্গে, সেই খোলসটা কোথায় যেন উবে গিয়েছে। জন্ম দিয়েছে আর-একটা প্রতিশ্রুতির। চেষ্টা করে দেখব।

ভাতটা যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আর-একবারও তাড়া দেয়নি অনুপমা। মনটাকে কোথায় যেন হারিয়ে যন্ত্রের মতো হাতপাখাটা নেড়ে চলেছে। ভাতের উপর ডাল ঢেলে ক্লান্ত আঙুলে ভাত মাখতে থাকল সুতীর্থ।

"জানিস অনু, কারওর কোনও আশাই আমি মেটাতে পারিনি। মা-বাবার আশা, ছেলের আশা, বউয়ের আশা, আমার নাটক ভালবাসা ছেলেদের আশা, তোদের সামান্য-সামান্য আশা। গ্রেগর সামসার মতোই সকলের আশা ভঙ্গ করে একটা কীট হয়ে পালিয়ে-পালিয়ে আড়ালে-আবডালে বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে আছি।"

"আমিও তো পৃথিবীর ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে আছি সুতীর্থদা। পৃথিবীর সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। যে স্কুলে পড়াতাম, সেখানেও আর পড়াতে পারলাম না। ছোট-ছোট বাচ্চাগুলো যারা আমাকে ভালবাসত, সকালে বইখাতার মধ্যে ফুল গুঁজে এনে আমার হাতে দিত, আমার একটু কোল ঘেঁষে আসতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করত, তারা আমার পোড়া মুখটা যখন প্রথম দেখল, কেঁদে উঠল। সেই কান্নার আওয়াজ বড় ভয়ংকর সুতীর্থদা। সেটা দুঃখ বা ব্যথার কান্না নয়, ঘৃণার কান্না," দু'হাতে মুখ ঢাকল অনুপমা।

মাঝপথে ভাত খাওয়াটা থামিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সুতীর্থ। হাতটা ধুয়ে এসে কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, "নিজে হয়তো পারিনি, কিন্তু তবু তোকে কাফকার একটা কথা বলে যাব। ইন দ্য ফাইট বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্য ওয়র্ল্ড, ব্যাক দ্য ওয়র্ল্ড। চলি রে! এখন বড় রাস্তার মোড়ে গেলে স্টেশনে যাওয়ার রিকশা পাব?"

"সে কী? দাদার সঙ্গে দেখা না করেই... তুমি তো বিকেলবেলায় যাবে বলেছিলে..."

মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ

"হ্যালো বীরেশ্বরদা?"

ছেলেটার স্বভাবই হচ্ছে ফোন করেই উত্তেজিত গলায় কথা শুরু করা। তবে মিটিংয়ের উত্তেজনার মধ্যেও ফোনে উত্তেজিত গলাটা শুনে বীরেশ্বরের মুখে একটা প্রশান্তি ফুটল। অভিজ্ঞ কান গলার স্বরে বুঝে যায় ওপ্রান্তের খবরটা কী! মুখের ভিতর পিকটা সামলে বীরেশ্বর বলল, "পেয়ে গিয়েছিস, তাই তো?"

সফল গোয়েন্দার আত্মতৃপ্তির শ্বাস নিয়ে ছেলেটা বলল, "ওফ বীরেশ্বরদা! ব্যাটা একদম ঘাপটি মেরে ছিল। আমি আর অতনু বাইকে চক্কর কেটে কেটে..."

টাওয়ার ধরে এগোলে সল্টলেকের ছোট্ট একটা অঞ্চল। সেখানে একটা ছেলেকে খুঁজে বার করা। ব্যাপারটার মধ্যে তেমন কোনও রোমহর্ষকতা খুঁজে পেল না বীরেশ্বর মজুমদার। আর খুঁজে যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন কীভাবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সে খবরে তত উৎসাহ নেই ওর। তবে একটা ব্যাপারে একটু চিন্তিত হল, "তোকে চিনতে পারেনি তো?"

"না, না বীরেশ্বরদা," ছেলেটা আশ্বস্ত করল, "চিনবে কী করে? আমার তো মাথা ঢাকা কালো হেলমেট ছিল আর অতনু তো লোকাল ছেলে, চেনার প্রশ্নই ওঠে না। তবে বীরেশ্বরদা বাকি খবরটা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। আপনার অনুমান একদম ঠিক, দু'জনে এখন রয়েছে অন্তরা পাল চৌধুরীর বাড়িতে। আরও শুনবেন? ইতিমধ্যেই মৃন্ময়ীর পেট হয়ে গিয়েছে। ওদের বাড়ির কাজের লোকটা মোড়ের একটা পানের দোকানে বলেছে। অতনুর দোকানগুলোয় এত কনট্যাক্ট..."

বীরেশ্বর মজুমদার একটু নড়েচড়ে বসল। রূপকের সঙ্গে প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়েটা যে পালিয়েছে এই আন্দাজটা নির্ভুল ছিল। পালিয়ে যখন গিয়েছে তখন পেট হয়ে যাওয়াটাও স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। ব্যাপারটাতে কেচ্ছা থাকলেও খুব বেশি রাজনৈতিক ফায়দা নেই। তবে কেচ্ছাটাকে অন্য-একটা মাত্রা দিয়ে ফায়দা তুলতে হবে। প্রবীর দাশগুপ্তর সঙ্গে লড়ার জন্য প্রার্থী পদটা পাওয়ার ব্যাপারটা এখনও টালমাটাল। দলের মধ্যে ছোট-ছোট ঢোঁড়াগুলো এবার কেউটে হওয়ার চেষ্টা করছে। সিটটা শরিক দলের ভাগে চলে গেলে ছেলেগুলোর যেন কিছু এসে যায় না! প্রবীর দাশগুপ্তর পরের চালের

আগেই এই চালটা দিতে হবে। দু'মাস ধরে আস্তিনে লুকনো কেচ্ছাটাকে ইসু করার জন্য একটাই তুরুপের তাস আছে, রূপকের বউ। ছেলেটাকে বীরেশ্বর বলল, "খবরটা একদম চেপে থাক, আর তুই আজই ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর।"

মিটিংয়ের মধ্যেই অল্প আনমনা হল বীরেশ্বর মজুমদার। দু'খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে পানের মজাটা উপভোগ করতে-করতে বীরেশ্বর চোখ বন্ধ করে দেখতে পেল সেই চালটা, যাতে প্রবীর দাশগুপ্তর রাজনৈতিক মৃত্যু নিশ্চিত। ওরা পার্টির ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে প্রার্থীপদ বদলে দিচ্ছে।

খালি চায়ের ভাঁড়ে পানের পিক ফেলে বীরেশ্বর চালু মিটিংটা ভেস্তে দিয়ে গোটা চারেক অনুচর নিয়ে নতুন একটা মিটিং শুরু করল। কনুই দুটো টেব্‌লের উপর রেখে ঝুঁকে পড়ে বলল, "অন্তরা পালচৌধুরীর হাসপাতালের কী খবর?"

"ফটাফট কাজ এগোচ্ছে বীরেশ্বরদা। দিনে-রাতে চেহারা পালটে যাচ্ছে।"

"কোনও ফাঁকফোকর নেই?"

ছেলেগুলো এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে বলল, "কেস তো আপনার সঙ্গে সেট্‌ল করা আছে বীরেশ্বরদা। তা ছাড়া হীরেনের গোলা থেকে আপনি চুন-বালি-সুড়কির যে কোটা ঠিক করে দিয়েছেন, সেখানেও এখন পর্যন্ত কোন উনিশ-বিশ করার খবর পাইনি।"

"ওখানে একটা কেস খাড়া কর।"

অনেক ভেবেচিন্তে একটা ছেলে বলল, "একটা কেস আছে বীরেশ্বরদা। বোসপাড়ার কানুজ্যাঠা টেঁসেছে। ওর ছেলেরা বলছিল, মাঝে-মধ্যে হাসপাতালের কাজে এমন দুমদাম আওয়াজ হয় রাতবিরেতে, যে তাতেই নাকি..."

"কানুজ্যাঠা টেঁসেছে, তাই তো?" তুড়ি মেরে বলল বীরেশ্বর মজুমদার। তারপর মুখ গম্ভীর করে বলল, "ভয়ানক অন্যায়। শব্দদূষণে এলাকার মানুষ মারা যাচ্ছে। এর বিহিত দরকার। ভেবেছিস কিছু?"

ছেলেগুলো বুঝতে পারল কূটবুদ্ধি দিয়ে তাল করার তিলটা পেয়ে গিয়েছে বীরেশ্বর মজুমদার।

বুধবার, ২৬ মার্চ

অন্তরা বাড়ি ফিরেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই সময়টা এক করা যাচ্ছে না। সুতীর্থ আজ স্নায়ুগুলো খাড়া করে ছিল কখন অন্তরা বাড়ি ফেরে জানার জন্য। অন্তরা বাড়ি ফেরার পর দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর সুতীর্থ অন্তরাকে মোবাইলে ফোন করল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল অন্তরা।"

একতলা থেকে দোতলায় ফোনটা পেয়ে একটু অবাকই হল অন্তরা। গলাটা ঠান্ডা রেখে বলল, "কী ব্যাপারে?"

"মৃন্ময়ীর ব্যাপারে।"

অন্তরার বিস্ময়ের মাত্রাটা বাড়ল। সেই সঙ্গে আশঙ্কাটাও। বার-বার মনে হয়েছে মৃন্ময়ীকে যেভাবে আড়াল-আবডালে রাখা হয়েছে, সেখানে সুতীর্থ তো একটা নিশ্চিত বিপদ। মাসখানেক বাড়িতে ছিল না। যদিও যমুনাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তবুও সুতীর্থ অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে যমুনার আড়ালে। একটু শঙ্কিত গলায় অন্তরা বলল, "বলো, কী বলবে?"

"আমি উপরে আসব, না তুমি নীচে আসবে?"

অন্তরা দ্রুত চিন্তা করল। দোতলায় নিজের ঘর থেকে প্যাসেজটা পেরিয়ে পাপানের ঘর, যেখানে মৃন্ময়ী আছে। মৃন্ময়ীকে নিয়ে কোনও আলোচনায় সুতীর্থর গলা চড়তেই পারে। তাড়াতাড়ি বলল, "আমি নীচে আসছি।"

নীচে বসার ঘরে সুতীর্থ অপেক্ষা করছিল। একতলার বসার জায়গাটাও নিরাপদ মনে হল না। সুতীর্থকে বলল, "বাইরে যাবে?"

সুতীর্থ আপত্তি করল না। অন্তরা ফিরে ড্রাইভার রাঘববাবুকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। অগত্যা রূপককে বলতে হল গাড়িটা বের করতে। অন্তরাই গন্তব্য ঠিক করল কাছাকাছি একটা কফি শপে। গোটা রাস্তাটায় রূপক গাড়িতে থাকায় একটা কথাও হল না ওদের মধ্যে।

কফি শপে মুখোমুখি বসল সুতীর্থ আর অন্তরা। সুতীর্থ সময় নষ্ট না করে বলল, "মৃন্ময়ীর ডেলিভারিটা কবে হবে?"

"হঠাৎ জানতে চাইছ?"

"বাচ্চাটার কী হবে?"

"জানি না এখনও। আমার পার্টনার ওমপ্রকাশ গাড়োডিয়া ব্যাপারটা দেখছে।"

"তুমি জানতে চাওনি?"

"না। কারণ, একজন যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে ব্যাপারটা দেখছে।"

"দায়িত্বটা যদি আমি নিতে চাই?"

"তুমি? হঠাৎ?" অবাক হয়ে অন্তরা বলে উঠল।

"কারণ, মৃন্ময়ী নিজে আমাকে এই অনুরোধ করেছে। বাচ্চাটা যাতে একটা প্রপার ফ্যামিলিতে প্লেস্‌ড হয়। আর মৃন্ময়ী ওর নিজের বাবার মতো তোমাকেও বিশ্বাস করে না।"

মাথার ভিতরটা দপ করে জ্বলে উঠল অন্তরার। কেটে-কেটে বলল, "বাচ্চাটাকে তো ও নিজেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। বাচ্চাটার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও কে বাঁচিয়ে রেখেছে?"

সুতীর্থ একটু চুপ থেকে বলল, "আমিও মৃন্ময়ীকে ঠিক এই কথাটাই বলেছি। তুমি আর যাই হও, নিষ্ঠুর নও। তোমার-আমার সম্পর্কটা আজ যেখানেই থাকুক না কেন, তোমার ভিতরটা আমি চিনি। মৃন্ময়ী আমার কাছে এই হেল্পটা চেয়েছে। আমি প্রথমে এড়িয়ে গিয়েছিলাম... তারপর আবার বলল... আবার এড়িয়ে গেলাম... তারপর আবার... বলে ফেললাম দেখব, চেষ্টা করে।"

অন্তরা একটু চুপ থেকে বলল, "তুমি যে দায়িত্বটা নেবে বলছ, তারপর কী করবে?"

"জানি না। আসলে দায়িত্বটা পাব কি না সে ব্যাপারেও তো নিশ্চিত নই। আমাদের সম্পর্কটা আমরা জানি অন্তরা। কিন্তু চলো না, একবার ভেবে দেখি মৃন্ময়ীর বাচ্চাটার জন্য আমরা একটা ভাল ভবিষ্যৎ ভাবতে পারি কি না!"

অন্তরা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে বলল, "বেশ। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন থাকবে আর তুমি ক্লিয়ারলি আমাকে বলবে বাচ্চাটাকে কোথায় রাখবে।"

"কবে মৃন্ময়ীর ডেলিভারি হবে?"

"ফার্স্ট উইক অফ জুন।"

বাড়ি ফিরেই অন্তরা ওমপ্রকাশকে ফোন করে বলল, "মৃন্ময়ীর বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর চুপচাপ আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এক জায়গায় কথা বলছি। এরপর প্রবীর দাশগুপ্তকে কী বলবে সেটা তুমি ভেবে নিয়ো।"

"গ্রেট জব ডক। কোথায় ব্যবস্থা করলে?"

"আমার কাছে অনেক এনজিও আসে। তাদেরই একজনকে।"

"কবে যেন বলেছিলে ওর ডেলিভারি?"

"ফার্স্ট উইক অফ জুন।"

"প্রবীর দাশগুপ্তকে এসব বলার অনেক সময় আছে। প্রবীর দাশগুপ্ত তো ঠিকঠাক আছে, বাট নাউ দ্য রিয়েল বাগ ইজ় বীরেশ্বর মজুমদার। গৌরবপুরে এখন বীরেশ্বর মজুমদার একটার পর একটা ইসু খাড়া করছে। ব্যাটারও একটা মেয়ে থাকলে..."

"ওম ফালতু কথা ছাড়ো, এবার কিন্তু সত্যিই মৃন্ময়ীর একটা ইউএসজি করতে হবে।"

"ওফ! ইউএসজি-টা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না। আচ্ছা দাঁড়াও একটা ব্যবস্থা করছি। লাইনে থাকো, একটা কনফারেন্স কল করছি।"

অন্তরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কথোপকথন শুনতে পেল।

"হ্যালো চৌধুরীজি! ওমপ্রকাশ।"

"গুড ইভনিং স্যার, হাউ আর ইউ?"

"জি সব ঠিক হ্যায়... শুনিয়ে জি... গৌরবপুর প্রজেক্টের অর্ডার ফাইনাল করার আগে ইকুইপমেন্টগুলো আমি একবার টেস্ট করতে চাইছি। সো, প্লিজ় আপনার সোনোগ্রাফি ইন্সট্রুমেন্টগুলোর একটা ড. অন্তরা পাল চৌধুরীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন, সঙ্গে একজন টেকনিশিয়ানও পাঠিয়ে দেবেন।"

"হো জায়েগা স্যার। বাস পুনে সে লানে কে লিয়ে জাস্ট গিভ মি টেন ডেজ়।"

বৃহস্পতিবার, ২৭ মার্চ

"আপনি খোঁজ করছিলেন স্যার?" জিএম রণেন গুপ্তর চেম্বারের দরজাটা অল্প ঠেলে নরম গলায় সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

মুখ তুলে সুতীর্থকে দেখে দু' মুহূর্ত চিন্তা করে রণেন গুপ্ত বলে উঠলেন, "ও হ্যাঁ সুতীর্থবাবু, আসুন। বসুন।"

পেপারওয়েট চাপা দেওয়া অনেকগুলো কাগজের মধ্যে থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন বের করে রণেন গুপ্ত বললেন, "কী ব্যাপার সুতীর্থবাবু, আপনি তিন লাখ টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলতে চেয়েছেন? তাও আবার এই ফাইনানশিয়াল ইয়ারের একদম শেষে!"

সুতীর্থ জানত এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হবে। আজকের দিনটার স্বপ্নপূরণ করতে গেলে কত টাকার প্রয়োজন? রূপান্তরের প্রোডাকশন কস্ট... ক্যালকুলেটরে অসীমের দেওয়া সংখ্যাগুলো এক-এক করে টিপেছে... তারপরই মনে হয়েছে স্বপ্নপূরণটা কি শুধুই নিজের? অনুপমার মুখটা ভেসে উঠেছিল... আবার ক্যালকুলেটরের বোতাম টেপা এবং শেষ পর্যন্ত একটা গোটা সংখ্যায় উত্তীর্ণ হওয়া। মৃদু হেসে রণেন গুপ্তকে বলল, "আমি তো কারণটা লিখেছি স্যার, বোনের বিয়ে।"

রণেন গুপ্তও পালটা হাসলেন, "ও তো আপনি আইনের জন্য লিখেছেন। আমরা জানি আপনার কোনও বোন নেই। তাই আসল কারণটা জানতে চাইছি।"

সুতীর্থ একটু চুপ থেকে বলল, "কারণটা খুব ব্যক্তিগত স্যার।"

"জানি, ব্যক্তিগত ব্যাপার জিজ্ঞেস করার এক্তিয়ার আমার নেই। কিন্তু আমরা যেহেতু একটা ফ্যামিলি, তাই একজন সহকর্মী হিসাবে কিছু জিনিস বুঝিয়ে বলার কর্তব্য আমার আছে। আপনি তো জানেন প্রভিডেন্ড ফান্ডের ইন্টারেস্ট কত। এতটা অংশ যদি আপনি এখন তুলে খরচ করে দেন, আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের গ্রোথটা আটকে যাবে। রিটায়ারমেন্টের পর আপনার বাকি জীবনে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিভাবক, সবচেয়ে বড় বন্ধু থাকবে। আপনি যেটা করতে যাচ্ছেন, প্লিজ় সেটা করবেন না। স্বপ্নের চেয়েও নিজের ভবিষ্যতের কথাটা আপনার আগে ভাবা উচিত।"

সুতীর্থ অবাক হয়ে রণেন গুপ্তর দিকে তাকাল। রণেন গুপ্ত কী করে জানল টাকাটা কেন দরকার! অস্ফুট স্বরে বলেই ফেলল, "আপনি কি জানেন, আমি কী করতে যাচ্ছি স্যার?"

রণেন গুপ্ত চেয়ারে পিঠ হেলিয়ে বললেন, "আমি শুনলাম আপনি নাকি অফিস নাটক নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অসীম-বিমানকে নিয়ে নিজের প্রোডাকশন করবেন? আপনি কি মশাই পাগল? প্রভিডেন্ট ফান্ডের তিন লাখ টাকা তুলে কেউ নাটকের দল করে? আপনার নাটকটা না হয় এবার অ্যাপ্রুভ হয়নি। কিন্তু আপনি কার উপর অভিমান করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন? না, আমি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফরওয়ার্ড করব না।"

সুতীর্থ আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিচু গলায় বলল, "আপনি যে এত দরদ দিয়ে ভাবছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন আর পিছিয়ে আসতে পারব না।"

"আপনি কিন্তু ইমোশন্যাল হয়ে বিরাট ভুল করছেন।"

"আমার কিছু করার নেই স্যার। আপনার ধারণার কোনও উত্তর

আমার কাছে নেই।"

রণেন গুপ্ত বোঝানোর চেষ্টা করতে হতোদ্যম হলেন না, "উত্তর নিশ্চয়ই আছে সুতীর্থবাবু। ইমোশন দিয়ে আপনি উত্তরটা চেপে রেখেছেন। আচ্ছা, আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, আপনি এই নাটকটা করে কী পাবেন?"

সুতীর্থ হাসল, অসীমের জেদাজেদিতে স্পনসরশিপ পাওয়ার কথাটা একদিন পার্থর কাছে তুলেছিল। পার্থ খুব উৎসাহ নিয়ে স্কুলের আর-এক বন্ধু অখিলের ফোন নম্বর দিয়েছিল। অখিল এক বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান। ফোন করাতে স্কুলের পুরনো বন্ধুকে পেয়ে অল্প আবেগ দেখালেও সুতীর্থর প্রয়োজনটা জেনে কেমন যেন সুতীর্থ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল অখিল। তবে পার্থর খাতিরে একেবারে ঝেড়ে ফেলে না দিয়ে এক অভিজাত ক্লাবে সুতীর্থকে দেখা করতে বলেছিল। ক্লাবে, পার্থর মতোই অখিলকেও চিনতে পারেনি সুতীর্থ। একজন বেয়ারার সাহায্যে বহু কষ্টে চিনে নিয়ে সুতীর্থ নিজের পরিচয় দিয়েছিল। অখিল হাতটা বাড়িয়ে একটা করমর্দনের পর বার কাউন্টারে নিয়ে এসে বলেছিল, "ও তোর কাজটার ব্যাপারে আসতে বলেছিলাম, তাই না? ভুলেই গিয়েছিলাম। যাকগে শুনছি। আগে বল কী নিবি?"

সুতীর্থ মদ কখনও খায়নি এরকম নয়, তবে শেষ কবে খেয়েছিল মনে নেই। কিন্তু বুঝতে পেরেছিল একটা গেলাস হাতে না নিলে সেই মুহূর্তে সেটাই দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপার হয়ে যেত। একটা পানীয় হাতে নিয়ে খেয়াল করেছিল ওখানকার মানুষরা যেন এক অন্য গ্রহের মানুষ। পৃথিবীর বড়-বড় শহরে ওদের অগাধ বিচরণ। শেয়ার মার্কেট থেকে ক্রিকেট বেটিং, নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক থেকে নর্থ ব্লকের এক-একটা গোপন অলিন্দ ওদের মুখস্থ। মদের গেলাস হাতে অখিল টেকনোক্রেসি আর বুরোক্রেসির দোলচালে ভারতের জাতীয় উন্নয়ন কত শতাংশ কমে যাচ্ছে, সেই নিয়ে গলা ফাটিয়ে নিজের বক্তব্য রাখছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রজেন স্যারের ক্লাসের কথা। ইব্রাহিম লোদিকে হুমায়ুনের বাবা বলে এই ছেলেটা একদিন পুরো পিরিয়ড নিল ডাউন হয়েছিল। এও যেন এক আশ্চর্য রূপান্তর!

সুতীর্থর ক্রমশ মনে হচ্ছিল, এখানে না এলেই ভাল হত। আর কথাটা পাড়েনি। অখিলই একসময় গেলাসের বরফ নাড়তে-নাড়তে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোর ব্যানারের কী নাম?"

"মানে?"

"না মানে, তোর নাটকের দলের কী নাম?"

সুতীর্থ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সত্যিই তো দলের কোনও নামই তো তখনও ফাইনাল হয়নি। অথচ যদি দলের নামই না বলতে পারে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখায়। সেই মুহূর্তেই মাথায় হঠাৎ একটা নাম খেলে গিয়েছিল, "ফ্লোরা।"

"ফ্লোরা! বেশ বিদেশি একটা নাম রেখেছিস তো। তবে নামটা কাগজে ঠিক ফলো করিনি। ইনফ্যাক্ট নাটক তো দেখিই না।"

"আসলে এটাই আমাদের প্রথম প্রোডাকশন। নাটকটা করছি কাফকার মেটামরফসিস..."

"এনি ওয়ে, দাঁড়া আমি রাঘবনের সঙ্গে একটু 'হাই' করে আসি।"

কিছুক্ষণ পর আবার সুতীর্থর মুখোমুখি পড়ে অখিল জিজ্ঞেস করেছিল, "তা হলে ইউ আর হ্যাপি উইথ ইয়োর ফ্লোরা?"

"মানে?"

"মানে দ্যাখ, আমরা সক্কলে শক্তিপুরে ছিলাম। হিসেব করলে দেখবি নাইনটি পার্সেন্ট ছেলে এখনও আছে। সেই হয়তো চাষ করে, বাবার দোকান চালায় অথবা ছোটখাটো কোনও কাজ। কিন্তু পার্থ, বিপ্লব, আমার মতো যে-ক'জন এখানে চলে আসতে পেরেছি, উই হ্যাভ রিডিফাইন্ড আওয়ার লাইফ। অ্যাজ় আ ফ্রেন্ড, তোকে একটা বুদ্ধি দেব? ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়োর ব্রেদ আফটার থিয়েটার। এই লাইনে যদি থাকতেই হয়, সিনেমা ডিরেক্ট কর। টাচ দ্য স্টারডম। এনি ওয়ে, কত টাকা লাগবে তোর?"

"এক বছরে দু'লাখ মতো।"

অখিল অদ্ভুতভাবে মাথাটা হেলিয়ে বলেছিল, "অ্যায়াম সরি, অ্যাট দিস মোমেন্ট আই থিংক, দিস অ্যামাউন্ট ইজ় নট পসিব্‌ল। তোরা ঠিক বুঝবি না, আফটার দ্য সাবপ্রাইম, বহুত কুছ চেঞ্জ হো গয়া। কর্পোরেটের টাকা ওভাবে বের করা যায় না। সবকিছুর একটা রিটার্ন দেখাতে হয়।"

সুতীর্থ নিজের মন ততক্ষণে ঠিক করে নিয়েছিল। গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলল, "চলি রে!"

"ডিনার করে যা। ভাল ডিনার আছে..."

"পরে কোনও একদিন। একটা কাজ আছে..."

অখিল কাঁধটা ঝাঁকাল, "অ্যাজ় ইউ উইশ।"

সুতীর্থ দরজার কাছাকাছি পৌঁছে আবার অখিলের গলা পেয়েছিল। জড়ানো গলায় চিৎকার করছে, 'টেকনোক্র্যাট্‌স আর টলারেবল, ব্যুরোক্র্যাট্‌স আর অলসো টলারেবল অ্যান্ড ম্যানেজেবল বাট হিপোক্রিট্‌স আর ইনকরিজেবল। শালাদের ফুটো কড়ি নেই, অন্যের পয়সায় স্টেজে উঠে আঁতলামির ডায়ালগ দেবে। কাফকা কপচাবে শালা..."

রণেন গুপ্ত প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এই নাটকটা করে কী পাবেন? সুতীর্থ আনমনা ভাবটা কাটিয়ে ম্লান হাসল, "গতবছর দু'জন বাঙালি বহু কষ্ট করে টাকাকড়ি জোগাড় করে এভারেস্ট জয় করে যা পেয়েছিলেন, তাই স্যার।"

রণেন গুপ্ত এবার খেপে গেলেন, "উফ! আপনারা এই ক্রিয়েটিভ লোকরা এত ইমপ্র্যাকটিক্যাল। শুনুন মশাই, যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমিও নাটক দেখতাম। রবীন্দ্রসদনে একবার শম্ভু মিত্রর 'দশচক্র' হয়েছিল। ভোর চারটে থেকে লাইন দিয়েছিলাম। আর কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমিতে একটা নতুন দলের নাটক দেখতে গিয়েছিলাম, তিন রো লোকও ভর্তি হয়নি। আপনি কী মনে করেন, ওই তিন রো লোকের টিকিটের পয়সায় আপনার রিটার্নটা আপনি

ফেরত পাবেন...”

“এভারেস্ট কোনও টাকা রিটার্ন দেয় না স্যার,” সুতীর্থ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিনয়ী গলায় বলল, “আমি কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশনটা উইথড্র করলাম না স্যার।”

সুতীর্থ নিজের সিটে এসে ক্লান্ত হয়ে চুলের মধ্যে হাত চালাল। নিজের টাকা থাকতে নাটকটা মঞ্চস্থ করার জন্য ভিক্ষা? কখনও না, রণেন গুপ্ত যদি অ্যাপ্লিকেশনটা ফরওয়ার্ড না করে তা হলে চাকরিটাই ছেড়ে দেবে। চাকরি ছেড়ে দিলে প্রভিডেন্ট ফান্ড পাওয়াটা আর কোথায় আটকাবে? টাকার জন্য আর কারও কাছে যাবে না। মানুষের কাছে চাওয়ার আরও অনেক জিনিস আছে।

শুক্রবার, ২৮ মার্চ

“আয়! আয়!” পার্থ উচ্ছ্বসিত হয়ে সুতীর্থকে নিজের চেম্বারের ভিতরে ডাকল, “যাক তুই যে নিজে থেকে অফিসে এলি, আমি খুব খুশি।”

“আমি তোর বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না,” অল্প কুণ্ঠিত হয়ে সুতীর্থ বলল।

“সেটা তোর ইচ্ছে। আমার কিন্তু ইচ্ছে হল, যতক্ষণ পারি তোর সময় নষ্ট করব। ভালই হল, তুই এসেছিস। তোকে এমনিতেই দু’-একদিনের মধ্যে ফোন করতাম। ক’দিন ধরে ভীষণ ইচ্ছে করছে ভগবতী বয়েজ স্কুলের বিল্ডিংটা একবার দেখে আসি। চল না একটা সানডে সকাল-সকাল ঘুরে আসি।”

“তোর কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম।”

“ওহ ইয়েস। ভুলেই গিয়েছিলাম। থিয়েটার। অখিলের কাছে গিয়েছিলি?”

“গিয়েছিলাম। এটা নিয়ে তুই আর চিন্তা করিস না। টাকার ব্যবস্থা অন্যভাবে হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় যে শো-টা হবে দেখতে আসিস।”

“নিশ্চয়ই আসব। টিকিট কেটে আসব। বল চা খাবি না কফি?”

“তোর কাছে একটা অন্য-কাজে এসেছিলাম।”

“বল,” টেব্‌লের উপর ঝুঁকে পড়ে পার্থ বলল।

সুতীর্থ গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, “তোর জানাশোনা কোনও অরফ্যান অ্যাডপশন এজেন্সি আছে?”

“কার জন্য?” পার্থ চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করল।

সুতীর্থ দম নিল। কীভাবে গুছিয়ে বলবে ভাবতে থাকল। তারপর খুব সংক্ষেপে শুরু করল, “আসলে একটা মেয়ে, আনম্যারেড, কনসিভ করে ফেলেছে। জুন মাসে ডেলিভারি। বাচ্চাটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসার চেয়ে একটা বেটার অপশন...”

পার্থর চোখ আবার গোল হয়ে গেল, “কেলেঙ্কারিটা তুই বাঁধিয়েছিস নাকি?”

সুতীর্থ হাসল। গতকাল অনুপমা মুখ ফুটে একই প্রশ্নটা করার আগে চেপে গিয়েছিল। তবে চোখের ভাষায় এই একই প্রশ্নটা ছিল। সুতীর্থ পরশু রাতে অসীমের সঙ্গে রিহার্সাল করার পর কথা ছিল সেট ডিজাইনারের কাছে যাবে। কিন্তু সুতীর্থ তার বদলে পৌঁছে গিয়েছিল শিয়ালদা। সেই গভীর রাতের ট্রেন। ভাঙাচোরা রাস্তায় রিকশা, মাঝরাতে পুলকের বাড়ি।

অনুপমা সেদিন আর আশ্চর্য হয়নি। প্রথমত, রাতদুপুরে ওদের বাড়ি সুতীর্থ আগে এসেছে এবং শেষ যেবার ভরদুপুরে এসে হঠাৎ করেই সুতীর্থ চলে গিয়েছিল, অনুপমার স্থির বিশ্বাস ছিল সুতীর্থ আবার ফিরে আসবেই। তবে সেই হঠাৎ করে চলে যাওয়ার পিছনে অনুপমার নিজস্ব একটা দায়ের অস্বস্তি জড়িয়ে ছিল। সুতীর্থকেও কীরকম একটা অন্যমনস্ক দেখেছিল অনুপমা। পান্তা খাওয়ার বায়না আর করেনি।

পুলকের বিছানায় বসে সুতীর্থ বলেছিল, “তিনটে ব্যাপার নিয়ে এসেছি।”

পুলক হেসে উঠেছিল, “সেবার মাঝরাতে এসেছিলি দুটো খবর নিয়ে। কাফকা আর পার্থ। এবার তা হলে খবরটা ব্যাপার হয়ে একটা বেড়েছে।”

সুতীর্থ প্রথম দুটো ব্যাপার একে-একে বলেছিল, “মেটামরফসিস এবার হচ্ছে। আর কারওর মুখ চেয়ে বা দয়ায় নয়। একদম নিজের মতো করে। আমার নিজের প্রোডাকশন, ফ্লোরা।”

“তোর নিজের প্রোডাকশন মানে? পয়সাকড়ি তুই-ই ঢালছিস?”

“ধরতে পারিস তাই।”

“এতটা খরচ... তুলতে পারবি... ধার করিসনি তো? ডুবে যেতে পারিস কিন্তু!” পুলক খানিকটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

“ডুবে থাকা মানুষের আর ডুবে যাওয়ার ভয় থাকে না। তার আগে আমার আরও দুটো কাজ আছে। অনুর অপারেশনটা এবার করিয়ে নেব। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। এপ্রিলের থার্ড উইকে প্রথম ডেট পেয়েছি।”

দু’নম্বর ব্যাপারটা শুনে পুলকের সঙ্গে-সঙ্গে এবার অনুপমারও চমকে ওঠার পালা। অনুপমা এতক্ষণ ভাবছিল পাশের ঘরে গিয়ে পোড়া গালের উপর প্রসাধন নেবে কি না। সুতীর্থর কথাটা কানে যেতে শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা এল। প্লাস্টিক সার্জারি করার অঙ্কটা লাখ টাকার বেশি এবং সেই টাকাটা যে কোনওদিনই জোগাড় হওয়ার নয়, এক-একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে সেটা অনুভব করেছে অনুপমা। ছুটে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল সে।

“তুই কি কোনও লটারি পেয়েছিস?” অনুপমার কাছে পুলকের প্রশ্নটা মনে হল অনেক দূর থেকে ভেসে এল। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। সুতীর্থ যেন শুনেও শুনতে পায়নি সেই কান্না।

“অনু। অনু,” পুলকের ডাকেই আবার সংবিৎ ফিরেছিল অনুপমার। ফোলা চোখের কোলের জল মুছে চুপ করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখেছিল পুলক আর সুতীর্থ দু’জনেই খুব গম্ভীর থমথমে।

“শোন, সুতীর্থ কী বলছে?” প্রায় ফিসফিস করে পুলক বলেছিল।

সুতীর্থ তিননম্বর ব্যাপারটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল, “শোন অনু, জন্মাতে চলা একটা বাচ্চার অদ্ভুত একটা দায়িত্বে পড়েছি। মানে নৈতিক দায়িত্ব বলতে পারিস। মেয়েটা অল্পবয়সি। বিয়ে হয়নি, মা হয়ে পড়েছে। বাচ্চাটা জন্মানোর পর যতদিন না কোনও ভাল হোমে বা দত্তকের ব্যবস্থা করতে পারছি, যদি একটু তোর কাছে রাখতে পারিস!”

তখনই অনুপমার চোখে সেই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা, ‘বাচ্চাটার বাবা কে? তুমি সুতীর্থদা?’

পার্থ একটা কাচের পেপারওয়েট টেব্‌লের উপর লাট্টুর মতো ঘোরাল। মন দিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, “মেয়েটা কোথায় থাকে?”

“আপাতত আমার বাড়িতে।”

পার্থর কাছে সমস্যাটা আরও জটিল মনে হল। বাচ্চাটা যদি সুতীর্থর জারজ হয় তা হলে বাচ্চাটার মা কীভাবে সুতীর্থর বউয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে আছে? প্রশ্নগুলোর গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করল না পার্থ। বলল, “এখনই আমার তেমন কোনও অ্যাডপশন এজেন্সির কথা মনে পড়ছে না রে। তবে আমার একজনের কথা মনে পড়ছে। আমি কথা বলে তোকে জানাচ্ছি।”

“তোকে শুধু একটাই অনুরোধ। তুই রণেন গুপ্ত বা অন্য কাউকে কিছু বলিস না।”

“অবশ্যই না।”

সুতীর্থ উঠে পড়ল। পার্থ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। ঠিক যেরকম গতকাল অনুপমা ভোরবেলায় এগিয়ে দিতে এসেছিল বড় রাস্তার মোড়ে। অন্যবার পুলক এগিয়ে দিতে আসে। এবার পুলকের শরীরটা ভাল ছিল না। বারণ করা সত্ত্বেও অনুপমাই সুতীর্থকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। গোটা রাস্তাটায় অনুপমা শুধু একটাই কথা বলেছিল, “তুমি আমাদের ক্ষমা করে দিয়ো সুতীর্থদা।”

সিদ্ধান্তটা গতরাতেই হয়ে গিয়েছিল। পুলকের চোখে সেই পুরনো হেরে যাওয়ার ভয়ের ছাপটা দেখেছিল, সুতীর্থকে যখন পুলক

বলেছিল, "আমাদের তো কোনও আপত্তি নেই সুতীর্থ। কিন্তু চারপাশের লোকজনকে কী বলব বল তো? বাচ্চাটা কে? কার? কোথা থেকে এল? তা ছাড়া অনু কী পারবে? ওর তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই!"

প্রশ্নগুলো সুতীর্থরও যে মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু যেভাবে নিজের কাছে নিজে কোনও উত্তর দিতে পারেনি, সেভাবেই পারেনি অনুপমা আর পুলকের সামনেও। হয়তো ভীষণ একটা অন্যায় আবদার নিয়ে এসেছিল। তবু ভগবতী বয়েজ় স্কুলের ফার্স্টবয়ের উপর অদ্ভুত একটা আস্থা ছিল। নাটকের জটিল বিষয়বস্তু যেভাবে সরল সমাধান করে দেয় পুলক, এই সমস্যারও হয়তো সেরকমই একটা সরল সমাধান করে দেবে। বাস্তব জীবনটা আর যাই হোক নাটকের স্ক্রিপ্ট নয়। আশাটা হয়তো একটু বেশিই করেছিল।

অনুপমা ক্ষমা চাওয়াতে সুতীর্থ শুধু বলতে পেরেছিল, "ক্ষমা তো আমারই চাওয়ার কথা অনু। সব আবদার তো রাত-দুপুরে পান্তা খেতে চাওয়ার মতো নয়। সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"কিন্তু সুতীর্থদা, কী হবে বাচ্চাটার?" প্রশ্ন করেছিল অনুপমা।

"এখনও তো সময় আছে। ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না।"

দু'পাশে ধানি জমি চিরে বড় রাস্তাটা চলে গিয়েছে। বহুদূরে দেখা গেল স্টেশনে যাওয়ার ফার্স্ট বাসটা আসছে। অনুপমা বোধ হয় শেষ কথাটা বলার জন্য এই মুহূর্তটারই অপেক্ষা করছিল। সুতীর্থ যাতে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার কোনও সময় না পায়!

"তোমাকে একটা কথা বলি সুতীর্থদা। প্লাস্টিক সার্জারির দরকার নেই। ওই টাকাটা তুমি আর আমার জন্য রেখো না। বাচ্চাটাকে দিয়ে দিয়ো।"

"মানে?" খুব অবাক হয়ে অনুপমার গালের দিকে চেয়েছিল সুতীর্থ। অনুপমা তখন যেন এক দার্শনিক। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল, "এই দগদগে গালটা দেখে আয়নার সামনে আমি আর চোখ বন্ধ করে ফেলি না সুতীর্থদা!"

সুতীর্থর যেন মনে হয়েছিল অনুপমার চোখ বলছে, তোমার বাচ্চাটার যখন দায়িত্ব নিতে পারলাম না, তুমি আমার রূপ কেন ফিরিয়ে দেবে সুতীর্থদা?

শনিবার, ২৯ মার্চ

বিকেলের দিকে রূপান্তর নাটকের রিহার্সালের মধ্যে পার্থর একটা ফোন পেল সুতীর্থ, "তুই সেদিন একটা বাচ্চার কথা বলছিলি না..."

ফোনে পার্থর গলাটা শুনে একটু বিস্মিতই হল সুতীর্থ। অন্তরাকে সেদিন যে জেদ নিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ বাচ্চাটার দায়িত্ব নেব,' সেটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল। দিনরাত নাটকের মধ্যে ডুবে থেকেও এই দায়িত্বটা কীভাবে মেটাবে, ভাবনাটা মাথায় এলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। পার্থর অসমাপ্ত কথাটা শুনে মনটা একটা আশার আলো দেখার জন্য মুখিয়ে রইল।

"ফ্রি আছিস? ওই ব্যাপারে একটু কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ বল না!"

"শোন, তোর ইসুটা নিয়ে শ্রাবণী মানে আমরা বউয়ের সঙ্গে অনেক ডিসকাস করেছি। শ্রাবণী একটা কথা বলছিল। ওর মামাতো ভাই, বছর দশেক হল বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কোনও ইসু হয়নি এখনও। ওরা অ্যাডপশনের জন্য খোঁজখবর করেছে। এখন নাকি লম্বা কিউ। ইন দ্যাট কেস তোর কেসটা ম্যাচ করানো যেতে পারে!"

"সে কী রে! তোকে জানাশোনা একটা অ্যাডপশন এজেন্সির খোঁজ করতে বলেছিলাম। তুই একেবারে বাবা-মা'র খোঁজ করে ফেলেছিস!"

"না, যা করার তাতে আসলে একটা অ্যাডপশন এজেন্সিকে ইনভল্ভ করতেই হবে। ওই ফস্টার কেয়ারের পিরিয়ড, কোর্ট পেপার্স এসব। সেসব হয়ে যাবে। কিন্তু তোকে কয়েকটা ইনফরমেশন দিতে হবে।"

"বল।"

"তোর বাড়িতে মেয়েটা আছে বলেছিলি। তোর বউয়ের কেয়ারে?"

"হ্যাঁ।"

"বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে হবে?"

সুতীর্থ গলাটা একটু গম্ভীর করে বলল, "জানি না।"

পার্থ অনুনয়ের সুরে বলল, "তোর ডাক্তার গিন্নি নিশ্চয়ই জানে। ওকে একটু জিজ্ঞেস করে নে না..."

"পারব না রে। জিজ্ঞেস করলেও আমাকে বলবে না।"

"তোর বউ খুব এথিক্যাল মনে হচ্ছে। সেক্স বলবে না। এনিওয়ে আসলে ওদের প্রেফারেন্স ছিল গার্ল চাইল্ড। ব্যাপারটা ম্যাচ করে গেলে কথাটা এগিয়ে রাখা যেত!"

"আচ্ছা ধর, একজন স্বাভাবিকভাবে মা হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে তার একটা আশা থাকে ছেলে বা মেয়ে পাওয়ার। কিন্তু জন্মের সময় উলটোটাও হয়। তা হলে কি সেই মা সেই সন্তানকে গ্রহণ করে না?"

পার্থ হাসল, "লজিক্যালি তুই কারেক্ট। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অ্যাডপশনের সময় একটা চয়েস থাকে, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে হবে।"

"ঠিক বলেছিস। ফরসা না কালো হবে। ভগবতী বয়েজ় স্কুলের সামনে সুরেনের মনোহারি দোকানটা মনে আছে তোর? সেই সুরেনের মেয়ে? বাচ্চাটা যেন সেরকম দেখতে না হয়!"

"তুই রেগে যাচ্ছিস।"

"সরি রে। আজকাল এরকম কথা শুনলেই মাথা যেন গরম হয়ে যায়। বিশ্বাস কর, যে বাচ্চাটার কথা বলছি তাকে হয়তো এতদিনে মেরেই ফেলা হত, অথচ আশ্চর্যভাবে সে বেঁচে আছে। পৃথিবীটা জহ্লাদে ভরে গিয়েছে। টেররিস্টরা আর ক'টা মানুষ মারে রে? তার অনুপাতে গর্ভে প্রাণ হত্যা সংখ্যায় অনেক বেশি। এসব ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায়। কথাগুলো অনেকদিন মনের ভিতর ছিল, আজকে বলে ফেললাম। আসলে ব্যবহারিক জীবনে আমি একজন খুব সাধারণ কেরানি তো, তাই। গলা তুলে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমার ক্ষমতাও খুব সীমিত..."

"তোর ইডিওলজি আমি বুঝতে পারছি। রেসপেক্ট করছি। কিন্তু একই সঙ্গে তোকে আবারও বলছি, পৃথিবীটা একটা অদ্ভুত প্র্যাকটিক্যাল জায়গা। ইমোশনের জায়গা নেই। দরকার ঠিকঠাক ইনফরমেশন।"

"কীসের ইনফরমেশন বলতে পারিস পার্থ? একজন পৃথিবীর আলো দেখতে চাইছে। ভালবাসায় ভরা একটা কোল পেতে চাইছে। এটাই কি যথেষ্ট ইনফরমেশন নয়? তার মায়ের জাত কী? সে হিন্দু না মুসলমান, সে সুন্দরী না কুৎসিত এগুলো কি খুব জরুরি ইনফরমেশন?"

"তুই ভীষণ ইরিটেটেড হয়ে আছিস। তোকে কিন্তু আমি হেল্প করতেই চাইছিলাম।"

সুতীর্থ এবার অসহায় হয়ে বলে উঠল, "আমি তো তোর সাহায্যই চাই রে পার্থ। দয়া করে তুই তোর শালার বউকে বোঝা, জন্ম নিতে চলা এই বাচ্চাটাকে যেন মনে করে নিজের গর্ভেই লালন করছে। বা ধর, আজকাল যেমন সারোগেট মাদার হয়েছে, সেরকম একটা ফিলিং। ঈশ্বর ওর বাচ্চাকে অন্য-কারও গর্ভে লালন হতে দিয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমি এখন ছাড়ছি রে। একটা কল আসছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে তোকে আবার জানাচ্ছি।"

ওমপ্রকাশের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ফোনটা পেল বীরেশ্বর মজুমদার, "স্যার, না জেনে কিছু কসুর করে ফেলেছি কি?"

"ছি ছি আপনি দোষ করবেন কেন?"

"তা হলে স্যার কেন কাজটা বন্ধ করিয়ে দিলেন! গেটের সামনে একটা শহিদ বেদি তৈরি করে ফেলেছে আপনার ছেলেরা।"

"জানতাম আপনি এটাই বলবেন। আসলে কী জানেন তো, রাজনীতি করে জীবন কাটাতে হয়। আর বোঝেনই তো ভোটের সময় পাবলিকের ছোট-ছোট ইসুগুলো খুব স্পর্শকাতর থাকে।"

"স্যার, আমার সমস্যা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। কাজের প্রগ্রেস খারাপ করছে। অলরেডি ব্যাঙ্ক জেনে গিয়েছে। প্রজেক্টটা লেট শেডিউলে চললে ইন্টারেস্ট বার্ডেন বেড়ে যাবে। আর দু'টো মাত্র দিন আছে এই ফাইনানশিয়াল ইয়ারটা শেষ হতে।"

"আমার সমস্যাটা তো আপনি বুঝছেন না। আপনার তো ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্টটাই শুধু বাড়বে আর আপনার শেডিউলে দিনে-রাতে কাজ চললে আমার ভোট ব্যাঙ্কটাই চলে যাবে।"

"স্যার, কিছু একটা ওয়ার্ক আউট করা যায় না?"

"মাথায় তো এই মুহূর্তে কিছুই আসছে না। রাতে যে বুড়োটা আওয়াজে মারা গিয়েছে, তার ছেলে দুটো এখনও কাছা ছাড়েনি। অন্তত মৎস্যমুখটা করুক। তার আগে কিছুই করা যাবে না।"

ওমপ্রকাশ বলল, "বিশ্বাস করুন স্যার, আমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে, রাতে ডেসিবেল লিমিটের মধ্যে যেন কাজ হয়। এখন শুধু ইন্টিরিয়রের কাজ হচ্ছে। যখন পাইলিং হয়েছিল, তখন অনেক বেশি আওয়াজ হয়েছিল, কোনও অবজেকশন হয়নি।"

"আমি বিশ্বাস করার কে ওমপ্রকাশবাবু? পাইলিংয়ের আওয়াজে বুড়োর হার্টে কিছু হয়নি। পাবলিকও দু'কানে আঙুল গুঁজে উন্নয়ন বরদাস্ত করেছে। কিন্তু সেদিন মাঝরাতে বুড়ো যে আওয়াজে হার্টফেল করে মরেছে, এই ঘটনার সাক্ষী তো অনেক।"

ফোনটা ছেড়ে বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "কানু জ্যাঠা তুমি স্বর্গ বা নরক যেখানেই গিয়ে থাকো, অনেক উপকার করে দিয়ে গেলে।"

যে-ছেলেটা রূপকের ব্যাপারে এত খোঁজখবর করেছে সে বীরেশ্বর মজুমদারের সামনে বসেছিল। বাকি ছেলেদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে একটা পানের খিলি মুখে দিয়ে বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "যা, তোকে প্রোমোশন দিয়ে দিলাম।"

বীরেশ্বর মজুমদারের প্রশংসা ছেলেটাকে আপ্লুত করল। ছেলেটার উজ্জ্বল মুখটা দেখতে-দেখতে বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "কেসটায় যেভাবে তুই লেগে পড়ে আছিস, বাকিটাও তোকে সামলাতে হবে।"

"বলুন বীরেশ্বরদা," ছেলেটা গদগদ গলায় বলল।

"বললি না ড্রাইভারটা রোজ রাতে সল্টলেকের কোনও একটা দোকানে খেতে যায়।"

"হ্যাঁ দাদা।"

"গোকুলকে তোর সঙ্গে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে একটা মারুতি ভ্যান আর কয়েকটা ছেলেপুলে নিয়ে যা। ড্রাইভারটা যখন রাত্রে ফিরবে, ড্রাইভারটাকে তুলে ফ্যাল। তারপর ফাঁকায় কোথাও নিয়ে গিয়ে... ভগবান কা পেয়ারে করে দে।"

"খুন!" কাঁপা গলায় বলে উঠল ছেলেটা।

ছেলেটার প্রতিক্রিয়া দেখে বীরেশ্বর মজুমদার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসতে থাকল, "তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যা করার গোকুল করবে। তোকে প্রোমোশন দিচ্ছি, তাই এক্সপেরিয়েন্স করতে পাঠাচ্ছি। এবার বড় হবি তো, নাকি চিরকাল পোলিং এজেন্ট হয়েই থাকবি?"

"রূপককে খুন করে কী লাভ হবে?" ছেলেটার গলার স্বর তখনও স্বাভাবিক হয়নি।

"অনেক কিছু হবে," বীরেশ্বর মজুমদার সুর কেটে বলল, "ড্রাইভারটার মিষ্টি বউটা টিভি চ্যানেলগুলোর সামনে হাপুস নয়নে কাঁদবে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে প্রবীর দাশগুপ্তর নাম নেবে। আমরা সিবিআই তদন্ত চাইব। প্রবীর দাশগুপ্তর সরকার সিআইডি পাঠাবে। ওমপ্রকাশ, অন্তরা চৌধুরীও ফাঁসবে। প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়ে ইয়া বড় পেট নিয়ে ফিরে আসবে। গৌরবপুরের লোকেরা বহুদিন ভাল তামাসা দ্যাখেনি। ওমপ্রকাশ একহাঁটু ফেঁসেছে। এরপর একগলা ফেঁসে যখন প্রবীর দাশগুপ্তর হাতটা ছাড়বে, তখন বাঁচানোর কথা ভাবব।

রবিবার, ৩০ মার্চ

রাস্তা থেকে কফি শপের ঝাঁ চকচকে কাচের পিছনে সুতীর্থ দেখল একটা দম্পতির সঙ্গে পার্থ বসে আছে। সামনে প্রমাণ সাইজের তিনটে কফির মাগ আর স্যান্ডউইচ। সুতীর্থ ভিতরে ঢুকতেই পার্থ উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা করল, "আয় আয়, আলাপ করিয়ে দিই। এ হল অনুরাগ আমার শালা আর ও হচ্ছে প্রিয়া, মাই হার্ট থ্রব।"

সুতীর্থ হাত জোড় করে নমস্কার করল। পোশাকি আলাপের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। পার্থ কাল রাতেই এই মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা করার সময় ওদের কথা বলেছে। অনুরাগ পার্থর দূরসম্পর্কের শালা। বছর দশেক হল বিয়ে হয়েছে ওদের। এখনও সন্তানহীন। অনুরাগের পাশের তুলতুলে সোফাটায় বসল সুতীর্থ। প্রিয়া মেয়েটার মুখটা গোলগাল আদুরে মিষ্টি। পার্থ ততক্ষণে সুতীর্থর পরিচয় দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে, "শিল্পী মানুষ, বুঝলে তো সুইটহার্ট। আদ্যোপান্ত নাটুকে।"

সুতীর্থ বলল, "আপনাদের বোধহয় কিছু প্রশ্ন আছে বাচ্চাটার সম্পর্কে।"

অনুরাগ আর প্রিয়া একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অনুরাগই কথা শুরু করল, "না, সেরকম কোনও প্রশ্ন নেই। আসলে দু'-দু'বার অ্যাডপশনের ব্যাপারটা এগিয়েও শেষ অবধি হয়ে ওঠেনি। দিস টাইম, আমরা ঠিক করেছি, কোনও প্রশ্নের বদলে উই উইল কিপ আওয়ার ফিঙ্গার ক্রস্‌ড। আমি প্রিয়াকে বলেছি, এবার যদি ম্যাচিওর করে ধরে নেবে তুমি কনসিভ করে গিয়েছ বা কোনও সারোগেট মাদারের পেটে বড় হচ্ছে আমাদের বাচ্চা।"

সুতীর্থ মনে-মনে হাসল। তা হলে এই কথাগুলোই পার্থ বুঝিয়ে বলেছে ছেলেটাকে।

"তাও, আপনাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে?"

"প্রশ্ন আর কী, এইচ আই ভি নিশ্চয়ই টেস্ট করা আছে!"

"আশা করি আছে। না হলে আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই বলত সেটা। আর কোনও প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন ঠিক নয়, একটা কিউরিয়সিটি বলতে পারেন। আমি জানি আপনি সবই জানেন..."

"কী ব্যাপারে?"

"মানে বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বউদি নিজে যখন গাইনিকলজিস্ট..."

সুতীর্থ দেখল প্রিয়া একটা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সুতীর্থর দিকে। প্রিয়ার চোখ থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বলল, "পার্থকে আমি আগেই বলেছি। আমি সত্যিই জানি না। কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। তবে ওর মায়ের দৃঢ় ধারণা বাচ্চাটা মেয়ে। অবশ্য এই ধারণাটার কোনও ডাক্তারি ভিত্তি নেই।"

সুতীর্থর চোখটা আবার পড়ে গেল প্রিয়ার চোখের দিকে। চোখের কোনায় যেন খুশি ঝিলিক মারছে! সুতীর্থর সামনেও একটা প্রমাণ সাইজের কফি মাগ এল। তাতে চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বলল, "আমি যেটুকু জানি, সেটুকু বলি। বাচ্চার মা একটা সবে টিনএজ ক্রস করা মেয়ে। বিয়ের আগেই প্রেগন্যান্ট হওয়ার ব্যাপারটা যদি মার্জনা করেন, তা হলে বলব, ভাল পরিবারের মেয়ে।"

"মার্জনার কথা কী বলছেন সুতীর্থদা? আজকাল তো এরকম হামেশাই হচ্ছে। মেয়েটি যে অ্যাবর্শন না করে বাচ্চাটাকে ক্যারি করে আমাদের দিতে চেয়েছে, এর জন্য তো আমরাই সারাজীবনের জন্য ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

সুতীর্থ একটু চুপ থেকে বলল, "মেয়েটির পরিচয় আপনাদের দেব না। পার্থকেও বলিনি। মেয়েটির দিক থেকে প্রথম শর্ত হচ্ছে, তার পরিচয় গোপন থাকবে।"

"এটা আপনাকে বলতে হবে না সুতীর্থদা। যে-কোনও অ্যাডপশন এজেন্সির এই শর্ত থাকে!"

পার্থ বলল, "আমি যতদূর জানি শর্তটা দু'পক্ষেই থাকে। বায়োলজিক্যাল মাকেও জানতে দেওয়া হয় না তার মেয়েকে কোথায় প্লেস করা হল। আর বাচ্চাটা যখন সাবালক বা সাবালিকা হবে তখন সে নিজে থেকে জানতে চাইলে তুই তো রইলিই। তোর কাছে পাঠিয়ে দেব, বুঝে নিবি।"

পার্থ হালকা রসিকতা করার চেষ্টা করলেও সুতীর্থ গাম্ভীর্য ভাঙল

না। দার্শনিকের গলায় বলল, "মেয়েটির কাছে আপনাদের পরিচয় হয়তো দিতে পারব না, তবে বুক ভরে বলতে পারব যে, খুব ভাল একটা মায়ের কোলে দিয়েছি।"

"ওরে বাবা! তুই তো দেখছি সুইটহার্টের প্রেমে পড়ে গিয়েছিস," হাসি-হাসি মুখে বলে উঠল পার্থ।

সুতীর্থ এবং প্রিয়া দু'জনেই লজ্জা পেল।

অনুরাগ বলল, "দেখুন সুতীর্থদা, আমি প্রিয়াকে একটা কথা বলেছি। বলেছি বাচ্চাটা দেখতে কেমন হবে সেটা কোনও ব্যাপার নয়। সেই বার্নাড শ-র বিখ্যাত উক্তিটা ধরেই বলছি, বাচ্চাটা যদি আমাদের বায়োলজিক্যাল হত এবং আমার লুক্স আর প্রিয়ার বুদ্ধি নিয়ে জন্মাত তাতে আমি একটু দুঃখ পেতাম ঠিকই..."

"আর যদি তোমার মতো সুরেলা গানের গলা হত তার আগে যেন ঈশ্বর আমাকে বধির করে দিতেন," পার্থ জোরে হেসে বলে উঠল।

"জোক্স অ্যাপার্ট," অনুরাগ দু'হাত তুলে বলল, "সুতীর্থদা আপনাকে বলছি... আমার কাছে লুক্স ম্যাটার করে না, সেক্স ম্যাটার করে না... ইনফ্যাক্ট বাচ্চাটার যদি কোনও প্রবলেমও থাকে... মানে ইন বর্ন কোনও প্রবলেম... হার্টে ফুটো..."

প্রিয়া এই প্রথম বলে উঠল, "ইস! কী যা তা বলছ! এরকম কেউ বলে..."

"আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলছি প্রিয়া! ধরো, আমাদের যদি কোনও ন্যাচারাল বাচ্চা হত, তার আমরা ট্রিটমেন্ট করাতাম না? ডেফিনিটলি করাতাম। এক্ষেত্রেও করাব। আমি ব্যাপারটা এভাবেই দেখি।"

"চুপ করো," প্রিয়া চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। সুতীর্থ ততক্ষণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে এই দম্পতীকে দেখে। কী উদার, কী আধুনিক মানসিকতা এদের।

পার্থ বলল, "তা হলে তুই কী ডিসাইড করলি?"

"আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু আমাকে মেয়েটির সঙ্গে, অন্তরার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে হবে। এ ছাড়া লিগাল ফর্মালিটিগুলো..."

সুতীর্থর চোখে পড়ল প্রিয়া দু'আঙুলে ক্রস করে ফেলেছে। পার্থ সুতীর্থর থাইয়ে চাপড় মেরে বলে উঠল, "তোকে তো বলেইছি, এসব নিয়ে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। তোর বউয়ের সঙ্গে তো এখনও আলাপ করিয়ে দিলি না। না হলে ওর সঙ্গে আমিই কথা বলতাম। এটা মার্চ মাস শেষ হল। এখনও দু'মাস সময় তো আছে হাতে। ইন ডিউ টাইম মেয়েটা নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যাবে। জন্মানোর পর বাচ্চাকে সরাসরি প্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হবে। লিগাল ব্যাপারটা আমি ম্যানেজ করে নেব। কিন্তু প্রিয়া-অনুরাগের দিক থেকেও আমার একটা জিনিস এনশিওর করার আছে। তোকে ব্যাপারটা দেখতে হবে।"

পার্থর গলাটা গম্ভীর হয়ে এল, "আমার লিগ্যাল অ্যাডভাইসার একটা পয়েন্ট বলেছে। দু' মাসের মধ্যে বায়োলজিক্যাল মাদার তার বাচ্চাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ক্লেম করতে পারে! এক্ষেত্রে তোকে এনশিওর করতে হবে যে, সেরকম কিছু হবে না।"

আইনের জটিলতা কোনওদিনই বোঝে না সুতীর্থ। কিন্তু এই কথা কোন ভরসায় দেবে। মৃন্ময়ী একদিন তার ভ্রূণকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারপর অনেক কষ্ট করে এখন গর্ভে তাকে লালন করছে। শিশুটা জন্মানোর পর হয়তো তাকে চোখেই দেখানো হবে না। কিন্তু যদি সত্যি ওর মন কেঁদে ওঠে ফ্লোরাকে পাওয়ার জন্য। কী করে এত বড় কথাটা দেবে সুতীর্থ? একটু ভেবে সে বলল, "আমাকে একটা দিন সময় দে... তোদের সব জানিয়ে দিচ্ছি।"

সোমবার, ৭ এপ্রিল

মানসী আজ ভোরে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নে কী-কী দেখেছে সব মনে নেই। তবে সেই থেকে স্বপ্নের একটা ছেঁড়া অংশ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মৃন্ময়ীর একটা খুব যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। 'মা' 'মা' বলে অস্ফুট স্বরে কী যেন বলার চেষ্টা করছে! সেই থেকে মনে একটা কুচিন্তা থাবা বসিয়েছে। মেয়েটা বেঁচে আছে তো?

নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রবীর দাশগুপ্ত এখন [illegible] ব্যস্ত। সকালে বাড়ির চা পর্যন্ত খাওয়ার সময় নেই। তবে [illegible] কোনওদিন হঠাৎ করে রাতে বাড়িতে রুটিটা মুখে তোলার সুযোগ [illegible] যায়। আর এই রুটিটুকু খাওয়ার সময় স্বামীর সঙ্গে কথা বলার একমাত্র সময় মানসীর। সে ঠিক করেছে যেভাবেই হোক, মেয়ের সঙ্গে একবার ফোনে কথা বলবেই। কথাটা পাড়তে যাবে এমন সময় প্রবীর দাশগুপ্তর মোবাইলটা বাজতে শুরু করল। ফোনটা ধরে তিরিক্ষি গলায় প্রবীর দাশগুপ্ত বলে উঠল, "কী হয়েছে?"

ওপ্রান্ত থেকে একটা ছেলে বলল, "দাদা ওদের সব ফ্লেক্স চলে এসেছে। আজ রাত্রেই বেরোচ্ছে সব টাঙাতে।"

"ওরা তো ক্যান্ডিডেটের নামই এখনও বলেনি। এর মধ্যে ফ্লেক্স চলে এল?"

"পার্টির সিম্বলের ফ্লেক্স।"

প্রবীর দাশগুপ্তর মেজাজটা আরও তিরিক্ষি হল। কলকাতা থেকে দু'দিন আগেই ফ্লেক্স চলে আসার কথা ছিল। যার উপর দায়িত্ব আছে সে অহেতুক ডোবাল। ওদের পার্টি অ্যাডভান্টেজটা পেয়ে গেল। ভাল-ভাল জায়গাগুলো সব আজ রাতেই দখল হয়ে যাবে। পরে ওই ফ্লেক্সের জায়গায় নিজেদের ক্যান্ডিডেটের ছবি টাঙাবে।

মানসী কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রবীর দাশগুপ্ত এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল। সিটটায় বীরেশ্বর মজুমদার দাঁড়াবে, নাকি ওটা ওদের শরিকের হবে, এখনও স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। পাঁচবছর ক্ষমতায় থেকে যে স্বাভাবিক জনপ্রিয়তাহানি হয়েছে, সেটা ফিরে পাওয়ার জন্য ওদের ক্যান্ডিডেটের নামটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জানাতে হবে। অস্থির হয়ে পায়চারি করতেই প্রবীর দাশগুপ্ত পেল পরের ফোনটা।

"স্যার, রূপক বলছি।"

"বল," তেতো গলায় বলল প্রবীর দাশগুপ্ত।

"স্যার, আজ বাড়িতে দুটো বড়-বড় বাক্স-যন্ত্রপাতি এসেছে।"

"কীসের যন্ত্রপাতি?"

"সোনোগ্রাফি মেসিনের..." বর্ণনা দিতে থাকল রূপক।

প্রবীর দাশগুপ্তর কপালে ভাঁজ পড়ল। ডঃ অন্তরা পালচৌধুরী বাড়িতে সোনোগ্রাফি মেশিন আনছে কীসের জন্য? বাড়িতে কি নতুন ক্লিনিক খুলবে? তার মানেই তো লাগামহীন বাইরের পেশেন্টের আনাগোনা? নাকি মেশিনটা এসেছে মৃন্ময়ীর জন্য?"

"ঠিক আছে। তুই ছাড় এখন।"

ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার আগে রূপক সাহস করে বলে উঠল, "স্যার, আর-একটা কথা ছিল..."

"তাড়াতাড়ি বল।"

"স্যার... মানে... একটু দু'দিনের ছুটি পাওয়া যাবে?"

"ছুটি? কীসের ছুটি?"

"স্যার, শ্যামলী..."

"শ্যামলী কে?"

"আমার বউ। বাপের বাড়িতে গিয়েছে স্যার। নববর্ষের দিন ওদের দোকানে হালখাতার নেমতন্ন আছে। দু'দিন একটু ঘুরে আসব?"

"কোথায় তোর শ্বশুরবাড়ি?"

"আমতলা হাওড়ায় স্যার।"

"ভেবে দেখব। ছাড় এখন।"

ফোনটা ছেড়েই অন্তরাকে ফোন করল প্রবীর দাশগুপ্ত, "শুনলাম আপনি বাড়িতে সোনাগ্রাফির মেশিনপত্তর আনিয়েছেন?"

এতরাতে ফোনটা পেয়ে অন্তরা নার্ভগুলোকে শক্ত করল। বাড়িতে ঝামেলা বেড়েই চলেছে। তার উপর তিতিবিরক্তিকর প্রবীর দাশগুপ্তর ড্রাইভারটা। এবাড়ির প্রতিটি পাতা নড়ার খবরকে প্রতিরাতে রিপোর্ট করে। গলায় যথাসম্ভব বিরক্তিটা লুকিয়ে রেখে অন্তরা বলল, "মৃন্ময়ীর একটা সোনোগ্রাফি করার খুবই প্রয়োজন। আপনার শর্ত মতোই যাতে ক্লিনিকে না নিয়ে যেতে হয়, তাই বাড়িতেই মেশিনটা আনিয়ে দিয়েছে ওমপ্রকাশ।"

শর্ত মতো প্রথম থেকেই কিছু হচ্ছে না অন্তরাদেবী। আপনি বার-একবার এক-এককথা বলে যাচ্ছেন। এই তো সেদিন বললেন, প্রথম সপ্তাহে বাচ্চাটা হবে। ওমপ্রকাশবাবু বললেন, বাচ্চাটা হওয়ার পর হাপিস করার ব্যবস্থা করেছেন। এখন আবার সোনোগ্রাফি করছেন। আবার কী বলবেন জানি না! শুনুন, সোনোগ্রাফি-ট্রাফি যা করছেন করুন। মনে রাখবেন সিজার-টিজার যেন না হয়, পেটে যেন কোনও কাটাদাগ না থাকে!"

অন্তরা দাঁতে দাঁত চিপে বলল, "রাখছি। গুডনাইট স্যার।"

ফোনটা ছেড়ে প্রবীর দাশগুপ্ত দেখল মানসী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। মানসী কিছু বলার জন্য মুখটা খুলতেই প্রবীর দাশগুপ্ত ধমকে করে উঠল, "ওফ! সারাদিনে একটা শান্তির রুটি খেতে দেবে তো, না কি?"

মঙ্গলবার, ৮ এপ্রিল

দরজাটা বন্ধ মৃন্ময়ীর। মাঝে-মধ্যে খুব মৃদু একটা বিপ-বিপ আওয়াজ। ঘরে একজন অচেনা পুরুষ, অচেনা মহিলা আর ড. অন্তরা পালচৌধুরী। একতলায় যে ঘরে মৃন্ময়ী খাটে শুয়ে আছে তার একপাশে দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে একটা দড়ি টাঙানো হয়েছে। দড়ির উপর দিয়ে পরদা ঝোলানো আছে। এই আড়ালের ভিতর মৃন্ময়ীর খাটটা। সামনে অচেনা মেয়েটা সোনোগ্রাফির প্রোবটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরদার ওপাশের পুরুষটাকে চোখে দ্যাখেনি মৃন্ময়ী। শালীনতা অথবা গোপনীয়তা কোনওকিছুর একটাকে সম্মান জানিয়েছে অন্তরা। তবে ওপাশের কথাবার্তা বেআব্রু হয়ে মৃন্ময়ীর কানে আসছে।

"ম্যাম, ইমেজের ডেপ্‌থটা দেখুন। এটা পসিবল হচ্ছে আমাদের নাইনি সেন্সিটিভ প্রোবের জন্য... মনিটরের ডানদিকের প্যানেলটা দেখুন... প্রচুর অ্যাডিশন্যাল ইনফরমেশনও পাচ্ছি... অন্য-কারও মডেলে এটা নেই..."

মৃন্ময়ী একবার চোখটা খুলল। এমনিতেই প্রচুর জল খেয়ে একটু অস্বস্তি, তার উপর এই সোনোগ্রাফি মেশিনের ডেমোতে গোটা ব্যাপারটা প্রলম্বিত। তবে যে লোকটা বা ছেলেটা একতরফা সোনোগ্রাফি মেশিনটার গুণাগুণ অক্লান্তভাবে বলে যাচ্ছে, অন্তরার মুখ থেকে তাকে কোনও প্রশ্ন করতে শুনছে না।

একটু পরে পরদার আড়াল ঠেলে ভিতরে এল অন্তরা। মৃন্ময়ীর দিকে চেয়ে শুকনো একটু হাসল। নিচু স্বরে কিছু-একটা নির্দেশ দিল টেকনিশিয়ান মেয়েটাকে। তারপর আবার বেরিয়ে গেল।

টেকনিশিয়ান মেয়েটা আবার মৃন্ময়ীর পেটের উপর সোনোগ্রাফির প্রোবটা বিভিন্ন জায়গায় রাখতে থাকল। বাইরে সেই বিপ-বিপ শব্দ, ছেলেটার গলার স্বর এবার বেশ নিচু। হয়তো অন্তরারই নির্দেশ। তারপর সেটুকু গলার স্বরও বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কিছুক্ষণ পর অন্তরার গলার স্বর পাওয়া গেল। বলছে, "আসুন আমরা বাইরের ঘরে বসে প্রিন্ট আউটগুলো দেখি।"

আর-একবার পরদাটা অল্প সরিয়ে টেকনিশিয়ান মেয়েটাকে অন্তরা বলল, "ওকে, ওভার। একটু ওয়েট করো। আমি আসছি।"

অন্তরা হাতে একগোছা প্রিন্ট আউট নিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মৃন্ময়ী টেকনিশিয়ান মেয়েটাকে বলল, "পরদাটা এবার সরিয়ে দিন না!"

মেয়েটা পরদাটা সরিয়ে দিতে দমবন্ধ ভাবটা যেন কাটল। খাটের উপর উঠে বসল মৃন্ময়ী। মেয়েটা তখনও দাঁড়িয়ে। নিতান্ত সময় কাটানোর জন্য মৃন্ময়ী মেয়েটার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল, "ওই ভদ্রলোক কে ছিলেন?"

"বিবেক সেন। আমাদের কোম্পানির সিনিয়র সেল্‌স ম্যানেজার।"

"বাবা! উনি একদম নিজেই এসেছেন!"

"আসলে আপনার সোনোগ্রাফি যে মেশিনটায় হল, সেটা একদম অত্যাধুনিক মডেলের। তাই স্যার নিজে এসেছেন ফিচারগুলো সব বুঝিয়ে দিতে।"

"কী অত্যাধুনিক ফিচার আছে?"

"এই রে। আমি তো সব জানি না। সবে অপারেট করতে শিখেছি।"

হঠাৎই মৃন্ময়ীর একটা অদ্ভুত খেয়াল হল। মেয়েটাকে অনুরোধ

"ওফ! সারাদিনে একটা শান্তির রুটি খেতে দেবে তো, নাকি?"

করে বসল, "আমাকে একটু আমার বাচ্চাটাকে দেখাতে পারবেন?"

মেয়েটা এই অনুরোধ শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। যেটুকু অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত হয়েছে, তাতে দেখেছে সোনোগ্রাফি হওয়ার সময় মেশিনটা পেশেন্টের পাশেই থাকে। মনিটারে ইচ্ছে করলেই মায়েরা চোখ রাখতে পারে। একটু অ্যাডভান্স স্টেজে থাকলে মায়েরা গর্ভস্থ অবয়বটা বুঝেও ফ্যালে। অনেকে আগ্রহ নিয়ে অনেক প্রশ্নও করে। তবে এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। এখানে যে-কোনও কারণেই হোক সোনোগ্রাফি মেশিনটাকে রাখা হয়েছে একটু দূরে। মেয়েটাকে রাখা হয়েছে পরদার আড়ালে। বিবেক স্যার নিজে এসেছেন মেশিনের গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে।

মেশিনটা অন করে প্রোবটা পেটের উপর ঠেকালেই মনিটরে দেখিয়ে দেওয়া যাবে হবু মা যেটুকু দেখতে চাইছে। তবু নিজের চাকরি হারানোর ভয়ে মেয়েটা রাজি হল না। বলল, "ম্যাডাম আসুন, ম্যাডাম বললে..."

অন্তরা কি রাজি হবে? হতেও পারে নাও পারে। যদি না হয়? জেদ দেখাতে হবে? নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হল মৃন্ময়ীর। খুব করুণ চোখে মেয়েটার হাতদু'টো ধরে বলল, "প্লিজ, একবার।"

মৃন্ময়ীর চোখে এমন একটা আর্তির ভাষা ছিল যে, মেয়েটা মৃন্ময়ীর চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়ানো গলায় বলল, "কিন্তু ম্যাম চলে এলে?"

"আপনি ভিতর থেকে দরজাটা লক করে দিন। কিছু জানতে পারবে না। যা বলার আমি বলব।"

একটু ভয়ে-ভয়েই দরজাটার লকটা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিল মেয়েটা। সোনোগ্রাফি মেশিনটা অন করে কয়েকটা কম্যান্ড দিয়ে মনিটরটা মৃন্ময়ীর দিকে ঘুরিয়ে বলল, "জাস্ট একবার কিন্তু!"

প্রোবটা আবার মৃন্ময়ীর পেটের দু'-এক জায়গায় লাগিয়ে এক জায়গায় স্থির করে মনিটরে পরিণত ভ্রূণটার ইমেজ দেখতে পেয়ে মৃন্ময়ীর দিকে চেয়ে বলল, "বুঝতে পারছেন?"

মৃন্ময়ীর চোখটা তখন এক সরল মাতৃত্বের প্রলেপে উদ্ভাসিত। যেন পৃথিবীর সেরা বিস্ময় দেখছে। তিনকোণা একটা আলোর প্রতিবিম্বে জঠরে তার নিজের সন্তান। বড়মাথাটা ঘাড় গুঁজে বুকের কাছে হাত জড়ো করে যেন মাকে প্রণাম জানাচ্ছে!

মৃন্ময়ী হাতটা অল্প তুলে আঙুলগুলো নাড়িয়ে বলল, "হাই ফ্লোরা!"

ফ্লোরা যেন বলে উঠল, আমি ভাল আছি মাম্মি।

মেয়েটা প্রোবটা মৃন্ময়ীর পেটের উপর থেকে তুলে নিয়ে চটপট সোনোগ্রাফির মেশিনটা অফ করে মনিটারের মুখটা আগের জায়গায় ঘুরিয়ে দিয়ে দরজার লকটা খুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবার ভালভাবে তাকানোর ফুরসত পেল মৃন্ময়ীর দিকে। মৃন্ময়ীর দু'চোখের কোল দিয়ে তখন জল নামছে। মেয়েটা এগিয়ে এসে হ্যান্ড টাওয়েল দিয়ে মৃন্ময়ীর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বলল, "মন খারাপ করছেন কেন?"

মৃন্ময়ী আবার জড়িয়ে ধরল মেয়েটার হাতদু'টো, "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।"

"আপনাকে 'না' বলতে পারলাম না। আপনি ম্যাডামকে বলবেন না কিন্তু। রাগ করতে পারেন।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"বলুন।"

"ফ্লোরার সব ঠিকঠাক আছে তো?"

"ফ্লোরা কে?"

মৃন্ময়ী পেটের উপর হাত রেখে বলল, "এই যে এ।"

মেয়েটা হাসল, "বাঃ! আগেভাগেই ভারী সুন্দর নাম দিয়ে দিয়েছেন তো!"

"বলুন না, ফ্লোরা ঠিকঠাক আছে তো?"

মেয়েটা নিজেই ওই কয়েক সেকেন্ড এত টেনশনে ছিল যে, ইমেজটা ভাল করে দ্যাখেনি, তা ছাড়া ও ডাক্তার নয়। অভিজ্ঞতাও বেশি নয়। তবে এই প্রশ্নটাও স্বাভাবিক। নিরানব্বই শতাংশ মায়েরা টেকনিশিয়ানদের এই প্রশ্নটা করে। ভাল-মন্দ বলার মতো [illegible] জ্ঞানও নেই, তবুও মৃন্ময়ীকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, "হ্যাঁ [illegible] আছে। তবে ম্যাডাম আপনাকে সব বলতে পারবেন।"

একটু পরে অন্তরা ফিরে এসে মেয়েটাকে বলল, "প্যাকআপ [illegible] নিতে পারো," তারপর মৃন্ময়ীর কাছে এসে বলল, "তুমি ঘরে [illegible] পারো মৃন্ময়ী।"

মৃন্ময়ী কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "ফ্লোরা ঠিক [illegible] কি না বলো?"

অন্তরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল টেকনিশিয়ান মেয়েটা উৎকর্ণ [illegible] ওদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে। নিচু স্বরে বলল, "এরা [illegible] যাক, তারপর তোমার সঙ্গে আমি বসছি মৃন্ময়ী।"

বুধবার, ৯ এপ্রিল

গতরাত থেকে বহুবার ফোন করার পর অবশেষে ওমপ্রকাশকে [illegible] পারল অন্তরা। উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "তুমি কোথায় ওম?"

অন্তরার গলা শুনেই ওমপ্রকাশ বলল, "ইজ় দেয়ার এনিথিং [illegible] ডক? তোমার গলাটা এরকম নার্ভাস শোনাচ্ছে কেন?"

"অফুলি রং ওম।"

"হোয়াট্স আপ?"

"দ্য বেবি," অন্তরা উত্তেজিত গলায় বলল, "সোনোগ্রাফি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, বেবিটার মেজর অ্যাবনরম্যালিটি আছে।"

"অ্যাবনরম্যালিটি?"

"ইয়েস ওম। মনে হচ্ছে ট্রাইসোমি ১৮ জেনেটিক ডিসঅর্ডার।"

"সেটা কী?"

"আরে যেটাকে এডওয়ার্ডস সিনড্রোম বলে। জিনে একটা এইটিন্থ ক্রোমোজ়ম আছে।"

"কী হয় তাতে?"

"মেনি থিংস। ইন দিস কেস, কিডনি-হার্ট ঠিকমতো কাজ করছে না। আরও সিভিয়ার অরগ্যান্যাল অ্যাবনরম্যালিটি আছে। বেবিটা বাঁচবে না ওম। এর কোনও ট্রিটমেন্ট নেই। ইনফ্যাক্ট এতদিন যে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্যের।"

ওমপ্রকাশকে নিশ্চিন্ত মনে হল। খুশি-খুশি গলায় বলল, "তা হলে তো সব সমস্যা সমাধান হতে চলেছে..."

অন্তরা অসহায় গলায় বলে উঠল, "নো ওম! প্রবলেম্স আর দেয়ার।"

"আমি বুঝতে পারছি না অ্যাবর্শন করাটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য এবং মিসক্যারেজ হবে বলে মনে হচ্ছে এখন। তা হলে সমস্যাটা কোথায়?"

"আমি কালকে মৃন্ময়ীর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলেছি। ও মানতে রাজি নয় যে, ওর বাচ্চাটার এই ধরনের কিছু অ্যাবনরম্যালিটি আছে, মিসক্যারেজের চান্সটা আমার অজুহাত ভাবছে। ও আমাকে বিশ্বাস করছে না, ওষুধ খাচ্ছে না। যেটা ওকে বিপদে ফেলতে পারে। জোর করলে বলছে, বাড়ি ফিরে যাবে। প্রবীর দাশগুপ্তকে কী বলব বুঝতে পারছি না! আর শুধু প্রবীর দাশগুপ্তই নয়, সুতীর্থও এখন ব্যাপারটার সঙ্গে ইনভলভ্ড। বাচ্চাটাকে কাউকে দেবে বলে কমিট করে রেখেছে। ভাবতে পারছ, মিসক্যারেজটা হয়ে গেলে ও কী করবে?"

"তুমি তোমার বরকে ইনভল্ভ করে রেখেছ? আগে বলোনি তো? তুমি বলেছিলে কোনও এনজিও-র কথা!"

"আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। এক, গোপনীয়তাটা যদি পুরোপুরি রাখতে হয়, সুতীর্থকে কনফিডেন্সে রাখতেই হবে। তোমাকে আমি বারবার বলেছিলাম, আমার বাড়িতে সুতীর্থ একটা থ্রেট। মৃন্ময়ীর ওর উপর একটা ডিপেনডেন্সি তৈরি হয়ে গিয়েছে। সুতীর্থ নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিল বাচ্চাটার দায়িত্ব নিতে। এক দম্পতির সঙ্গে কথাও বলে রেখেছে। বাচ্চাটা যদি একটা ওয়েল ফ্যামিলিতে প্লেস্ড হয়ে যায়, আমাদের কী ক্ষতি? প্রবীর দাশগুপ্তর কী

কিন্তু এখন আলটিমেটলি কী হবে, ভাবতে পারছি না ওম।"

ওমপ্রকাশ হাসল, "আমি বুঝতে পারছি না ডক, এই সমস্যা নিজেই তুমি এত মাথা খারাপ করলে ডিরেক্টর হয়ে তুমি কীভাবে হসপিটালের ব্যাপার-স্যাপার সামলাবে? এভাবে তুমি চালাতে পারবে না ডক। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের মতোই প্রফেশন্যাল লাইফটাও ফেল করে ফেলছ... হসপিটালটা আদৌ তুমি চালাতে পারবে কি না, আমাম রিয়েলি স্কেয়ার্ড ডক!"

অন্তরার মাথা টিপ-টিপ করছিল। ভিতরে একটা অজানা আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এই লোকটা, ওমপ্রকাশ গাড়োডিয়ার অলীলাক্রমে অন্তরাকে ছুড়ে ফেলতে কতক্ষণ সময় লাগবে? যাই হোক, ওমপ্রকাশ ছুড়ে ফেললেও মৃন্ময়ীকে নিয়ে কী করবে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে অন্তরা। সব পথের শেষেই নিজের সর্বনাশ দেখতে পায়। মৃন্ময়ীর কিছু হয়ে গেলে প্রবীর দাশগুপ্তর বউ ছেড়ে দেবে না। মৃন্ময়ীর মিসক্যারেজ হয়ে গেলে মৃন্ময়ী খুনের আঙুল তুলবে অন্তরার দিকে। মৃন্ময়ীর গোপনীয়তা জানাজানি হয়ে গেলে প্রবীর দাশগুপ্ত ছোবল চালাবেই। আবার ওমপ্রকাশের সায়ে সায় না দিলে নিজের পুঁজি, নিজের ভবিষ্যৎ সব জলাঞ্জলি যাবে!

আর সুতীর্থ! সুতীর্থ জানিয়েছিল ইচ্ছুক দম্পতির আগ্রহ এবং উৎসাহের কথা। সুতীর্থকে এখনই কিছু বলবে নাকি অপেক্ষা করবে আর ক'টা দিন, একটা ক্রোনিয়োনিক ভিলাই বায়োপ্সি করে কনফার্ম করা পর্যন্ত?

বৃহস্পতিবার, ১০ এপ্রিল

"হ্যালো সুতীর্থদা, অনুরাগ বলছি। দাদা, একটু কথা বলা যাবে?"

নাটকের রিহার্সালের মধ্যে ফোনটা পেল সুতীর্থ। অন্য-কারওর ফোন এলে এসময় কথাই বলত না সুতীর্থ। কিন্তু অনুরাগকে এড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করল না। গলাটা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ, বলুন।"

"দাদা, আমাকে আপনি-আপনি বলবেন না। আপনার সঙ্গে প্রিয়া একবার কথা বলার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে!"

অনুরাগের হাত থেকে ফোনটা একরকম কেড়েই নিল প্রিয়া। গদগদ গলায় বলল, "দাদা ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ ভাল। তোমাদের সব খবর ভাল?"

"হ্যাঁ ভাল," একটু ইতস্তত করে প্রিয়া বলল, "দাদা ওরা ভাল আছে?"

সুতীর্থ চোখ বন্ধ করে বুকের মধ্যে একটা তাজা শ্বাস পেল। বলল, "খুব ভাল আছে।"

প্রিয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এবার ফোনটা আবার কেড়ে নিল অনুরাগ, "দাদা, প্রিয়া কী পাগলামি আরম্ভ করেছে কল্পনা করতে পারবেন না। ছোট্ট-ছোট্ট বালিশ, বিছানা, মশারি, ন্যাপি যা হাতের কাছে পাচ্ছে, তাই কিনে যাচ্ছে। হা হা। যাক গে, দাদা আপনাকে একটু বলে রাখি, ভাল নার্সিংহোমের ব্যবস্থা দরকার হলে করে নেবেন। আমি সব খরচা দিয়ে দেব। আর-একটা কথা সুতীর্থদা, বউদিকে একটু জিজ্ঞেস করে নেবেন তো থ্যালাসেমিয়ার কথাটা..."

শুক্রবার, ১১ এপ্রিল

এটিএম মেশিন থেকে একটা বিপ-বিপ আওয়াজ হতে আরম্ভ করেছে। তিনলাখ টাকার খামবন্দি চেকটা ডিপোজিট রিসিভিং স্লটের মুখে ধরতেই খামটা ধীরে-ধীরে মেশিনের পেটের ভিতর চলে গেল। তারপর আর-একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ। পট করে ট্র্যানজ়াকশন স্লিপের কাগজটা বেরিয়ে এল।

'ডু ইউ নিড অ্যানাদার ট্র্যানজ়াকশন?' সুতীর্থ স্ক্রিনের উপরে 'নো' লেখাটার উপর আঙুল স্পর্শ করতেই এটিএম কার্ডটা মেশিনের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। পুরো প্রক্রিয়াটাই বেশ রুদ্ধশ্বাসে করল সুতীর্থ। আসলে এতবড় অ্যামাউন্টের চেক কখনও হাতে ছুঁয়ে দ্যাখেনি ও।

'ফ্লোরা' শব্দটাই নিজের দলের নাম হিসেবে শেষ পর্যন্ত রেখে দিয়েছে সুতীর্থ। সেদিন অখিলের সামনে বলার সময় নামটা ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনেক নাম পরে মনে হয়েছে, কিন্তু 'ফ্লোরা' নামটা কিছুতেই সরিয়ে দিতে পারেনি। ফ্লোরার জন্য টাকার ব্যবস্থা কীভাবে হয়েছে জেনে সুতীর্থকে অনুসরণ করে অসীমও চেয়েছিল নিজের পিএফের পুঁজি 'ফ্লোরা'-তে ঢালতে। কিন্তু সুতীর্থ কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। 'ফ্লোরা'-র সঙ্গে যে ঝুঁকি, যে সাবধানবাণী আছে, সেটা একাই বইতে চায়।

এটিএম থেকে বেরিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমালের পিছনে শুধু দেশলাইয়ের বাক্সতে হাত ঠেকল সুতীর্থর। সিগারেটের প্যাকেটটা শেষ হয়ে গিয়েছে। উলটোদিকের ফুটপাথে একটা সিগারেটের দোকান। সিগারেটের প্যাকেট কেনার পর টাকার সঙ্গে খুচরো পয়সা ফেরত দিতে সমস্যা হল দোকানদারের। দুটো লজেন্স দিল। হাতে টাকার সঙ্গে লজেন্স দুটোর দিকে চেয়ে একটুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গেল সুতীর্থ। তারপর দোকানদারের দিকে আবার ফেরতের টাকাটা এগিয়ে বলল, "একটা বড় চকোলেট দিন তো?"

"কোন কোম্পানির দেব? একটা বড় কাচের বাক্স দেখিয়ে দোকানদার বলল। বড় চকোলেটের এত রকমফের হয়ে গিয়েছে জানা ছিল না। সেই কোনকালে শেষ পাপানের জন্য কিনেছিল! তাই ভাল কোনটা সেই নির্বাচনটা দোকানদারের উপর ছেড়ে দিল। বুক পকেটে চকোলেটটা নিয়ে অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল সুতীর্থ। কথা ছিল আজ অসীমের সঙ্গে রিহার্সাল করার নতুন একটা বাড়ি দেখতে যাবে। বৈশাখ মাস থেকে এখনকার বাড়িটা আর পাওয়া যাবে না।

যমুনা ঘরে চা দিয়ে গেল। সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, "তোমার বউদি কি আজ বাড়ি ফিরবে?"

"ফিরবে তো বলে গিয়েছেন।"

"হুম!" একটু ইতস্তত করে সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল, "মৃন্ময়ী কোথায়?"

"উপরে..."

চা-টা শেষ করে সুতীর্থ বাড়ির মধ্যে দিয়ে দোতলা যাওয়ার সিঁড়ির দিকে পা রাখল। সুতীর্থর পিছন-পিছন যমুনা এসে খুব নিচু গলায় ডাকল, "দাদাবাবু..."

সুতীর্থ ঘুরে দাঁড়াতেই যমুনা অস্ফুটে বলার চেষ্টা করল, "আপনি দিদির ঘরে যাচ্ছেন, দিদিকে একটু বলবেন কিছু খেয়ে নিতে... ক'দিন ধরে কিচ্ছু খাচ্ছে না। পোয়াতি মানুষ... বউদি শুনলে খুব রাগ করবে।"

বহুদিন পর দোতলায় এল সুতীর্থ। জায়গাটা যেন অচেনা। হঠাৎ করে মনে পড়ে যাচ্ছিল একতলার ছাদ ঢালাইয়ের দিন। ঢালাইয়ের পর পাড় বাঁধিয়ে জল জমতে দেওয়া হয়েছিল। সেই জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে অন্তরার মাথাটা কাঁধে নিয়ে কত পরিকল্পনা করেছিল, দোতলাটা কেমন হবে!

দোতলার প্যাসেজে একটা আলো জ্বলছে। ডানদিকে অন্তরার বিশাল মাস্টার বেডরুম। বাঁদিকে পাপানের ঘর। পাপানের ঘরের সামনে এসে সুতীর্থ দেখল দরজাটা আধভেজানো। ভিতরটা অন্ধকার। সুতীর্থ বলল, "মৃন্ময়ী আছ?"

"ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠল। মৃন্ময়ী বলল, "এসো আঙ্কল।"

"তোমার কি ঘুম ভাঙালাম আমি?"

"না, না আঙ্কল," মৃন্ময়ীর মুখটা খুব শুকনো।

"তা হলে আলো জ্বালাওনি কেন? ঘরটা অন্ধকার করে রেখেছিলে!"

"বোসো না আঙ্কল।"

ছোট টেব্‌লের সামনে যে চেয়ারটা ছিল সেটা টেনে নিয়ে বসল সুতীর্থ। তারপর চকোলেটটা পকেট থেকে বের করে মৃন্ময়ীর দিকে

এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, এটা তোমার জন্য।"

"আমার জন্য? কেন?"

"এমনি!"

"থ্যাঙ্কস আঙ্কল।"

খুব ধীরে-ধীরে মোড়ক থেকে ক্যাডবেরিটা বের করে রাংতা ছাড়িয়ে এক টুকরো ভেঙে সুতীর্থর দিকে এগিয়ে ধরল মৃন্ময়ী।

"নাঃ, তুমি খাও। আমি চকোলেট খাই না," সুতীর্থ বলল।

মৃন্ময়ী জোর করল না। টুকরোটা মুখে পুরে চকোলেটে একটা বড় কামড় দিয়ে বলল, "হঠাৎ আমার জন্য ক্যাডবেরি আনলে কেন?"

"তোমার কাছে আমার একটা ঋণ হয়ে গিয়েছে। আমার নাটকের দলের নাম দিয়েছি ফ্লোরা।"

মৃন্ময়ীর মুখে একটা খুশির হাসি খেলে গেল, "নামটা কি আমার একলার নাকি? কিন্তু এত নাম থাকতে ফ্লোরা কেন?"

"কেন জানি না, একদিন একজন দুম করে জিজ্ঞেস করল, তোর দলের নাম কী? কোনও নাম ছিল না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা নাম বলতেই হত। দুম করে 'ফ্লোরা' নামটা মনে পড়ল। ওটাই বলে দিলাম।"

মৃন্ময়ী আর-এক টুকরো চকোলেট ভেঙে মুখে পুরে বলল, "আমাকেও অবশ্য মিষ্টি খেতে আন্টি একদম বারণ করে দিয়েছে।"

সুতীর্থ আঁতকে উঠল। তা হলে তো একটা বড় ভুল হয়ে গেল। চকোলেটটা মৃন্ময়ীকে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। মৃন্ময়ীকে থামানোর চেষ্টা করল, "তা হলে তুমি খাচ্ছ কেন? ফেলে দাও।"

মৃন্ময়ী পরের কামড়টা দিল, "আমার সুগার লেভেলটা যদি হাই হয়ে যায়, আন্টি ফ্লোরাকে আর..."

সুতীর্থ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, "তুমি একটা সত্যিকারের বোকা মেয়ে। অ্যাট লিস্ট তোমার এটা বোঝা উচিত সুগার লেভেল তোমার অর্গ্যানের ক্ষতি করতে পারে, এমনকী ফ্লোরারও। তোমাকে আমি সেদিন কী বলেছিলাম? ফ্লোরাকে ফুলের মতো মানুষ করবে এরকম একটা সুন্দর বাবা-মায়ের আমি খোঁজ রেখেছি। এর পরও তুমি ফ্লোরার ক্ষতি করছ?"

"তুমি জানো না আঙ্কল, আমার সোনোগ্রাফি করার পর আন্টি কী বলেছে? বলেছে ফ্লোরা পেটের মধ্যেই মরে যাবে। আমি জানি এটাই আন্টির আল্টিমেট লক্ষ্য। কিন্তু এটা আমি হতে দেব না আঙ্কল। আন্টির দেওয়া কোনও ওষুধ আমি খাব না। কিছুতেই আমি মিসক্যারেজ হতে দেব না!"

সুতীর্থ চমকে উঠল। এটা অন্তরার কোনও চাল? অন্তরার উপর সব বিশ্বাস হারিয়েও এই একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করেছিল সুতীর্থ। চোয়াল শক্ত করে বলল, "তুমি যদি তোমার ফ্লোরাকে বাঁচাতে চাও, কেউ তাকে মেরে ফেলতে পারবে না। আমি অন্তরার সঙ্গে কথা বলব।"

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল। মৃন্ময়ী সেই পুরনো ম্লান হাসিটা হেসে বলল, "আমার ফ্লোরার কী হবে জানি না, তবে তোমার ফ্লোরার জন্য আমার শুভেচ্ছা থাকল।"

একতলায় নামতে-নামতেই অন্তরাকে ফোন করে ফেলল সুতীর্থ।

"হ্যালো।"

"তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

একটু চুপ থেকে অন্তরা বলল, "বলো।"

"তুমি কোথায় এখন?"

"চেম্বারে। কেন?"

"মৃন্ময়ীর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

অন্তরা একটু চুপ থেকে বলল, "আমিও ওর সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কথা বলব ভাবছিলাম। আমার মনে হয় বাড়িতে কথা বলতে পারব না।"

সেই পুরনো কফিশপেই বসা ঠিক হল। জায়গাটায় সুতীর্থ আগেই পৌঁছে গেল। অন্তরা পৌঁছল কিছুক্ষণ পর। গুছিয়ে বসে নিচু গলায় বলল, "আগে তুমি বলো।"

সুতীর্থ চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে চোখ খুলে অন্তরার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটার বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি খেলছ?"

অন্তরার চোখটা মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠেও যেন নিভে গেল। বলে উঠল, "তুমিও তাই বিশ্বাস করো?"

সুতীর্থ মৃদু মাথা ঝাঁকাল, "যে-তোমাকে আমি চিনি, সেটাকে বিশ্বাস করেই আমি মৃন্ময়ীকে বার-বার বলেছি, তোমার আন্টি তোমার খারাপ করতে পারে না। যে-তোমাকে আমি চিনি, তার উপর বিশ্বাস করে আমি প্রিয়াকে কথা দিয়েছি... তুমি আমার কাছে কী চাও বাড়িটা? তাই এই খেলটা খেলে একটা খুনের সওদা করছ?"

"খুন যদি করতাম অনেক আগেই আমি দুটো খুন করে ফেলতাম। আর সওদা তার সঙ্গেই করা যায় সুতীর্থ, যার কাছে দেওয়ার মতো কিছু থাকে। জমির সত্ত্বটা আমার চাই না। আসলে তুমি আমাকে হিংসে করো। আমার সাকসেস তোমার সহ্য হয় না। যেহেতু তোমার দেওয়ার কিছুই নেই, আমি যদি বলি মৃন্ময়ীকে দিয়ে তুমি আমার উপর রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছ, আমি কি কিছু ভুল বলছি? মেয়েটা হঠাৎ অ্যাবর্শনের বিরোধী হয়ে গেল কেন? যমুনা বলেছে, মৃন্ময়ী মাঝে-মাঝে মাঝরাতে তোমার ঘরে যেত? তুমি কী ভাব, আমি কোনও খবর রাখি না? তবুও আমি একবারের জন্য হলেও একটা বাচ্চার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তোমাকে টলারেট করে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছি। আর এতকিছুর পর তুমি প্রশ্ন করছ, মেয়েটার বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি কি খেলছ?"

সুতীর্থ নিজের নার্ভগুলোকে শক্ত করে বলল, "আমিও যে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চাই যে, বাচ্চাটাকে নিয়ে তুমি খেলছ না," বহুদিন পর আলতো করে অন্তরার হাতটা ছুঁয়ে ফেলল সুতীর্থ, "কিন্তু তুমি মৃন্ময়ীকে বলেছ কেন, ওর বাচ্চাটা বাঁচবে না।"

অন্তরার চোখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটল। বলল, "কারণ এটাই সত্যি। বাচ্চাটার জেনেটিক অ্যাবনরম্যালিটি আছে। এডওয়ার্ড ডিজিজ। মৃন্ময়ীর বাচ্চাটার যা অবস্থা, মিসক্যারেজ হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। আর যদিও বা জন্ম হয়, বাচ্চাটা বাঁচবে না!"

সুতীর্থ চোখটা বন্ধ করে ফেলল। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "কোনও ট্রিটমেন্ট? আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা খুব আধুনিক, উদার। বাচ্চাটার যা-যা ট্রিটমেন্ট দরকার সব করিয়ে দেবে।"

"কোনও ট্রিটমেন্ট নেই সুতীর্থ। তা ছাড়া আমার এক্সপিরিয়েন্স অন্য কথা বলে। কেউ এগিয়ে আসবে না সুতীর্থ। আমার আফসোস একটাই, যদি আমি সময়ে সোনোগ্রাফি করে বুঝতে পারতাম, যদি সময়ে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা কালচার করতাম, তা হলে হয়তো চেষ্টা করলে মৃন্ময়ীকে অন্যভাবে ট্রিটমেন্ট করে বিবেকের একটুও সংযোগ না করে বাচ্চাটাকে মুক্তি দিয়ে দিতাম। বাট নাউ এভরিথিং ইজ টু লেট!"

শনিবার, ১২ এপ্রিল

"মৃন্ময়ী!" খুব নরম গলায় পাপানের ঘরের দরজায় এসে ডাকল সুতীর্থ।

"এসো আঙ্কল," খাটে আধশোওয়া হয়েই সুতীর্থকে ভিতরে ডাকল মৃন্ময়ী।

ঘরের ভিতর এসে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে মৃন্ময়ীর হাতটাকে নিজের দু' হাতের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীর গলায় বলতে আরম্ভ করল, "জীবনে মাঝে-মাঝে খুব কঠিন সত্যির মুখোমুখি..."

সুতীর্থকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মৃন্ময়ী বলে উঠল, "তুমি ফ্লোরার কথা বলবে তো আঙ্কল?"

"তোমার আন্টিকে ভুল বুঝো না। তোমার আন্টি সত্যিই সবকিছু ভাল চেয়েছিল।"

মৃন্ময়ী ম্লান হাসল, "আমি ভুল বুঝিনি, সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন বলেছ, সন্দেহটা কেটে গেল আঙ্কল। "তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করেছি আঙ্কল। আমি, ফ্লোরাও।"

সুতীর্থ মৃন্ময়ীর মাথায় হাত রাখল, "তোমার সামনে একটা লম্বা

সুন্দর জীবন পড়ে আছে মৃন্ময়ী...”

“হয়তো আছে। কিন্তু ফ্লোরার হয়তো নেই। যে ক'দিন ও বেঁচে থাকবে, ওকে কি একটা সুন্দর জীবন আমরা দিতে পারি না?”

চমকে উঠল সুতীর্থ। ঠিক এই প্রশ্নটাই আকুল হয়ে পার্থ-অনুরাগকে করেছিল সুতীর্থ। অনুরাগ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, “হিয়ার কোলে... এটা আপনি ভাবলেন কী করে সুতীর্থদা?”

“যদি তোমাদের বায়োলজিক্যাল...”

“সময়ে অ্যাবর্ট করে নিতাম। তা ছাড়া অ্যাডপশন একটা চয়েস সুতীর্থদা। আপনাকে বলেছিলাম সেক্স ম্যাটার করে না, ছোটখাটো সমস্যাও সামলে ফেলা যাবে, কিন্তু যে বাঁচবেই না... সুতীর্থদা আপনি কি একটু বেশিই এক্সপেক্ট করছেন না?”

“বাচ্চাটা যদি জন্মায়, যে ক'দিন বেঁচে থাকবে, সকলে মিলে একটুও ভালবাসা দিতে পারি না এই পৃথিবীতে?”

“উপায়টা আমার জানা নেই সুতীর্থদা। তা ছাড়া ক'দিন বাঁচবে সুতীর্থদা? একদিন, পাঁচদিন, দশদিন, একমাস, ছ'মাস, এক বছর... আমি আর প্রিয়া অ্যাডপশন কিউতে সেই সময়টা ওয়েট করতে পারি, কিন্তু এমনিতেই ডিসটার্বড লাইফটাকে আরও ডিসটার্ব করতে পারব না সরি। যেটা আমি করতে পারি হাজার দশেক টাকা...”

ভুল বুঝেছিল পার্থও। বলেছিল, “এটা একটা খুব আলটপকা ইমোশন্যাল ডিসিশন নিয়েছিস সুতীর্থ। এগুলো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা নিয়ে এগনোর আগে তোর আরও কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল! আরও ইনফরমেশন নেওয়া উচিত ছিল!”

একই প্রশ্ন সুতীর্থ করেছিল অন্তরাকে, “বাচ্চাটা যদি জন্মায়, যে-ক'দিন ও বেঁচে থাকবে ওকে কি একটা সুন্দর জীবন আমরা দিতে পারি না? মৃন্ময়ী না হয় আরও কিছুদিন থাকবে আমাদের বাড়িতে...”

অন্তরাও মুখটা নামিয়ে নিয়েছিল। মাথাটা আস্তে-আস্তে নাড়িয়ে বলেছিল, “কতদিন সুতীর্থ? বাচ্চাটা কতদিন বাঁচবে তাই তো জানি না। হয়তো কয়েকটা ঘণ্টা, কয়েকদিন, কয়েকমাস, বাচ্চাটার সঙ্গে অনেক রাজনীতি, বিজনেস জড়িয়ে আছে। ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর মৃন্ময়ীকে আর রাখা যাবে না। বাচ্চাটাকে ওর সঙ্গে রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না।”

“যে-ক'দিন ও বেঁচে থাকবে ওকে কি একটু সুন্দর জীবন আমরা দিতে পারি না?” প্রশ্নটা করে মৃন্ময়ী চেয়ে আছে। আশ্চর্য! সুতীর্থর মনে পড়ে যাচ্ছে কাফকার কথা। মেটামরফসিসে কাফকা কি এই প্রশ্নটাই করতে চেয়েছিলেন যে, অনভিপ্রেতভাবে একজন কীটে রূপান্তরিত মানুষ যে-ক'দিন বেঁচে ছিল সে কি একটুও ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য ছিল না?

সুতীর্থ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃন্ময়ীকে বলল, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও পৃথিবীর ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকবে।”

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মৃন্ময়ীর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নিজের স্ফীত পেটটার দিকে চেয়ে বলল, “তোকে কী বলেছিলাম ফ্লোরা? আঙ্কল ভীষণ ভাল। আঙ্কল ভীষণ ভাল নাটক লেখে। আঙ্কল তুমি শোনাও না ফ্লোরাকে তুমি যে নাটকটা লিখছ...”

সুতীর্থ মৃন্ময়ীর পেটের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নাটক। রূপান্তর। শেষ দৃশ্যটা মনে পড়ছে। বার-বার মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করছে শেষ দৃশ্যটা।

“বলো না আঙ্কল!”

মৃন্ময়ীর কথায় খানিকটা আপ্লুত হয়ে সুতীর্থ বলতে থাকল, “তোমাদের কী শোনাই বলো তো? শোনানোর মতো খুব কম কথাই আছে আমার কাছে। কাফকার কয়েকটা লাইন শুনবে... ‘আস্তাবল থেকে আমি আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে আসতে বললাম। চাকরটা আমার কথা বুঝতে পারল না। সুতরাং আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলাম। হঠাৎ আমি দূর থেকে শুনতে পেলাম এক তূর্যনাদ। আশ্চর্য হয়ে চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে বাজাচ্ছে রে? কী মানে ওই বাজনার? চাকরটাও আশ্চর্য হয়ে আমাকে বলল, কই না তো আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললাম। গেটের কাছে চাকরটা দৌড়ে এসে বলল, প্রভু কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। জাস্ট আউট অফ হিয়ার। আউট অফ হিয়ার নাথিং এলস। ইট ইজ দি ওনলি ওয়ে আই রিচ মাই গোল। চাকরটা জিজ্ঞেস করল, তা হলে আপনি আপনার লক্ষ্য জানেন? আমি বললাম, নিশ্চয়ই। আমি তোকে বললাম না, আউট অফ হিয়ার... দ্যাট ইজ মাই গোল।’”

সংবিৎ ফিরল সুতীর্থর। মৃন্ময়ীকে এসব কী শোনাচ্ছে? মেয়েটা অদ্ভুত একটা মুখ করে তাকিয়ে আছে। সুতীর্থ উঠে পড়ে মৃন্ময়ীর মাথায় আর-একবার হাত বুলিয়ে বলল, “ফ্লোরার জন্য যতটা সুন্দর জীবন আমি দিতে পারব, তার আপ্রাণ চেষ্টা করব।”

রবিবার, ১৪ এপ্রিল

“দাদা, পরের সিনটা দেখে নিন। রেবা পশ্চিম দিক থেকে ঢুকবে। বিমান দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে থাকবে, কল্পনা সাইডওয়াইজ। আত্রেয়ী কোনাকুনি দাঁড়িয়ে থাকবে... ওকে দাদা, শুরু করছি...”

সুতীর্থ গম্ভীর হয়ে চেয়ারে বসে অসীমের কথা শুনছিল। রেবা, বিমানরা যে যার জায়গা নিয়ে নিল। দৃশ্যটা শুরু হল। রেবা কাজের মেয়ের ভূমিকায় বড় একটা ঝাড়ু হাতে পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে এসে মিস্টার সামসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “মরে গিয়েছে। মরে একেবারে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে।”

মিস্টার সামসা দাঁড়িয়ে উঠে বিস্ফারিত গলায় বলল, “মরে গিয়েছে,” তারপর খুব স্বস্তিদায়ক গলায় বলল, “যাক বাবা। ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে চাইলেন। চল, একবার নিজের চোখে দেখে আসি।”

“দাদা, এবার পরের সিনটা...”

সুতীর্থ হাত তুলে অসীমকে ডেকে বলল, “অন্যদের কন্টিনিউ করতে বলো। তুমি একটু বাইরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রিহার্সাল করার বাড়িটার বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুতীর্থ বলল, “তোমাকে একটা কথা বলার ছিল অসীম। আমি এই নাটকটা থেকে ছুটি চাই!”

“মানে?” অসীমের চোখ কপালে উঠে গেল, “দাদা, কী বলছেন আপনি? ২৮ তারিখে শিশির মঞ্চে প্রথম শো...”

“আমি তো তোমাকে বলছি না যে, অসীম নাটকটা হবে না। যেভাবে হচ্ছিল ঠিক সেভাবেই হবে। তুমি খুব ভাল ডিরেকশন দিচ্ছ। পয়সাকড়ি যা ফ্লোরার অ্যাকাউন্টে আছে, সেরকমই থাকবে। শুধু এবার আমাকে ছুটি দাও।”

“কী হল দাদা আপনার? শরীর খারাপ?”

“গ্রেগর সামসার আড়াল-আবডালে পতঙ্গ জীবন আর তার পরিণতি আমি আর দেখতে পারছি না অসীম, তোমরা আমাকে প্লিজ ছুটি দাও।”

“আগাম শুভ নববর্ষ বড়ালদা,” বহুচেষ্টায় পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা অমল বড়ালকে ধরতে পেরে বীরেশ্বর মজুমদার গদগদ গলায় বলল।

“তোমার জন্য নববর্ষটা কতটা শুভ থাকবে, সেটা বলতে পারছি না মজুমদার। ঘোর সংক্রান্তি আজ!”

“কেন দাদা?” বীরেশ্বর মজুমদারের গলাটা শুকনো লাগল।

“তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, প্রবীর দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে তোমার হালফিলের রেকর্ড খুব খারাপ। তা ছাড়া যে সিটে শরীকদের সঙ্গে আমাদের দর কষাকষি চলছে, সেখানে দলের অনুমোদন না নিয়েই আগেভাগে ফ্লেক্স টাঙিয়ে ফেলেছ। শরীকরা তো এটাকে ইসু করে বসে আছে। শোনো, ওদের অন্য ক্যান্ডিডেট হলে তাও একটা চান্স ছিল। প্রবীর দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে তোমার কোনও চান্সই নেই। আজকে সব ফাইনাল হয়ে যাবে। কাল পয়লা বৈশাখ ঘোষণা হয়ে যাবে, প্রেস কনফারেন্সে।”

"শুনুন বড়ালদা," কাতর হয়ে বলে উঠল বীরেশ্বর মজুমদার, "আমাকে আর-একটা দিন সময় দিন। গ্যারান্টি দিচ্ছি প্রবীর দাশগুপ্তর প্রার্থীপদ ওরা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হবে।"

ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার আগে ওপাশ থেকে উচ্চস্বরে হেসে উঠে বড়ালবাবু বললেন, "তুমি কি ওদের পার্টি জয়েন করছ নাকি? এত কনফিডেন্টলি বলছ..."

ফোনটা ছেড়েই কালবিলম্ব না করে আর-একটা ফোন করে বীরেশ্বর মজুমদার বলল, "আজ রাতে অপারেশনটা শেষ করে দে!"

সোমবার, ১৫ এপ্রিল

এই নিয়ে চারবার আমতলা এল রূপক। প্রথমবার শ্যামলীকে পছন্দ করতে আসা। সেবার বাসস্ট্যান্ড থেকে ওদের বাড়ির লোক নিতে এসেছিল। দ্বিতীয়বার বিয়ের দিন। সেবার ফুলে সাজানো গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল শ্যামলীদের বাড়ি থেকে। তারপর অষ্টমঙ্গলার সময়। সেবারও শ্যামলীর বড়দা আর খুড়তুতো ভাই বাসস্ট্যান্ডে এসেছিল নিতে। আর এই চতুর্থবার। একা আচমকা।

বাসস্ট্যান্ড থেকে শ্যামলীদের বাড়ি পালপাড়া অনেকটাই পথ। সুতরাং একটা রিকশা নিতেই হল। সারাটা বাস ভয়ে-ভয়েই এসেছে রূপক। কে জানে কখন মুখচেনা কার সামনে পড়ে যায়! আর সেই খবর প্রবীর দাশগুপ্তর কানে পৌঁছতে মুহূর্তকাল লাগবে না!

রূপকের এই ছুটিটা মঞ্জুর করেছে মৃন্ময়ী। শুধু ছুটি মঞ্জুর করাই নয়, সেইসঙ্গে একরকম ঠেলেই পাঠিয়েছে রূপককে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা করে আসতে। রূপক শুধু শুকনো মুখে বলে ফেলেছিল শ্যামলীদের বাড়ির হালখাতার নেমন্তন্নর কথা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবীর দাশগুপ্তকে বলেছিল ছুটির কথা, কিন্তু লোকটা টলেনি। রূপক কিছুতেই বুঝে পায়নি একদিন ছুটি দিলে কী এসে যেত? ট্যাক্সি করে পিংপংকে যখন আরামবাগে রাখতে গিয়েছিল, তখনও তো একরাত ছিল না। মৃন্ময়ী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। দিদিকে একটু-একটু করে দিনে-দিনে পালটে যেতে দেখেছে রূপক। মৃন্ময়ী বলেছিল, "তুমি যাও তো রূপকদা, ঘুরে এসো। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।" রূপক তবু দোনামনা করেছিল। প্রবীর দাশগুপ্ত যে-কোনও সময় মোবাইলে ফোন করতে পারে। মৃন্ময়ীই বুদ্ধি দিয়েছিল, "মোবাইলে তো বাবা আর তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তুমি কোথায় আছ। দুনিয়ার লোককে যখন মিথ্যা কথা বলে এসেছ যে, তুমি মুম্বইয়ে আছ, তখন বাবাকে একবার মিথ্যে কথা বললে কিছু এসে যাবে না।" একদিকে আশঙ্কা, অন্যদিকে শ্যামলীকে কাছে পাওয়ার দুর্বার আকর্ষণ, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়টাকেই মন তীব্রভাবে প্রভাবিত করে ফেলেছিল। সল্টলেকের করুণাময়ী থেকে একেবারে সকাল-সকাল বাস ধরে নিয়েছিল রূপক। আর সকাল সাতটার মধ্যেই পৌঁছে গেল আমতলা।

পয়লা বৈশাখের সকালটা একেবারে অন্যরকম। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার। দোকানগুলোর সামনে গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে। পাটের ধুতি, নতুন গেঞ্জি বা ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবিতে দোকানিরা, সব মিলিয়ে পৃথিবীটা যেন অন্যরকম। তার মধ্যেই রূপকের অন্য-একটা চিন্তা মাথায় এল, মুম্বই থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে কিছুই নেই, একেবারে খালি হাত।

মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধি বের করল রূপক। শ্বশুরবাড়িতে বলবে, এক বন্ধুর সঙ্গে মুম্বই থেকে ফিরছিল। ভোরবেলাতে তার হাত দিয়েই বড় সুটকেসটা গৌরবপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে। সকলের জন্য অনেক-অনেক জিনিস এনেছে। আর-একদিন এসে সব দিয়ে যাবে। আপাতত...

একটা মিষ্টির দোকানে রিকশাটাকে দাঁড়াতে বলল রূপক। পয়লা বৈশাখ মিষ্টির দোকানে বেশ ভিড়। কাচের শো-কেসে থরে-থরে নানারকম মিষ্টি। শ্যামলী কাজু-বরফি খেতে খুব ভালবাসে। একশো টাকার কাজু-বরফি আর এক কেজি রাবড়ির অর্ডার দিয়ে ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকল।

দোকানে একটা চোদ্দো ইঞ্চির টিভিতে খবর চলছে। দক্ষিণের পয়লা বৈশাখের অবস্থার খণ্ডচিত্র দেখানোর পরই পরের খবরটা চমকে উঠল রূপক।

'গতকাল রাত দশটা নাগাদ সল্টলেকের এগারো নম্বর [illegible] কাছে এক রুটির দোকানে কিছু গুন্ডা তাণ্ডব চালায়। ঘটনায় দোকানের একজন কর্মচারী ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, দুষ্কৃতিরা মদ্যপ ও বহিরাগত ছিল এবং রূপক নামে এক যুবকের খোঁজ করছিল..."

রূপক ভিতরে-ভিতরে ঘামতে থাকল। টিভিতে জগার দোকানের ভিতর দেখাচ্ছে। পুরো ভাঙচুর চলেছে। ক্যামেরায় জগার আহত মুখটা ধরা পড়ল। জগা কাঁপা-কাঁপা গলায় ঘটনার বিবরণ দিতে থাকে। 'রাত্তির তখন দশটা হবে। একটা নীল রঙের মারুতি ভ্যান ওখানে এসে দাঁড়াল। মুখে রুমাল বেঁধে চারটে ছেলে ঝপঝপ করে নেমে এসে মুখ খারাপ করে বললে, রূপক কোথায়? বের কর ওকে। আমি বললাম, ও নামে তো কাউকে চিনি না। আবার খিস্তি করতে থাকে। কোনও এক ডাক্তার দিদিমণির নাম বললে। সত্যেন বললে, এখানে তো এই নামে কাউকে চিনিনে, বাড়ির নম্বর বলো। বলতেই একটা ছেলে সত্যেনের পেটে চাকু চালিয়ে দিল...'

রূপকের পা কাঁপছে। কোনওরকমে রিকশার দিকে টলতে-টলতে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে মিষ্টির দোকানের কর্মচারী ততক্ষণে হাঁক দিতে শুরু করেছে, "ও দাদা, ও দাদা, আপনার বরফি আর রাবড়ি..."

রিকশাতে উঠেই রূপক হুডটা তুলে দিল। পলিথিনের পরদাটা সামনে টেনে নিল। রুদ্ধ শ্বাসে রিকশাওয়ালাকে বলল, "ভাই, পালপাড়া... তাড়াতাড়ি... জলদি।"

এতদিন পর সাত সকালে ভূতগ্রস্ত রূপককে দেখে শ্যামলী একই সঙ্গে ভীষণ খুশি আর ভয়ও পেল। রূপক উঠোন ছাড়িয়ে দালানে পা রাখল না। ভীষণ একটা ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, "মা..."

"কী হয়েছে?" প্রায় সকলেই সমস্বরে বলে উঠল।

রূপক সামলে উঠে বলার চেষ্টা করল, "শ্যামলী, এখনই আমাদের যেতে হবে।"

শ্যামলীদের বাড়িতে একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। মা যে হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং শ্যামলীকে নিয়ে তখনই গৌরবপুরের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে, রূপক সেটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। শ্যামলী দ্রুত তৈরি হয়ে গেল।

রিকশাটা দাঁড় করিয়েই রেখেছিল রূপক। শ্যামলীকে নিয়ে রিকশাটা চলতে আরম্ভ করলেই, শ্যামলী জিজ্ঞেস করল, "কখন গৌরবপুর পৌঁছব?"

"আমরা গৌরবপুর যাচ্ছি না।"

"মানে... মা..."

"কিছু হয়নি মায়ের, কিন্তু আমাদের ভীষণ বিপদ। ওরা যখন সল্টলেকে পৌঁছে গিয়েছে, এখানে পৌঁছতেও বেশি সময় লাগবে না।"

"ওরা মানে কারা?" শ্যামলীর গলা শুকিয়ে এল।

"উজ্জ্বল চাকলাদাররা।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"জানি না। কিন্তু এমন কোথাও, যেখানে উজ্জ্বল চাকলাদাররা আমাদের খুঁজে পাবে না।"

রূপক মোবাইলটা বের করল। ডঃ অন্তরা পাল চৌধুরীর বাড়ির ফোন নম্বরটা আছে। কোন জাদুতে কে জানে নিজের মোবাইল থেকে শ্যামলীর মোবাইলে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যমুনাকে ম্যানেজ করে কয়েকদিন ড. অন্তরা পাল চৌধুরীর বাড়ির ফোন থেকে শ্যামলীকে ফোন করেছে। ওই নম্বরে একটা ফোন করতেই হবে। দিদির সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না। দিদিকে বলবে যে, ওরা খোঁজ পেয়ে গিয়েছে দিদি, তুমিও পালাও।

মঙ্গলবার, ১৬ এপ্রিল

সন্ধেবেলায় বীরেশ্বর মজুমদারের পার্টি অফিসটা একেবারে থমথমে। একটু আগে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে টিভিতে লাইভ দেখাচ্ছিল প্রেস কনফারেন্স। ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ এবং বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থীপদগুলোর ঘোষণা হয়ে গেল। গৌরবপুরে প্রার্থী মনোনীত হয়েছে শরীক দলের বিমল দাস। নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বীরেশ্বর মজুমদার টিভিটা অফ করে দিয়ে মোবাইলে ফোন করছিল অমল বড়ালকে। কিন্তু সুইচড অফ। মেজাজটা আরও বিরক্তি হয়ে গেল বীরেশ্বরের। সব রাগটা গিয়ে পড়ল সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকা একটা ছেলের উপর। মাটিতে থুক করে পানের পিক ফেলে চিৎকার করে উঠল, "তোদের মধ্যে যে-ই গদ্দারি করে থাকিস, পার পাবি না।"

ছেলেটা মাথা তুলল। কাল থেকে বীরেশ্বর মজুমদারকে যা বুঝিয়ে বলতে পারেনি, তা আবার বলার চেষ্টা করল, "সত্যি বীরেশ্বরদা..."

"সত্যি-মিথ্যে আমাকে শেখাতে আসিস না। ষোলো বছর বয়স থেকে রাজনীতি করছি। কোনটা কাকতালীয় আর কোনটা চুকলিবাজি, আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার। কাল থেকে কী বোঝাতে চাইছিস আমাকে? ড্রাইভারটা চারমাস ধরে রোজ যে হোটেলে খেতে যেত, বেছে-বেছে কাল রাতেই গেল না। আগে থেকে খবর না থাকলে ড্রাইভারটা রাতে এল না কেন? তারপরই সে হাওয়া? বউটাও বাপের বাড়ি যাওয়ার নাম করে হাওয়া? আর প্রবীর দাশগুপ্তর মেয়েটা..."

উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে-বলতে খানিকটা জর্দা মুখে চালান করে বিষম খেয়ে বীরেশ্বর মজুমদার আর কথা শেষ করতে পারল না।

বুধবার, ১৭ই এপ্রিল

"এসব কী চলছে ডক?" অন্তরা ফোনটা ধরতেই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওমপ্রকাশ গাড়োডিয়া বলে উঠল।

"আই হ্যাভ নো আইডিয়া।"

"মানে? মৃন্ময়ী আর ড্রাইভারটা কোথায় গেল তোমার কোনও আইডিয়া নেই? প্রবীর দাশগুপ্ত একেবারে খেপে লাল। চব্বিশ ঘণ্টা টাইম দিয়েছে আমাকে।"

"পুলিশে ডায়েরি করতে বলো।"

"আর ইউ ম্যাড ডক? তুমি ভাল করেই জানো, এই কেসটা নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া যাবে না।"

"আর আমরা কী করতে পারি ওম?"

ওমপ্রকাশ মুখ খারাপ করে বলল, "তুমি এত কুল আছ কীভাবে? বাই দ্য ওয়ে তোমার বর ব্যাপারটাতে ইনভলভ্ড নয় তো? তোমাকে গুছিয়ে হার্ড টাইম দেওয়ার জন্য?"

"হতেও পারে। তুমি তো জানো, আমার বর মাঝে-মাঝেই নাটক নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। কখনও তিনদিন, চারদিন পর বাড়ি ফেরে। মোবাইল সুইচড অফ করে রাখে। কোথায় যায়, আমার কোনও আইডিয়া নেই। আর প্রথমদিনেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার বর মৃন্ময়ীর ব্যাপারে একটা থ্রেট।"

"ওফ নো! দাশগুপ্তকে আমি কী বলব?"

"প্রবীর দাশগুপ্ত কি কোনওদিন কেয়ার করেছে ওর মেয়ে বাঁচবে না মরবে? লোকটা শুধু একটা জিনিসকেই ভয় পেয়েছে, মেয়েটা যেন ভরা পেট নিয়ে গৌরবপুরে না হাজির হয়! কাল সকাল থেকে আজ রাত, এতক্ষণ সময় পর্যন্ত মেয়েটা এখান থেকে গৌরবপুরে গিয়ে হাজির হয়নি, তখন আশা করি, মেয়েটা নিজেই নিজের একটা আড়াল খুঁজে নিয়েছে।"

"হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট। তুমি এমনিতেই সব মেস করে বসে আছ। এভাবে ম্যানেজমেন্ট ফেল করলে, সরি টু সে, তোমাকে ডিরেক্টর হিসেবে আমি ভাবতেও পারছি না!"

"ইয়েস ওম! আমি তোমার বিজনেস, তোমার ইনভেস্টমেন্ট আর স্পয়েল করতে চাই না। আয়্যাম সিক অ্যান্ড টায়ার্ড অফ এভরিথিং!"

ওমপ্রকাশের ফোনটা ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে অন্তরা আর-একটা ফোন করল।

"হ্যালো রাজীব, মেয়েটার প্রেশার কেমন আছে?"

"সকালে যা দেখেছিলাম তাই। শোন অন্তরা, কাল থেকে মাথায় একটা জিনিস ঘুরছে। যে লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে, লোকটা কে রে? চেনা চেনা লাগছে!"

"পরে তোকে সব বলব।"

"সামনে পেশেন্ট আছে নাকি?"

অন্তরা বাড়ির আসবাবগুলোর দিকে চেয়ে উদাস গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে চালিয়ে যা। এদিক নিয়ে কোনও চিন্তা করিস না। আমার হসপিটাল কাম রিসার্চ সেন্টারের চারদিকে একটা ডাউনস্ট্রিম ব্যবসা গজিয়ে গিয়েছে বুঝেছিস! যারা দূর-দূরান্ত মফস্‌সল থেকে আসে এক-দু'মাসের জন্য, টানা থেকে ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের জন্য আসে, তাদের জন্য এক-দু'মাসের শর্ট টার্মে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। সেরকমই একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তবে টি ১৮ তো, যা ইনভেস্টিগেট করেছি, যদি বাচ্চাটা সারভাইভ করে, ফার্স্ট উইক অফ জুন পর্যন্ত গড়াবে না!

সোমবার, ৫ মে

অস্থির হয়ে পায়চারি করতে-করতে অন্তরাকে ফোনটা করেই ফেলল সুতীর্থ।

"ওরা মৃন্ময়ীকে তৈরি করছে।"

অন্তরা শান্ত গলায় বলল, "জানি। রাজীব ফোন করেছিল।"

সিগারেট খেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু হাসপাতালের মধ্যে সিগারেট খাওয়া যাবে না। ওপ্রান্তে অন্তরা চুপ করে আছে। লাইনটা কেটে দেয়নি। পাপান যেদিন হয়েছিল সেদিনের চেয়েও যেন বেশি টেনশন হচ্ছে! একটা শ্বাস নিয়ে সুতীর্থ বলল, "তুমি কি আসবে?"

"না! গিয়ে আর কী করব? রাজীব নিজে দেখছে। তবে তোমার গলাটা যা শোনাচ্ছে, মেয়েটার সামনে শক্ত থাকার চেষ্টা করো। তিন সপ্তাহ ধরে সবকিছু ছেড়ে যেভাবে তুমি মেয়েটাকে আগলে পড়ে আছ, এর পরের ব্যাপারগুলোয় ইমোশন্যাল হয়ে যেয়ো না। তোমাকে একটা ব্যাপার বার-বার বলে দিচ্ছি, বাচ্চাটা ডেলিভারির পর বেঁচে থাকলেও মৃন্ময়ী যদি বাচ্চাটাকে দেখতে চায়, কিছুতেই দেখতে দেবে না। আর মৃন্ময়ীর মাকে খবর দিয়েছি। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। তারপর যেদিন রাজীব মৃন্ময়ীকে ডিসচার্জ করে দেবে, ওর মা ওকে নিয়ে আরামবাগ চলে যাবেন।

অন্তরা চুপ করে গেল। তবে এবারও লাইনটা কেটে দিল না। সুতীর্থ আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আমি কি পারব অন্তরা?"

"যাদের জীবনে কোনও উচ্চাশা থাকে না, তারা অনেককিছুই পারে সুতীর্থ।"

কথাটা বলেই দুম করে লাইনটা কেটে দিল অন্তরা। টেনশনটা অসহ্য পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এবার বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট না খেলেই নয়। ওয়ার্ডের প্যাসেজের বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ব্যস্ত হয়ে একজন সিস্টার দৌড়ে এসে বলল, "আপনি লিপি গাঙ্গুলীর বাড়ির লোক তো?"

"হ্যাঁ," মৃন্ময়ীর এই নামটার সঙ্গে তিন সপ্তাহে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সুতীর্থ।

"রাজীব স্যার আপনাকে ডাকছেন।"

ড. রাজীব দত্তর চেম্বারে এল সুতীর্থ। রাজীব বসতে বলে বলল, "দেখুন মিস্টার গাঙ্গুলি, অন্তরা আমার ক্লাসমেট। ও যেভাবে আপনার ভাইঝির কেসটা রেফার করে দিয়েছে, আমি আগাগোড়া স্পেশ্যাল

কেয়ার নিয়ে দেখেছি। তার একটা কারণ যদি অন্তরা হয়ে থাকে, আর-একটা কারণ হচ্ছে বেবিটার এডওয়ার্ড ডিজিজ। বেবিটার হার্ট, লাংস, কিডনির যা কন্ডিশন আমরা পেয়েছি, তাতে বাচ্চাটি বাঁচবে না। হয়তো ডেলিভারির পর কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েকদিন বাঁচবে। অন্তরা আমাকে বলেছে যেহেতু এটা একটা আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি, তাই আমি যেন বাচ্চাটাকে ওর মাকে না দেখাই। তো আপনাকে ঠিক করতে হবে যে, আপনি ব্যাপারটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন।"

সুতীর্থ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করল। তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "আমি শুধু একটা জিনিস চাই ডক্টর। আমাদের সমাজের কোনও রাইট নেই পৃথিবীতে একটা আগত প্রাণকে আনওয়ান্টেড, অবাঞ্ছিত বলার। আমি চাই বাচ্চাটা যতক্ষণ এই পৃথিবীতে থাকবে, সে যেন আনওয়ান্টেড না হয়ে থাকে। সে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে সে যেন বেস্ট কমফর্ট পায়, সে যেন আমাদের সকলের ভালবাসা পায়, তার যেন মনে না হয় আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই! জাস্ট আউট অফ হিয়ার! আউট অফ হিয়ার নাথিং এলস। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ দিস প্লেস!"

ড. রাজীব দত্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, "অন্তরা আমাকে বলেছে আপনি ভীষণ ইমোশন্যাল। ওকে, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব, বাকিটা তো জানেন... লিপিকে দশটায় লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছি। তার আগে আপনি যদি চান ওর সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে পারেন।"

ড. রাজীব দত্তর চেম্বার থেকে গোটা পথটা টলতে-টলতে মৃন্ময়ীর কেবিনের সামনে এসে সুতীর্থ দেখল কেবিনটা ফাঁকা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল সিস্টারদের ডেস্কের দিকে। আর সেখানেই ঘড়িটা দেখে বুকটা কেঁপে উঠল। দশটা দশ। মৃন্ময়ীকে এখন কোথায় পাব?

"সিস্টার, লেবার রুমটা কোনদিকে?"

"কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ! লেবার রুমটা কোনদিকে?"

সিস্টার মুচকি হাসল। জান্তবের মতো কেঁপে উঠল ঠোঁটটা। তারপর হাসি মুখটা ঘুরিয়ে নিল। সুতীর্থর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন বেজে উঠল কাফকা — 'খুব ভোরে, তখন রাস্তা পরিষ্কার আর জনমানবশূন্য, আমি স্টেশনের দিকে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা বড় ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। আমি দেখলাম, আমি যা সময় ভাবছিলাম বড় ঘড়িটা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। চমকে উঠে এই উপলব্ধি আমার ভিতর সব তালগোল পাকিয়ে দিল। আমি শহরটাকে এখনও খুব ভালভাবে চিনে উঠতে পারিনি। ভাগ্যক্রমে হাতের কাছে একজন পুলিশকে পেয়ে গেলাম। হাঁফাতে-হাঁফাতে তার কাছে দৌড়ে গিয়ে রাস্তার দিকটা জানতে চাইলাম। পুলিশ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? আজ্ঞে হ্যাঁ! উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বলতে থাকলাম, রাস্তাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! পুলিশ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, যেন একাই নিজের সঙ্গে নিজে হাসতে চান।'

সিস্টার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উদভ্রান্তের মতো সিস্টারের দেখানো আঙুলের দিকে দৌড়তে থাকল সুতীর্থ। হাঁফ ধরে যাচ্ছে। একটা সিগারেট খেতে প্রাণ আনচান করছে। তবু হাসপাতালের প্যাসেজ ধরে দৌড়তে থাকল সুতীর্থ।

চার বছর পরের এক বুধবার, ১৫ অগস্ট

'ঘেউ ঘেউ!' কুকুরটার ডাক শুনে মুখ ফেরাল সুতীর্থ। লাটাগুড়ির এই রিসর্টে একটা কটেজের বারান্দায় কুকুরটা জবুথবু হয়ে সুতীর্থকে দেখে এরকম কেন আকুল হয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করে চিৎকার করছে, ভেবে পেল না সুতীর্থ। তবে এই অপরিচিত সারমেয়র ডাকটার মধ্যে কোথায় যেন একটা আকুলতা ছিল। বৃষ্টিটা উপেক্ষা করে কটেজের বারান্দার কাছে এগিয়ে গেল সুতীর্থ।

'ঘেউ ঘেউ' করে কুকুরের ডাকটা এবার আদুরে কুঁই-কুঁই হয়ে গেল। সাদা রোমশ কুকুরটার বয়স হয়েছে। সুতীর্থ কুকুরটার কাছে ঝুঁকে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে তোর?"

কুকুরটা উঠে এসে সুতীর্থর পায়ে গা ঘষতে থাকল। এমন সময় কটেজের বারান্দার পিছন দিকে ঘরের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে এক যুবতী বিস্ফারিত চোখে বলে উঠল, "আঙ্কল তুমি?"

চোখে চশমা। সিঁথিতে এক চিমটে সিঁদুরের আভাস। মৃন্ময়ীকে চিনতে একটু সময় লাগল সুতীর্থর। তারপর নিজেরও সমস্ত বিস্ময় এক জায়গায় জড় করে বলল, "তুমি মৃন্ময়ী না?"

চোখ থেকে চশমাটা খুলে মৃন্ময়ী বলল, "তুমি আমাকে চিনতে পারছ না আঙ্কল?"

"তোমার চশমাটার জন্য..."

মৃন্ময়ী চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল। চোখে খুব প্রিয়জনকে খুঁজে পাওয়ার উচ্ছ্বাস। সুতীর্থর হাতটা ধরে অল্প টানল, "দেখেছ, বয়স হয়ে চোখে ছানি পড়েও পিংপং কেমন তোমাকে চিনে ফেলল। এসো আঙ্কল। কতদিন পর... জানো তোমাকে আমি কত খুঁজেছি। এবার তোমাকে ছাড়ছি না। চা খাও। চা খেতে তো তুমি খুব ভালবাসতে। সিগারেটটা ছেড়েছ?"

"ছেড়ে দিয়েছি মৃন্ময়ী। অনেককিছুই ছেড়ে দিয়েছি।"

সুতীর্থর শেষের হেঁয়ালিটা মৃন্ময়ী গায়ে মাখল না। কটেজের বারান্দায় বেতের চেয়ার। হাতটা ধরে চেয়ারে এনে বসিয়ে দিল সুতীর্থকে। তারপর নিজে উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলল, "তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছ আঙ্কল? তোমার মোবাইল নম্বরটা পালটে ফেলেছ। তোমাদের সল্টলেকের বাড়িটা একটা কোম্পানিকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছ। তারা এমন অসভ্য কিছুতেই তোমার ঠিকানা বলল না। বলল, মালিক কানাডায় থাকে। তুমি কি সত্যিই কানাডায় থাক এখন?"

"আমি না। তোমার আন্টি। আমার ছেলে চাকরি পেয়ে ওখানে সেট্‌ল করে গিয়েছে। অন্তরাও ঠিক করে ফেলল ওখানে চলে যাবে। যাওয়ার আগে বাড়িটা ভাড়া দেওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ও-ই করে দিয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে তুমি কোথায় থাক? তোমার অফিস..."

"চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি মৃন্ময়ী। বাড়িভাড়ার যে একটা অংশ পাই, তাতে দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমি এখন আমার এক বন্ধু আর তার বোনের কাছে থাকি।"

"আর তোমার নাটক... ফ্লোরা..."

শব্দটা দু'জনের ভিতর এক নৈঃশব্দ্য এনে দিল। বাইরে যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল, সেটা যেন হঠাৎ করে বাতাসকে আরও গুমোট করে দিল। মৃন্ময়ী মাথাটা নামিয়ে ফেলেছে। সুতীর্থর দৃষ্টিটাও ঝাপসা হয়ে এল।

শেষপর্যন্ত রাস্তার দিকটা খুঁজে পেয়েছিল সুতীর্থ। হাঁফাতে-হাঁফাতে দৌড়ে পৌঁছেছিল ট্রলিটার কাছে। কচি কলাপাতা রঙের চাদর টানা ছিল মৃন্ময়ীর বুক পর্যন্ত। মুখটা যন্ত্রণায় নীল হয়েছিল। সুতীর্থকে দেখতে পেয়ে সেই নীল মুখটা আকুল হয়ে উঠেছিল। চাদরের তলা থেকে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে বলেছিল, "আঙ্কল... ফ্লোরা..."

মৃন্ময়ীর ঘেমে ওঠা কপালে হাত রেখে সুতীর্থ বলেছিল, "তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মা আসছেন। আমরা সকলে আছি তোমার সঙ্গে।"

"ফ্লোরা... ফ্লোরার জন্য কে আছে আঙ্কল..." যন্ত্রণা চেপে বলে উঠেছিল মৃন্ময়ী।

সুতীর্থর হাতটা মৃন্ময়ীর কপাল থেকে আস্তে-আস্তে উঠে এসেছিল স্ফীত পেটটার উপর। পরম মমতায় ফিসফিস করে বলে উঠেছিল, "আমি আছি।"

ওরা আর সময় দেয়নি। মৃন্ময়ীর ট্রলিটাকে ঠেলে ঘরটায় ঢুকিয়ে বড় পাল্লা দুটো বন্ধ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল দরজার মাথার লাল আলোটা।

সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল! সেকেন্ডের কাঁটার সেরকম অলস গমনকে আগে কখনও সুতীর্থ প্রত্যক্ষ করেনি। মনে হয়েছিল এই বিশ্বসংসারে কিছুই ঠিক চলছে না। নিজেকে একা মনে হয়েছিল, ভীষণ একা।

কতক্ষণ? কে জানে? লাল আলোটা নিভেছিল একসময়। দরজাটাও অল্প ফাঁক হয়েছিল। সবুজ আলখাল্লা, সবুজ টুপি পড়ে ড. রাজীব দত্ত ডেকে নিয়েছিল সুতীর্থকে। মুখের উপর থেকে সাদা পট্টিটা সরিয়ে বলেছিল, মা ঠিক আছে। রিকভারি রুমে পাঠাচ্ছি। অ্যানাসথেসিয়ার ঘোরটা কেটে গেলে কথা বলবেন।

"বাচ্চাটা?"

"আ বয় চাইল্ড। হি ইজ় অ্যালাইভ। কিন্তু হয়তো কিছুক্ষণের জন্য মিস্টার গাঙ্গুলি। আপনাকে তো বলেইছিলাম... কোনও লাভ হবে না। কিছু ইনফ্যান্ট লাইফ সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি।"

"প্লিজ় ডক্টর, আপনাকে আমি বলেছি..."

ঠিক সাত ঘণ্টা বাইশ মিনিট এই পৃথিবীতে ছিল ফ্লোরা। অন্তরার অনুরোধে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ড. রাজীব দত্ত। একটা বিশেষ কেবিনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সাত ঘণ্টা বাইশ মিনিট একবারের জন্যও সুতীর্থ ফ্লোরাকে কাছছাড়া করেনি। কখনও ফ্লোরাকে স্পর্শ করে নিজের ওম দিয়ে জানিয়েছিল পৃথিবীর উষ্ণতা, কখনও কেবিনের জানালা দিয়ে দেখিয়েছিল পৃথিবীর নির্মল আকাশ, কখনও শুনিয়ে গিয়েছিল রূপান্তরের একটার পর একটা সংলাপ।

"হি ইজ় নো মোর।"

সুতীর্থ মুখ তুলে চেয়েছিল। সামনে গলায় স্টেথো ঝোলানো একটা মেয়ে। নাকি ঝাড়ু হাতে পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসা সামসা পরিবারের সেই কাজের মেয়েটা, যে বলছে...

কথাগুলো আর কানে ঢোকায়নি সুতীর্থ। নিচু হয়ে ফ্লোরা, নাকি গ্রেগর সামসাকেই কোলে তুলে নিয়েছিল সুতীর্থ। জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। তারপর নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো কেটেছিল কয়েকটা ঘণ্টা। ড. রাজীব দত্ত রিসার্চের জন্য কিছু টিসু তুলেছিল ফ্লোরার শরীর থেকে। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল শেষকৃত্যের। পৃথিবীর অসীম আসনে ফ্লোরাকে শুইয়ে রেখে সুতীর্থর মনে হয়েছিল, ফিরে যায় একবার মৃন্ময়ীর কাছে। পারেনি। পৌঁছে গিয়েছিল শিয়ালদায়। উঠে বসেছিল সেই গভীর রাতের ট্রেনে।

"তোমার চা আঙ্কল।"

সংবিৎ ফিরে চায়ে চুমুক দিয়ে সুতীর্থ মৃদু গলায় বলল, "চা-টা তুমি সবসময় ভাল করো মৃন্ময়ী।"

মৃন্ময়ী হেসে উঠল, "এটা তো টি ব্যাগ। আর গরম জলটা রিসর্টের। তোমার নাটকের দলের কথা বললে না তো আঙ্কল?"

"তুমি যে সময়ের কথা বলছ, সেই নাটকটা চলেনি। তারপর আমিও চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। অসীম, বিমানের সঙ্গে যোগাযোগটাও কমে এল..."

কথা বলার মাঝেই ঘরের দিকের দরজাটা আর-একবার খুলে সাদা তোয়ালেতে মাথা মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল একটি ছেলে। মৃন্ময়ীর সঙ্গে বারান্দায় অপরিচিত এক মধ্যবয়স্ককে দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। মৃন্ময়ী গালে হাসি ছড়িয়ে আলাপ করাল, "ও হচ্ছে শৌনক। আর উনি হচ্ছেন, তোমাকে বলেছিলাম না আমার এক আঙ্কল আছে, সুতীর্থ আঙ্কল, যাকে আমি চোখ বুজে সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করতে পারি!"

শৌনক সুতীর্থর দিকে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে বলল, "প্লেজ়ার টু মিট ইউ স্যার।"

"মাই প্লেজ়ার টু," সুতীর্থ সতর্ক হয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। জানা নেই মৃন্ময়ী নিজের অতীত সম্পর্কে কতটা বলেছে তার স্বামীকে।

"এদিকে কি স্যার বেড়াতে?"

"একরকম বলতে পারেন। হঠাৎ মনে হল বর্ষায় ডুয়ার্সটা দেখে আসি..."

"আমাদেরও তাই। সোম-মঙ্গল দুটো ছুটি নিয়ে নিলাম..."

"আমার অবশ্য রোজই ছুটি..."

সুতীর্থর একটা অস্বস্তি লাগছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, এই তিনজনের কথার মাঝে চতুর্থ একজনের নিশ্চুপ উপস্থিতি রয়েছে। বারান্দা থেকে উঠে আস্তে-আস্তে হোটেলের রিসেপশনের মেয়েটাকে বলল, "আমি চেক আউট করতে চাই।"

মেয়েটা বিস্মিত হল, "সে কী স্যার! আপনি তো সকালেই চেক ইন করলেন। কাল সকালে চুকচুকি যাওয়ার জন্য গাড়ি বললেন। এনি প্রবলেম স্যার?"

সুতীর্থ ফিসফিস করে বলে উঠল, "না, কোনও প্রবলেম নেই। আপনাদের রিসর্টটা বিউটিফুল... বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ হিয়ার। আউট অফ হিয়ার নাথিং এল্‌স। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ দিস প্লেস।"

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী